পারে। বস্তুটি পরিবর্তনীয় হলে বলপ্রয়োগে বস্তুটির আকারের পরিবর্তন হয়। যেমন একটি ইটের টুকরোয় হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিলে টুকরোটি গুঁড়ো হয়ে যায় বা একতাল কাদামাটিতে চাপ দিলে তালটির চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে বস্তুর পরিবর্তন বলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ঠিকই কিন্তু তা বস্তুটির এমন সব গুণের দ্বারা নির্ণীত যার সহজ পরিমাপ করা যায় না। তাই পরিবর্তনীয় পদার্থের ওপরে বলের প্রভাব থেকে বলের সহজ সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

অপরিবর্তনীয় (Rigid) পদার্থে বলের প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় তা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। দুরকমের পরিবর্তন হতে পারে; বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে বা গতিবেগের পরিবর্তন হতে পারে। ধরা যাক পৃথিবীর ওপরে কোন ভারী জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটিকে যদি দড়ি দিয়ে কপিকলে টাঙিয়ে দিয়ে দড়িটির খোলা দিকে বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে জিনিসটি ওপরে উঠে যায় বা জিনিসটির অবস্থানের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে জিনিসটির ওপরে দুটি বল কাজ করে। মাধ্যাকর্ষণের বল জিনিসটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে এবং দড়িটির খোলা দিকে যে বলপ্রয়োগ করা হয় তা কপিকলের মাধ্যমে জিনিসটিকে ওপরের দিকে টানে। যদি এই বলদুটি সমান হয় তাহলে জিনিসটি স্থির থাকে কেননা এরা পরস্পরের বিপরীতে কাজ করে। যদি একটি বল অপরটির চেয়ে বেশী হয় তাহলে যেদিকে বলের পরিমাণ বেশী সেইদিকে জিনিসটি স্থানান্তরিত হয়। স্থৈতিক বলবিদ্যায় কোন বস্তুর উপরে বিভিন্ন দিকে বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির কিভাবে অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে তারই পর্যালোচনা করা হয়।

একটি জিনিসের উপরে একাধিক বলপ্রয়োগের ফলে যদি জিনিসটির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় ও জিনিসটি স্থানান্তরিত হয় তাহলেই বলা হয় কাজ করা হয়েছে। এই কাজের পরিমাপ নির্দিষ্ট হয়েছে মোট বল ও স্থানান্তরণের দূরত্বের গুণফল। আগে যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এমনিভাবেই কাজ করা হয়। সব জিনিসই সাম্যাবস্থায় কোন বলের প্রভাবে থাকে, তাই কাজ করতে গেলে আমাদের বাহুবল প্রয়োগ করে এই সাম্যাবস্থাকে ব্যাহত করতে হয়। যে বলের প্রভাবে জিনিসটি সাম্যাবস্থায় আছে বাহুবলকে তার সমান করতে হয়। কাজের প্রয়োজনে এমন অবস্থা হতে পারে যে আমাদের বাহুবল সাম্যাবস্থাকে পরিবর্তন করার উপযুক্ত নয়। স্থৈতিক বলবিদ্যার পর্যালোচনা থেকে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে, যার দ্বারা এসব ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কপিকল, লিভার (Lever), গাড়ী ইত্যাদি। এদের দ্বারাই মানুষের সীমিত বাহুবল ব্যবহার করেও পিরামিড, বিরাট সব অট্টালিকা ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি পৃথিবীকেই তুলে ফেলার কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেও কাজ কিন্তু মানুষই করে এবং সব সময়েই কাজের পরিমাণ হল বাহুবল এবং যতটা দূর অবধি হাতটা সরান হয় তারই গুণফল। দেখা যাচ্ছে বস্তুর ওপরে বলপ্রয়োগের একটি ফল হল বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তন ও কাজ করা। কিন্তু কাজ পরিমাপের কোন নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নেই বলে—বস্তুতে যেভাবে বলপ্রয়োগ করলে শুধুমাত্র বস্তুটি স্থানান্তরিত হয় তা থেকে বলের গুণগত সংজ্ঞা দেওয়া গেলেও পরিমাণগত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বলপ্রয়োগে বস্তুর দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন হল গতিবেগের পরিবর্তন। ধনুক দিয়ে যখন তীর ছোড়া হয় তখন ধনুকের সাহায্যে ধাক্কা দিকে তীরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ধাক্কা দেওয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা যায় ক্ষণস্থায়ী বল (Impulse) প্রয়োগ। যেসব বলের প্রভাবে কোন বস্তু স্থিতাবস্থায় থাকে তাদের কোন একটি বাড়িয়ে দিলে ঠিক তীরের মতই বস্তুটি গতিশীল হয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই নিউটন প্রথমে বলের সংজ্ঞা দেন। গতির প্রথম সূত্রে তিনি বলেন যে বলপ্রয়োগে বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্থৈতিক বলবিদ্যায় যখন কোন বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তখনও বলের একটি অসম অবস্থা আসে এবং বস্তুটি গতিশীল হয়। কিন্তু ধরা হয় যে এই গতিবেগ শূন্যের কাছাকাছি যেমনটা হয় যখন আস্তে আস্তে কপিকল ব্যবহার করে কোন ভারী জিনিসকে উঁচুতে তোলা হয়। সাধারণভাবে সব অবস্থায়ই বস্তুর উপরে বলপ্রয়োগ করলে, স্থির বস্তু গতিশীল হয়, গতিশীল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন হয়। নিউটন গতির দ্বিতীয় সূত্রে বলেন যে বলপ্রয়োগে গতিশীল বস্তুর গতিবেগের যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনের হার বলের সমানুপাতিক। অনুপাতের ধ্রুবকটির নাম দেওয়া হয় ভর। ভর কোন জায়গায় বস্তুর ভারের সমানুপাতিক, তাই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে বলের পরিমাণগত সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কেননা বস্তুর ভর এবং গতিবেগের পরিবর্তনের হার বা ত্বরণ সহজেই মাপা যায়।

বলপ্রয়োগে বস্তুর গতির যে পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন গতিশীল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তাই হ'ল গতিজনক বলবিদ্যার বিষয়বস্তু। গতিশীল বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, দুটি গতিশীল বস্তুর সংঘাত হলে বস্তুদুটির গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। এধরনের সংঘাতের সহজ উদাহরণ হল দুটি বিলিয়ার্ড বলের সংঘাত। দেখা যায় সংঘাতের পূর্বের বস্তুদুটির গতিবেগ ও ভরের গুণফলের সমষ্টি সংঘাতের পরবর্তী ভর ও গতিবেগের গুণফলের সমষ্টির সমান। ভর ও গতিবেগের গুণফলের নাম দেওয়া হয়েছে ভরবেগ (Momentum)। কাজেই বলা যেতে পারে সংঘাতের সময়ে ভরবেগের যোগফল ধ্রুব থাকে। এই সূত্রকে বলা হয় ভরবেগের ধ্রুবতার নিয়ম। সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তুর ভরবেগ অপরিবর্তনীয়—শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা সংঘাতেই ভরবেগ পরিবর্তিত হতে পারে। নিউটনের গতির সূত্রদুটিকে অন্যভাবে বলা যায় বলপ্রয়োগে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় এবং ভরবেগের পরিবর্তনের হার বলের পরিমাণের সমান।

কোন বস্তুর ওপর বলপ্রয়োগ করে অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে যেমন কাজ পাওয়া যায় তেমনি বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটিয়েও কাজ পাওয়া যায়। বায়ুচালিত যন্ত্রে বায়ুর প্রবাহ এসে ধাক্কা দেয় এবং যন্ত্রপাতির চাকা ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণমান চাকা দিয়ে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে জল তোলা হয়, গম ভাঙ্গা হয় বা অন্যান্য কাজ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বায়ুপ্রবাহ ধাক্কা দিয়ে যখন চাকাটিকে ঘোরায় তখন বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ হ্রাস পায় বা বায়ুর কণাগুলির ভরবেগ কমে যায়। এইভাবে বায়ুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় বলেই বায়ুচালিত যন্ত্রে কাজ হয়। পালতোলা

জাহাজ যখন চলে তখনও বায়ুপ্রবাহই পালে ধাক্কা দিয়ে জলের আকর্ষণী বলের বিপরীতে জাহাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কাজ হয়। এক্ষেত্রেও বায়ুপ্রবাহ পালে লাগলে বায়ুর ভরবেগের পরিবর্তন হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার যন্ত্রেও গতিশীল জলধারা এসে যন্ত্রের টারবাইনে (Turbine) ধাক্কা দিয়ে টারবাইন ঘোরায় এবং জলধারার গতিবেগের পরিবর্তন হয় বলেই বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের চাকা ঘোরে। কাজেই দেখা যায় গতিশীল পদার্থ থেকে কাজ হলে গতিশীল পদার্থের ভরবেগ কমে যায়। বায়ুচালিত যন্ত্রে, পালতোলা জাহাজে বা জলবিদ্যুৎ-যন্ত্রে বায়ুপ্রবাহ বা জলধারা যখন ধাক্কা দেয় তখন এদের মধ্যে ভরবেগের বিনিময় হয়। যন্ত্রগুলি বায়ুপ্রবাহ বা জলধারা থেকে ভরবেগ আহরণ করেই কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বায়ুপ্রবাহ বা জলধারায় কাজ করবার ক্ষমতা সঞ্চিত থাকে—এই ক্ষমতাই যন্ত্রগুলিতে সঞ্চারিত হয়। গ্যালিলিও এই তথ্যটি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, যখন কাজ পাওয়া যায় তখন কাজ করার ক্ষমতা কমে। এই কাজ করার ক্ষমতার নাম দেওয়া হয়েছিল Vis Viva বা জীবনী-শক্তি; পরবর্তীকালে একেই বলা হয়েছে শক্তি।

কোন বস্তু গতিশীল হলে বস্তুর নিজস্ব সত্তার সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত হয়, যার নাম হল শক্তি। বায়ুপ্রবাহের এই শক্তি আছে, জলধারার শক্তি আছে আবার কেউ যদি কোন জিনিস ছুড়ে দেয় তাহলে সেই ছুড়ে দেওয়া জিনিসেরও শক্তি হয়। প্রথমে বস্তুর ভর ও গতিবেগের বর্গের গুণফলকেই শক্তির পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। নিউটনের গতির সূত্র থেকে পরে হিসাব করে দেখা যায়, শক্তির পরিমাণ বস্তুর ভর ও গতিবেগের বর্গের গুণফলের অর্ধেকের সমান।

গতিজনিত বলবিদ্যার আলোচনা থেকেই এভাবে বিজ্ঞানে শক্তির কথা আসে। গতিবেগ থেকে বস্তুর যে শক্তি আসে, তাকে বলা হয় গতিজনিত শক্তি (Kinetic Energy) বা সাধারণভাবে যান্ত্রিক শক্তি; কেননা এই শক্তি ব্যবহার করেই বিভিন্ন যন্ত্রে কাজ হয়। আগে বলা হয়েছে যে কোন বস্তুর ওপরে যদি এমন-ভাবে বল প্রয়োগ করা হয় যাতে বস্তুটির শুধুমাত্র অবস্থানেরই পরিবর্তন হবে গতিবেগের পরিবর্তন হবে না, তাহলে অবস্থানের পরিবর্তন করে কাজ করা হবে। এভাবে কাজ করলে যে কাজ করে তার শক্তি ব্যয়িত হয়—অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যয়িত শক্তি আবার স্থানান্তরিত বস্তুকে আশ্রয় করে। যেমন ধরা যাক কপিকল দিয়ে কোন ভারী জিনিসকে ওপরে তোলা হল। এবারে যদি কপিকলের দড়ির অন্যদিকে আর একটি ভারী বস্তু বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এই দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথমটি থেকে কম ভারী হলে ওপরে উঠে যাবে, প্রথমটি নেমে আসবে। দ্বিতীয় বস্তুটি তুলতে গিয়ে যে কাজ করা হল এবং শক্তি ব্যয়িত হল, স্পষ্টতই সে শক্তি প্রথম বস্তুটি থেকেই এসেছে। সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, প্রথম বস্তুটিকে যখন উপরে তোলা হয়েছিল তখনই বস্তুটির কাজ করবার ক্ষমতা জন্মেছিল বা বস্তুটিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি জন্মে সেই শক্তির নাম হল অবস্থান-জনিত শক্তি (Potential Energy). অবস্থানজনিত শক্তিও যান্ত্রিক শক্তি, কেননা অবস্থানজনিত শক্তিকে সহজেই গতিজনিত শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং যন্ত্র চালানো যায়। এমনি অবস্থানজনিত শক্তি ব্যবহার

করেই স্প্রীংএর বা ভার-ঝোলানো ঘড়ি চলে; আবার জলবিদ্যুৎ-শক্তিরও মূল উৎস উচ্চস্থানে সঞ্চিত জলের অবস্থানজনিত শক্তি।

শক্তিকে ভাবা যেতে পারে প্রকৃতির একটি বিশেষ প্রকাশ যা যান্ত্রিক শক্তি রূপে বস্তুকে আশ্রয় করে। সাম্যাবস্থায় বা স্থির অবস্থায় বস্তুর কোন শক্তি থাকে না, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলে বা গতিশীল হলে বস্তুতে শক্তি যুক্ত হয়। শক্তি বস্তুতে যুক্ত হলেই আমাদের অনুভবে আসে বস্তুর গতি বা *পরিবর্তিত অবস্থান রূপে।*

যান্ত্রিক শক্তি থেকে আলাদা আরও বিভিন্ন রূপে শক্তি প্রকাশিত হতে পারে। কপিকলের উদাহরণে বস্তুটিকে স্থানান্তরিত করায় যে কাজ করা হল তার শক্তি বস্তুতেই আশ্রয় নেয়। কিন্তু বস্তুর অবস্থানের অন্য ধরনের পরিবর্তন হতে পারে যাতে ব্যয়িত শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করে না। যেমন ধরা যাক পৃথিবীপৃষ্ঠে রেখে কোন জিনিসকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা *থেকেই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রেও* ভার তোলার মত কাজ করা হয়। কিন্তু সরান বস্তুটি থেকে আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। মনে হতে পারে, যে কাজ করা হল তার জন্য ব্যয়িত শক্তি হারিয়ে যায়। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যখন জিনিসটিকে ঠেলে নেওয়া হয় তখন জিনিসটির যে তল পৃথিবী-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকে সেই তলটির এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায় বা তাপসৃষ্টি হয়। ঘর্ষণের সময়ে এই যে তাপ সৃষ্ট হয় তা আরও সহজে বোঝা যায় যখন কোন ধাতব অস্ত্রকে পাথরে ঘষে ধারালো করা হয়। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, বস্তুটিকে ঠেলে নেওয়ার সময়ে যে শক্তি ব্যয়িত হল সেই শক্তিই তাপ হয়ে *প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারণা যে সত্য,* তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে কাজ করা হলে কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়, আবার এমন যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে যার দ্বারা তাপকেও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে—যেমন হয় বাষ্পচালিত, তৈল-চালিত বা পারমাণবিক যন্ত্রে। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তি মূলতঃ এক—এরা শক্তিরই দুই ধরনের প্রকাশ। যান্ত্রিক শক্তি বস্তুর *গতিবেগ* ও *অবস্থানের পরিবর্তন* রূপে দেখা যায়; কিন্তু তাপশক্তি বস্তুকে আশ্রয় করলে বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থা হয় যা আমাদের ত্বকে তাপের অনুভূতি আনে। কাল-ক্রমে প্রমাণিত হয়েছে, আমরা যাকে শব্দ বলে অনুভব করি তাও বস্তুর এক বিশেষ ধরনের গতিজনিত শক্তি। আলো, বেতারতরঙ্গ, বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি—এসবই শক্তির বিভিন্ন রূপ।

নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার জন্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার থেকে যে বলবিদ্যার সূচনা হয়েছিল তা থেকে মানুষ শক্তিকে জানতে পারে। শক্তি যান্ত্রিক শক্তিরূপেই মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে সহজে ধরা দিয়েছিল। আলো, তাপ এদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে করা হত। মানুষ ভাবত আলো, তাপ এরা প্রকৃতির বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় সত্তা—বিভিন্ন দেবতার বাহ্য রূপ। এদের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ সিদ্ধান্ত করেছে, এ সবই হল শক্তির বিভিন্ন রূপ। প্রকৃতির যা কিছু প্রকাশ তার মূল বিষয় দুটি—একটি বস্তু এবং অন্যটি শক্তি। শক্তি প্রকাশ পায় আলো, তাপ, শব্দ, বেতারতরঙ্গ হয়ে; আবার বস্তুও এই শক্তিকে গ্রহণ ক'রে নিজেকে উদ্ভাসিত করে—নিজেকে চেতন জীবের অনুভূতিতে আনে।

জীবনশিল্প ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী তথাগতানন্দ

"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত-কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাইরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতোটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।"

(সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ)

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান আমরা জানি, আমরা অনেকেই কিন্তু আমাদের মানসিক ভূগোলে এই 'পুণ্যভূমির' স্থান সম্পর্কে অবহিত নই। স্বামীজী বলেছেন, ভারত "ধর্ম ও দর্শনের দেশ।" তাঁর মতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব "আধ্যাত্মিকতায় ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশে।"

স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ; প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয় না, জগতের মধ্যে সে কোন ঐক্য খুঁজে পায় না। শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেছেন, আমরা এক অখণ্ড আনন্দময় সত্তারই খণ্ডরূপ, এই সর্বব্যাপী আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

অগ্নি, বায়ু, জল-স্থল সর্বত্র সেই চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট। তাঁকেই ঋষি বার বার প্রণাম করেন। বিশ্বপ্রকৃতি চৈতন্য-নিরপেক্ষ স্থূল পদার্থ-পুঞ্জ নয়। এক আনন্দময় সত্তা 'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি'—সব কিছু জুড়ে বিদ্যমান, জাগতিক মোহপাশ ও স্থূল দেহাভিমান ত্যাগ করেই তাঁর স্পর্শ পাই। এই মিলনই আমাদের কাম্য। এই অনন্ত জীবনেই আমাদের গতি, সম্পদ, আশ্রয় ও আনন্দ।

প্রাজ্ঞব্যক্তি সাধনার দ্বারা বিরোধ ও বেসুরকে বশ করেন। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ঐক্য দেখেন। এইটাই আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির ফলশ্রুতি। সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যই সব হয়েছেন। তিনিই আবার রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। তিনিই একমাত্র প্রেয়—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ। ব্যক্তিমনের সঙ্গে বিশ্বমনের এই যে সংযোগ, ধ্যানালোকে অমূর্তের সঙ্গে মিলনে যে আনন্দ—সুখম্ আত্যন্তিকং—তাহাই আমরা কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে পেতে উন্মুখ হয়ে থাকি। এই ঐক্য-বোধেই আমাদের পূর্ণতা আসে।

শিল্পের মধ্য দিয়ে আমরা অসীমের মধ্যে হারিয়ে যাবার সাধনা করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বা সীমাবদ্ধতার অহঙ্কার আছে, তার বিলোপ ব্যতীত আমরা ঐক্যের সন্ধান পাই না, শিল্পসাধনার লক্ষ্য এই ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হতে মুক্তির চেষ্টা। ঐক্যবোধের মধ্য দিয়েই আমাদের পূর্ণতা আসে। শিল্পীর জীবন ধন্য হয় যখন সে অসীমের এই হাতছানিকে প্রত্যক্ষ করে।

শিল্প মানে 'সত্যের সুন্দর অভিব্যক্তি।' ভগবান হলেন 'সত্যস্য সত্যম্।' তিনিই সুন্দরতম সৌন্দর্য। "ভগবানের অভিব্যক্তি শিল্পের পরাকাষ্ঠা।" এবং শ্রীঅরবিন্দের কথায় "শিল্প আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য—সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে, তার ভিতর দিয়ে

অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে সকলের প্রকাশের জন্য।" সৌন্দর্যের জন্য, ঐক্যের জন্য বা প্রেমের জন্য আমাদের যে আকুতি তার পরিসমাপ্তি সেই আত্মায়। তিনিই 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ।' সেই ভূমাকে অনুভবে আনার অর্থ হল অহং-লোপের পথের কাঁটা দূর করা। এই অনুভূতি দেয় একটা পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ; যা ভূমা, যা অসীম, তা আমাদের অন্তরাত্মারই পরম স্বরূপ। অহং-বিস্মৃতি না হলে মগ্নতা আসে না; অহং-বিস্মৃত শিল্পীর ভাবদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য, গন্ধ, গানে বা মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-বেদনা, আশা-নিরাশায় ভূমা বিরাটরূপে অপরূপ হয়ে দেখা দেন। এইরূপ যিনি দেখেন—উপলব্ধির পরম মুহূর্তে মানব-চেতনায় কোন আলম্বনকে আশ্রয় করে শিল্পের মাধ্যমে এই অসীম সুপ্রকট হয়ে ওঠে। এই রূপায়ণই শিল্প-সৃষ্টি। জীবন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে নিবিড় যোগ এইখানেই।

সব শিল্পসৃষ্টিকেই অন্তরাত্মার বিকাশ হিসাবে দেখা প্রাচ্যস্বভাব। সত্যকার শিল্পসৃষ্টি হয় মানবের নিগূঢ় মর্মলোকে। অনুভূতির দ্বারা মানব-প্রাণ ভূমার সহিত, অসীমতার সহিত তন্ময়তা লাভ করে, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। অনুভূতি মানব-প্রাণকে নিখিল-প্রাণের মধ্যে মুক্তি দেয়, এই সর্বব্যাপিত্ব যে তার অন্তরাত্মার সত্যস্বরূপ, ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। এই ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শনই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এর জন্য চাই অতন্দ্র সাধনা; অসীমের ধ্যানেই ব্যক্তিত্বের বা সীমার অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়। আত্মবিলয় বিনা শিল্পী হওয়ার আর অন্য পন্থা নাই। মনীষী কাণ্ট শিল্পকে "an object of disinterested satisfaction" অর্থাৎ নিঃস্বার্থ তৃপ্তিদায়ক বলেছেন। কারণ শিল্পটি বা আনন্দের অবলম্বন ও উদ্দীপকটি যেন আমাদের অহংবোধকে বিলুপ্ত করে আত্মবিস্মৃতির পথে নিয়ে যায়। Impersonality or detachment সত্ত্বগুণের আধিক্যে আসে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তদ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। "শিল্পঅর্থে প্রকৃতপক্ষে শীল ও প্রসাদগুণ যাতে আছে তাকেই শিল্প বলে। শিল্প মনে সাত্ত্বিক প্রসাদগুণ আনবে।

প্রসীদন্তে মনাংস ত্র তে···

অর্থাৎ মনকে প্রসন্ন করলে তাকে প্রসাদ বলে।" (অসিত হালদার)

শিল্প বা সাহিত্য ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি নয়—বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব (ego) থেকে আত্মার মুক্তি, জীবচৈতন্যের সহিত বিশ্বচৈতন্যের মিলন। সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা এই দুর্লভ আত্মীয়তাই খুঁজি। শিল্পী অহংকারের দেওয়াল টপকিয়েই ভূমার সহিত, বিরাটের সহিত আত্মীয়তা করতে পারে, এর জন্যই দুশ্চর সাধনা, চোখের জলে সমস্ত অহংকার ঘুচাবার সাধনা। এই অনুশীলন বা আত্ম-কর্ষণের ফলে শিল্পী এবং শিল্প-রস-পিপাসু—যাকে সহৃদয় বলে—কাব্য নাট্য-চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের মাধ্যমে যে রসানুভূতি লাভ করে তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফল, অতিরিক্ত কিছুই নয়। রসগঙ্গাধর বলেছেন, "ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।" এই কাব্যানন্দকে অভিনব গুপ্ত বলেছেন, "পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ" এবং বিশ্বনাথ বলেছেন, "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।" পূর্ণ ব্রহ্মস্বাদ নয়। অধ্যাপক হিরিয়ানা এ দুটিকে তত্ত্বতঃ সমগোত্রীয় বলে স্বীকার করেও বলেছেন জীবনর্চচার উপর উভয়ের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নয়। (Mac-gregor প্রণীত Aesthetic Experience in Religion) সাধক শিল্পীর বা সহৃদয়ের আনন্দ লৌকিক আনন্দ নয়, ব্রহ্মানন্দও নয়। তা আমাদের চিত্তকে সুখদুঃখের জগতের অনেক উর্ধ্বে

এক অলৌকিক জগতে নিয়ে গিয়ে মুক্তির আনন্দ দেয়। একেই আমরা ভাবজগৎ বলি। একেই লক্ষ্য করে ধ্যানী কবি Wordsworth বলেছেন,

"The gleam,
The light that never was on sea or land,
The Consecration, and the
poet's dream."

জগৎ ও জীবনের প্রতিস্তরে তার বাস্তব সত্তাতিরিক্ত একটি ভাব-সত্তা আছে। রসিক ভাবুকের দৃষ্টিতেই সেই ভাবসত্তা প্রকাশ পায়।

সাধারণ শিল্পীদের জীবনবোধের ব্যাপকতা ও গভীরতা নেই। তাদের জীবন-দর্শন সীমিত। তারা কোন গভীর প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, জীবন-চর্চা তারা করে না। অধিকাংশই ছন্নছাড়া ব্যক্তি। "Every artist is as bohemian as the deuce inside. (Thomas Mann)। এদের সৃষ্টি আত্মসিদ্ধির জন্য নয়—আত্মপ্রকাশের জন্য। এতে অহং-এরই প্রকাশ বেশী। এদের চিন্তা, ভাবনা ও কল্পনার প্রভাবে এদের ব্যক্তিজীবন পরিবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বলেছেন, "অনুভব মানেই হওয়া," তিনি বলেছেন, "বাইরের সত্তার অভিঘাতে সেই সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টি-লীলায় উদ্বেল হয়।" "টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যতো বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবন-চরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র।" (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ)

কথাশিল্পী সমরসেট মমের "The great novelists and their novels" বই থেকে প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীদের জীবনের যে পরিচয় পাই তা মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। কয়েকজন ছাড়া আর সকলেরই জীবন কুৎসিত। এরা শুধুমাত্র কথাশিল্পী, বুদ্ধির চর্চা করে পাঠককে আনন্দ দেয়। জীবনের মান উন্নত করার তাগিদ এদের নেই। প্রতিভা আছে কিন্তু জীবন নেই। সেজন্যই আজ পাঠকসমাজ কোন সার্থক জীবন যাপনের প্রেরণা পাচ্ছে না। রাশি রাশি বই লেখা হচ্ছে, পাঠকরাও গোগ্রাসে গিলছে কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছে না। লেখকদের জীবন-দর্শন অত্যন্ত স্থূল। শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণ এবং উন্নতির ঊর্ধ্বগতি কোনটাতেই তাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই। প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা emotional belief, যাকে Eliot বলেছেন 'wisdom', আজ কথাশিল্পীদের মধ্যে নেই। "The whole of modern literature is corrupted by what I call secularism, that it is simply unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primacy of the Supernatural over the natural life, of something which I assume to be our primary concern."

(Religion & Literature, T. S. Eliot)

আর এক শ্রেণীর শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি আছেন যাঁরা রূপে, রঙে, রেখায়, সুরে—শিল্পভাবনা ও শিল্পকামনাকে দেহায়িত না করে নিষ্ঠাবান শিল্পীর সাধনা দিয়ে জীবনকেই সহস্রদল পদ্মের মতো ফুটিয়ে তুলতে চান। এঁরাই জীবন-শিল্পী। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার জন্য এঁরা জীবনটাকে ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। সাধনার দ্বারা তাঁরা ভূমাকে, বৃহৎকে, অসীমকে পান। পঞ্চ-কোষের আবরণ সরিয়ে মেঘমুক্ত সূর্যের মত স্বপ্রকাশ আত্মা জীবকে লোকোত্তর আনন্দলোকে নিয়ে যায়। এ হ'ল রামপ্রসাদের ভাষায় মানবজীবন আবাদ করে সোনা ফলানো। সৌন্দর্যের এলাকায় শিল্প-সৃষ্টি কিন্তু সত্যের এলাকায় মানুষের কর্ম-জীবন। এঁরা জীবনসাধনার দ্বারা শিল্প-

সত্যকে জীবন-সত্যে পরিণত করার দুরূহ সাধনায় মগ্ন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্র-পূজায়' বলেছেন, এঁরা 'মহাত্মা'। এঁদের জীবনের স্বর্গীয় দীপ্তি মানুষকে আকর্ষণ করে, প্রেরণা দিয়ে মহত্ত্বের পথে নিয়ে যায়। মাহাত্ম্যের সঙ্গে প্রতিভার এখানেই প্রভেদ। প্রতিভার এই কল্যাণশক্তি নেই, প্রতিভার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলনে তা সম্ভব। 'ভক্তিভরে শেক্‌স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।' (চারিত্রপূজা।)

সাধারণ শিল্পীদের কাছে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের চপল-চাতুর্য, তর্ক-বুদ্ধির চিন্তা-বিলাসই কাম্য, এদের শুধু বুদ্ধির কালচার। সাধক-শিল্পীদের লক্ষ্য ভূমানন্দ। তাঁদের আত্মার কালচার। ভগবান সত্য, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের উৎস। সত্যকে, শিবকে ও সুন্দরকে জীবন-শিল্পীরা পেতে চান তপস্যার দ্বারা। এঁদের জীবন-চর্চার নিষ্ঠা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এঁরা সাধু, মহাত্মা। মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন : 'Association is the highest art'। তিনি সন্ন্যাসকেই জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প বলেছেন। শিল্প মানে সরল সুষমা।

সত্যের সাধক বলে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ স্বামীজীকে বুদ্ধিজীবীরা জীবন-শিল্পী বলতে পারেন। স্বামীজীর সমস্ত বাণীর মূলে আছে মানুষের সুপ্ত আত্মার জাগরণের অভিপ্রায়। মানুষকে মান-হুঁস করা, জীববোধ ঘুচিয়ে তাকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করা, তার body-consciousness দূর করে তার মধ্যে soul-consciousness জাগরণ করাই তাঁর লক্ষ্য। এই আত্মচেতনা বা অধ্যাত্ম-চেতনার জন্যই সমস্ত কর্ম-প্রবর্তন। সভ্যতার দ্বারা সুসংস্কৃত জীবন লাভ করে জগৎ-সত্যের মধ্য দিয়ে আত্ম-সত্যের এবং আত্ম-সত্যের মধ্য দিয়ে জগৎ-সত্যের অনুভূতি লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। এ না হলে মহতী বিনষ্টিঃ। তাই তাঁর গোড়ার কথা হল : 'Man-making is my mission'. তাঁর চোখে মানুষের মধ্যে রয়েছেন শিব—যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

মানুষের ইতিহাস মানবাত্মার মুক্তি অভি-যানের বেদনাতুর ইতিহাস। Croce-র মতে ইতিহাস—'Story of liberty'। Toynbee দেখছেন ইতিহাসের মধ্যদিয়ে মানুষের ক্রম-অভিব্যক্তি,—evolution of soul এবং তাও ঐশী ইচ্ছার পরিপূরণের জন্য।

'মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করেছে অসীমের দিকে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে।...মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি নিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' (মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ।)

শ্রীঅরবিন্দ অসীমের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার এই প্রেরণাকে বলেছেন : 'The passionate aspiration of man upward to the Divine'. (Life-Divine, Vol. I.).

ইতিহাসের এই অভিপ্রায় ভারতের জীবন-দর্শনে স্পষ্ট ছাপ রেখে চলছে। স্বামীজীর মতে ভারত চলেছে with her own majestic step,...to fulfil the glorious destiny,... to regenerate man-the-brute to man-the-God'. তাই তিনি বলেছেন, 'Freedom, freedom is the song of my soul'. 'দেহ, মন এবং জীবাত্মার সামগ্রিক বন্ধন-মুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিষদের মূল মন্ত্র।'

ইতিহাসের গতির পশ্চাতে রয়েছে খাঁটি

মানুষ। তাঁদেরই সবল বাহু ও উর্বর মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে ইতিহাসের জয়যাত্রা। সভ্যতার অগ্রগতির চাকা ঘোরাচ্ছে কার্লাইলের Hero, এমার্সনের Representative Man ও শ্রীঅরবিন্দের Superman Toynbee-র Selective minority বা elites. জনসাধারণ প্রেরণা পায় এঁদের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিক স্বামীজী বলেছেন: "অর্থ, পাণ্ডিত্য, বাক্চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ মূল্য নাই। পবিত্রতা, খাঁটি জীবন এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সমুদয় কার্য সম্পন্ন করে।" (পত্রাবলী —১ম, ৪৫৮ পৃঃ) তাই তিনি সৈন্য, বোমা বা অন্যান্য কোন জিনিস চাননি। চেয়েছিলেন, "নচিকেতার মত···শ্রদ্ধাবান ১০৷১২টি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।"

তিনি ছিলেন সত্যিকারের জীবন-শিল্পী এবং এই শিল্পের উদ্গাতা। সমস্ত উন্নতির মূলে ব্যক্তি-চরিত্রের উৎকর্ষ। মানুষের সুপ্ত আত্ম-শক্তি জাগরণের দিকেই তাঁর লক্ষ্য। জড়শক্তি অপেক্ষা চৈতন্য-শক্তির উপর তাঁর ছিল বিরাট আস্থা। "কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে এই পারে—এই বিশ্বাস থেকে যেন সরে যেও না।"—এই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, মানুষকে তার জীবনের জন্য গৌরব বোধ করতে বলেছেন তিনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণী এই: 'Sacredness of human personality' —জীবনের আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্মদৃষ্টিকেই রবীন্দ্রনাথ একটি 'মহৎ-বাণী' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁর (স্বামীজীর) বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে।'

Be and make এই তাঁর বাণী, তাই আমাদের প্রার্থনা শুধু অপাবৃণু, অপাবৃণু; আমাদের পঞ্চ-কোষের আবরণ উন্মোচনের প্রার্থনা। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'-কে মানুষী চেতনায় প্রকাশ করার প্রার্থনা। প্রতি বস্তুতে, প্রতি ভাবে যে ব্রহ্ম চিরবিরাজিত তাঁকে ব্যক্তি-চেতনার কাছে বাইরের স্থূল আবরণ যতটা সম্ভব সরিয়ে আনন্দ-স্বরূপে প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। জীবন শিল্পীও সাধনার দ্বারা—সত্য, ত্যাগ ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বারা —বৃহত্তর জীবনের আনন্দ অনুভব করেন। প্রাত্যহিক জীবনের কাজে, কর্মে, চিন্তায়, ভাবনায় গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকে প্রকাশ করার সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা। আমাদের হৃৎপদ্মকে ফোটানোর জন্য, আত্মানং বিদ্ধির সাধনার জন্য আমাদের সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা। পথ ক্ষুরস্য ধারা। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মন ও মুখ এক করা'র সাধনাই জীবন-শিল্পীর সাধনা।

যে সব পূতচরিত্রের সংস্পর্শে এলেই আমরা পাই আত্ম-সংবিৎ-উদ্ভাসিত মুক্তিপথের ইঙ্গিত, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের 'মহাত্মা', Carlyle-এর 'Inspired text'। সমরসেট মম অকুণ্ঠ ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জীবন-শিল্পীকে: 'The pictures they paint, the music they compose, the books they write and the lives they lead, of all these the richest in beauty is the beautiful life. That is the perfect work of art'. (S. Maugham ; Painted Veil.)

নাভি-তীর্থ (মণিপুর)

শ্রীমতী শিবানী দত্ত

এ রাজ্যের শান্ত পাহাড়গুলি মানুষের সঙ্গে কথা কয়ে যায়; পাহাড়ের গায়ে মেশানো গাছগুলি আমাদের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, পাহাড়ের অচল শিখরে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে চলার স্রোত। এ দেশের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে সত্য-সুন্দরের স্পর্শ। এ যে রুদ্রেশ্বরের দেশ! একদিন নটরাজের ডমরু-ধ্বনিতে জেগে উঠেছিল এদেশ।

***

আমাদের যাত্রা শুরু হলো ফাল্গুন শেষের গোধূলির আলো-ছায়ায়। গাড়ী ছুটে চলেছে আপন গতিতে। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে জ্বলে উঠলো দিনান্তের চিতা। আর তারই আলোয় নিজ নিজ শিরস্ত্রাণ রাঙ্গিয়ে উঠে দাঁড়ালো সাতটি পাহাড়। ততক্ষণে সভ্যতার বাতিও জ্বলে উঠলো। আমরা ক্রমশঃ এগিয়েই চলেছি, আমাদের গন্তব্যের পথে। আদি জননীকে দেখবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মাথা কুটে মরছে আমাদের চিন্তার দুয়ারে! কেমন সে স্তব্ধ জলরাশি, কত শক্তিশালী, যার গর্ভে জন্মেছে সাত পাহাড়ের দেশ, যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে দেবতা আর দৈববাণী! ক্রমেই আমরা এগিয়ে চলেছি পাহাড় আর খাদের মধ্যবর্তী চিকণ রাস্তার ওপর দিয়ে, যার গৈরিক দেহ এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে পাহাড়েরই পদপ্রান্তে গাঁয়ের দিকে। ক্রমে চারদিক ঘিরে নেমে এলো সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের সাথে সাথে স্তিমিত হয়ে গেল অরণ্যের মন্ত্রপাঠ, দেখতে দেখতে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে জ্বলে উঠলো বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ প্রদীপ।

পেছনে জনপদকে রেখে আমরা এসে পৌঁছলাম স্তব্ধ জলরাশির পাশে অচল শৈল-শিখরে। দূর থেকে দেখলাম মাটির মাথায় শোভা পাচ্ছে গাঢ় নীল তারকাখচিত চাঁদোয়া। শুক্লপক্ষের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে নীল জল-রাশির ওপর। একে ঘিরে রচিত হয়েছে কত পুরাণ-কাহিনী; তার প্রমাণ অবশ্য ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না।

সে কাহিনী বসন্তকালের—মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসবাসিনী কোন নূতন স্থানে বাস করতে চাইলেন। মহাদেব বেরিয়ে পড়লেন স্থান খুঁজতে, খুঁজে পেলেন না মনোমত স্থান। এমন সময় নারদের আর্বিভাব ঘটলো মর্তে, মহেশের পদপ্রান্তে; তাঁরই কাছে মহাদেব জানলেন এই প্রদেশের কথা। নারদকে সাথে নিয়ে মহাদেব এলেন উত্তরাপথে, দেখলেন দেশটি—সাতটি পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে একে অন্যকে অতিক্রম করে। তাদের পায়ে মাথা কুটে মরছে বিশাল নীলাম্বুরাশি। মুক্তি চাইছে তারা সাগরের সঙ্গে মিশবার জন্য। মৌন পাহাড়ের বুকে সে বার্তা বুঝি পৌছায় না। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একটুকুও সমতল ভূমি চোখে পড়ে না। সাত পাহাড় সেজে উঠেছে বসন্তের ডাকে। পাহাড়ের জলরাশির বুকে খেলে বেড়াচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ নীলকমল। জায়গাটি বিশ্বম্ভরের খুবই পছন্দ হলো, আপন ত্রিশূলাগ্র দিয়ে সমস্ত জলকে সঙ্কুচিত করলেন এই সরোবরটির বুকে—যার বর্তমান নাম লোকতাক্ হ্রদ। অফুরন্ত জল-রাশির চঞ্চলতার শেষ হলো, স্তব্ধ হয়ে গেল তা চিরদিনের জন্য, ত্রিশূলাগ্র বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বিরাট মালভূমি। নাম হলো

মণিপুর। উমা মহেশ্বর অধিষ্ঠিত হলেন সেখানে। মহেশ্বরের নৃত্যে মণিপুরের আকাশ বাতাস হয়ে উঠলো সঙ্গীতময়। তাইতো এদেশবাসী সবার কণ্ঠে গান। আজও প্রতি বৎসর শিবপর্বতে উৎসব হয়ে থাকে। বৈশাখের মেঘ এসে শিব-শিবানীকে জানিয়ে গেল ফিরে যাবার আহ্বান। ফিরে যাবার কালে মহেশ্বর অনন্তনাগকে দিয়ে গেলেন ষোলশো প্রমিলাসহ এ রাজ্যটি। তাই এর আর এক নাম "প্রমিলা-রাজ্য।" এই অনন্তনাগ "পাখাংবাই" হলেন মৈতাই-পুরাণের আদি পিতা। মৈতাইরা তাঁরই বংশধর। কথিত আছে এ হ্রদের জল দিয়ে শিবপূজো করলে সর্ব-সিদ্ধি লাভ হয়; তাই মৈতাইরা বহু দূর দুরান্ত থেকে এ জল নিয়ে যায়, যেমন আমরা নিয়ে যাই গঙ্গাজল।

*

রাত্রি হয়ে যাওয়ায় আমরা আগের দিন লোকতাকের কাছেই একটি পাহাড়ী ডাকবাংলোয় উঠেছিলাম। ডাকবাংলোটি নাতিউচ্চ টিলার ওপর। ভোর বেলা আবার যাত্রা শুরু হলো। কথা রইলো রৌদ্রের তেজ বাড়ার আগে ফিরে আসব। কারো মুখেই কথা নেই, পাহাড়ী প্রভাত আমাদের তারই মতো নির্বাক করে তুলেছে। উচ্চে দেখা গেল শৈলচূড়া মোটেই সূক্ষ্ম নয়, একেবারে থাঁদা আর তারই ঢলে প্রকৃতি বসেছে পণ্যসম্ভার ফলফুল সাজিয়ে। প্রকৃতির খেলা দেখে অবাক হতে হয়। পাহাড়ের গায়ে ফুটে আছে শ্বেতবর্ণ উথাম্বাল (গাছ-পদ্ম)। কত নাম না জানা পাখির গান, কত বনফুলের সমারোহ! নেমে এলাম ফেলে যাওয়া পথে। ফিরে আসার সময় চোখে পড়লো একদল মেয়ে চলেছে, মাথায় তাদের তিনটে থেকে পাঁচটা পূর্ণকুম্ভ, অথচ অবলীলাক্রমে তারা প্রায় ছুটে চলেছে বাড়ীর পথে। অদ্ভুত এদেশের লোকের স্বাস্থ্য। এদের অনেকেই হিন্দু; তবে চার্চের দুয়ারেও ভিড়; দেখলে মনে হয় চার্চের ভক্তের সংখ্যাই বেশী। হিন্দু পর্বতবাসীরা প্রায় সবাই রুদ্রেশ্বরের পূজারী। পর্বত বিজয় করে যখন ফিরে এলাম বাংলোর দিকে তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বাংলোয় ঢোকার মুখেই চোখে পড়লো একটি 'গোরস্থান'; সামনে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ড একটি মহিষের শিং, মধু অর্থাৎ মদ্য, একটুকরো লাল রেশমী কাপড়, আরো কত কি। পরে শুনলাম শিংটি হলো কৃতজ্ঞতা আর সম্মানের নিদর্শন, যত বড় হয় ততই ভালো। মদ্য তো দিতেই হয়। আর লাল রেশমী কাপড়টি মুক্তির জয়কেতন। এসব নাকি আত্মার শান্তির জন্য। মৃত্যুকে ওরা আনন্দ ব'লে ধরে নেয় কারণ মৃত ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট জরা থেকে মুক্তি পেলো। বরং জন্ম হলেই তারা দুঃখিত হয়। তাচ্ছিল্য আর দুঃখ প্রকাশ করতে তারা বাধ্য নবজাতকের মঙ্গলের জন্যই, কারণ সে দুঃখের পৃথিবীতে এলো। কিন্তু এই প্রথার মর্ম আজো অজানা রইলো—নবজাতকের প্রতি তাচ্ছিল্য কেন? নতুনকে বরণ করাই যেখানে মানুষের প্রাণধর্ম, সেখানে এ আচরণ অদ্ভুত। জীবনমৃত্যু সম্পর্কে এদের এই অদ্ভুত আচরণের কথা জেনে জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে বিচার করে দেখবার অবসর আর পেলাম না। চলে এলাম হ্রদের পথে।

*

দূর থেকে চোখে পড়লো জলের রেখা কিন্তু প্রথম বুঝতে পারিনি। সাদা একটি রেখা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছিলো না। আঁকাবাঁকা

পাহাড়ী পথ। চারিদিকে দেবদারু গাছ। শুনেছি আরো কিছু এগিয়ে গেলে পাইনের বন চোখে পড়ে। এখানে মাটি শ্যামল। তারই বুক চিরে যে গৈরিক নতুন পথটি তৈরী হয়েছে, আমাদের গাড়িটি ছুটে চলেছে সেই পথে। গোধূলি থাকতেই গিয়ে পৌছলাম পাহাড়ের উপর টুরিষ্ট হাউসে। এখানে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো গ্রামগুলি চোখে পড়ে। চারিদিকে শুধু জল আর জল; হ্রদ যে এত বড় হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। পাহাড়ের আরাম কেদারা। তার পাশ ঘেঁসে ছুটে চলেছে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা। গাঢ় নীল জলের বুকে ভাসছে সাদা হাঁসের পাল, দূরে জলের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে বক এবং অন্যান্য পাখি। জলের মধ্যে ছোট ছোট বালুর চরে বাসা বেঁধেছে এদেশের নুলিয়া শ্রেণীর লোকেরা; যারা এ হ্রদের গাইড। এদের ঘরগুলি যেন জীবন্ত ছবি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শান্ত উদার জলরাশি। অসীম স্তব্ধতার বুকে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছে উত্তাল বাতাস। কবে কোন্ যুগে তারা মুক্তি চেয়েছিল, সাগর-সঙ্গমে যেতে চেয়েছিল; আজ তারা কত শান্ত, কত শুদ্ধ! ধীরে ধীরে নীল জল কালো হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিল আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি যুগান্তের পারে। যেখানে মানুষের পদশব্দ পৌছায় না। নতুন করে উপলব্ধি করলাম নীরবতাই মানুষকে অন্তর্মুখী করে।

সেখানেই রাত কাটিয়ে নেমে এলাম পাহাড়ের পাদপ্রান্তে। ভোরের আলোছায়ায় অনন্ত নীল পবিত্র জলকে ছুঁয়ে নিজেকে পবিত্র করলাম। কিছু হলুদ আর গৈরিক মাটি, আর একরকম ছোট ছোট দুধের মতন সাদা পাথর কুড়িয়ে নিলাম। মনে মনে একটি প্রণাম জানিয়ে এলাম এত সুন্দর পৃথিবীর পায়ে।

এবার সমতল যাত্রাপথ। এবার দেখবো ঐতিহাসিক ভূমিকে। জায়গাটির নাম "মৈরাং"। উঁচু-নীচু পথ ভেঙ্গে যেতে চোখে পড়ে নানা ধরনের মন্দিরের চূড়া। আরো কিছু এগিয়ে পুরো মন্দিরগুলিই চোখে পড়লো. নেমে কয়েকটিকে দর্শনও করলাম। মৈতাইদের পরিচ্ছন্নতা দেখবার জিনিস। ঝক্ ঝক্ করছে প্রতিটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ। দেবতা দর্শন করলাম; রাধাকৃষ্ণের মূর্তিই বেশী, অবশ্য সাথে আরো অনেক দেবতা আছেন, যাঁদের সবার নাম আমার অজানা। আমরা প্রণামী দিলে ওরা আমাদের একটি কলাপাতার থালায় করে প্রসাদ হিসাবে কিছু ফুল, ক'টুকরো পদ্মের মৃণাল আর একটি আরতির সলতে দিল। বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে।

মন্দিরস্থাপত্যে আমার জ্ঞান বিশেষ নেই। সরল স্থাপত্যের বুকে যদি কোন নিখুঁত শিল্প লুকিয়ে থাকে, তা আমার চোখকে ফাঁকিই দেবে। মন্দিরগুলি দু-চালি আর চার-চালি। অন্দরমহলে রাধামাধব জিউ, নিত্যানন্দ। গোবিন্দজীর মূর্তিই বেশি। অবশ্য প্রত্যেক মন্দিরেই সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে আছে রুদ্রেশ্বরের আসন। মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর। প্রত্যেক পল্লী আর ব্রাহ্মণবাড়ীতেই আছে দেবমন্দির, অন্ততঃ ধ্বজাশোভিত একটি খড়ের চালাঘর। এগিয়ে গিয়ে পেলাম সত্যকার শিল্পকে। যার সাথে মিশে আছে এ প্রান্তের নাম আর মৈতাই-ইতিহাসের একটি অধ্যায়—সে হলো মৈরাং-থৈবীর মূর্তি। এর পেছনে আছে একটি কাহিনী। একই গল্পের দুই রূপ, অর্থাৎ গল্পের আরম্ভ এক কিন্তু উপসংহারটি কিছু অদল বদল। থৈবী ছিলেন মৈরাং রাজার কন্যা। চিত্রাঙ্গদার বংশের মেয়ে। থৈবী ছিলেন অসিযুদ্ধে অপরাজেয়। তিনি

পণ করেছিলেন, যে তাঁকে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই তিনি বরমাল্য অর্পণ করবেন। তাঁকে পরাজিত কেউ করতে পারেনি, কিন্তু সেনাপতির পুত্র খাম্বাকে তিনি মনে মনে বরণ করেছিলেন ব'লে তার কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করলেন। রাজাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শেষে বিবাহ দিতে হল। কিন্তু উৎসব-মুখর প্রাঙ্গণেই নাকি কোন দেবতার অভিশাপে এই দম্পতির দেহ প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

সেখান থেকে আমরা এগিয়ে গেলাম আরো কিছুদূর। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘাসের ওপর শেষ বেলার রোদ চিকচিক করছে। মনে হলো কিছু আগে এদিকে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখানে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা উপস্থিত হলাম গত মহাযুদ্ধের একটি নিদর্শনের পাশে—যা জাতির কাছে তীর্থবিশেষ। একটা বিরাট ঢালু ঢিবি, তারই ওপর তৈরী হচ্ছে আই. এন্. এ. মেমোরিয়াল। নেতাজী এখানেই তুলেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম বিজয়কেতন। শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে দেখছি, এমন সময় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বুনো হাঁস। তারা ঘরে ফিরছে। তাদের পাখার শব্দে চমকে উঠলাম, মনে হলো কেউ যেন আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল—

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।"

*

তার কিছুক্ষণ পরেই আমরা বাজার ঘুরে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম অন্য পথে, সে রাস্তা হলো বিষণপুরের পথ। সেখানে দুদিন থাকা হলো। প্রথম দিন সকাল বেলা ঘুরতে বেরুলাম। বাজারের কাছে গাড়ী থামলে গাড়ীতে বসে বসেই চারিদিক দেখছি। চোখে পড়লো বাঁ-পাশের একটি পাহাড় থেকে দলে দলে মেয়েরা নেমে আসছে, সকলেরই পরনে 'উড়াই'রং 'ফানেক' আর সাদা 'ইনাফি'; মিছিলটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো। একজনকে জিজ্ঞেস করে শুনলাম আজ "চম্পকচতুর্দশী"। আজ তারা নিজেরাও চাঁপাগুচ্ছে সাজবে, ঠাকুরকেও সাজাবে। আমারও ইচ্ছে হলো শিবের মাথায় একটু জল দিয়ে আসার। পাহাড়ের ওপর দুগ্ধধবল মন্দিরটি যেন আকর্ষণ করছে। এই মন্দিরকেও ঘিরে আছে একটি লোকগাথা। একজন ব্রাহ্মণকন্যা এখানে শিবের পূজারী ছিল। তার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে চম্পকচতুর্দশীর দিন ভূতনাথ রুদ্রেশ্বর তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি নিয়েই এখানে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। সেই থেকে আজও এইদিন বিশেষ পুজো হয় এখানে। মন্দিরে পৌঁছে দেখলাম বড় একটি তাম্রপাত্রে চাঁপা-ছিটানো জল রাখা আছে শিবের মাথায় দেবার জন্য, সাথে আছে একটি কলাপাতার চামচ।

শিবলিঙ্গের সামনে জ্বলছে সারি সারি ঘিয়ের প্রদীপ। লক্ষ্য করার জিনিস, মন্দিরটির কোন ভিত নেই, পাহাড়ের গায়ে উঠেছেন লিঙ্গ আর তার চার পাশ থেকে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। পূজা সেরে মনের মধ্যে এক নিবিড় আনন্দ নিয়ে নেমে এলাম গ্রামের ভিতর। কি সুন্দর গ্রামটি! আশে পাশে এতটুকু নোংরা নেই। দেখলেই বোঝা যায় এটা 'মৈতাই-লাইকাই', বিরাট বিরাট সব বাড়ী। প্রায় প্রতিটি বাড়ীই আপাদমস্তক নীল সাদা কিংবা গৈরিক মাটিতে সুনিপুণভাবে নিকানো। প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি সবজি বাগান, তুলসী-গাছ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে।

দেখলাম বাসনপত্র সব পিতলের। মণিপুরী বাড়ীতে আজও চিনামাটি আর এনামেলের সাম্রাজ্য বিস্তার হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে একটি বাড়ীতে পৌঁছলাম, এখানেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে এসে আবার সবার সাথে মিলিত হলাম। বিকেল বেলা সবাই মিলে রওনা হলাম গ্রামের কেনাবেচা দেখতে। বিকিকিনি সবই করে মেয়েরা; এসব ব্যাপারে পুরুষেরা গৌণ। মাথায় বোঝা, পিঠে ছেলে নিয়ে কেমন চলে এরা, সেটা দেখবার মত বৈকি! আজকাল অবশ্য পুরুষেরা মুখ্য হয়ে উঠছে। বাড়ী ফিরে এলাম। এমন গ্রাম দেখে সত্যই আনন্দ হয়। গরীব কি নেই? নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু কে একবেলা খাচ্ছে আর কে চারবেলা খাচ্ছে তা তাদের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই; যে একটাকার দিনমজুরী করছে সেও যখন দেবমন্দিরে যাবে তার গায়ে থাকবে একটি ধবধবে চাদর, পরনে থাকবে ততোধিক শুভ্র ধুতি। তাদের প্রতি জিনিসটি সত্যিই দেখবার মতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি পোষাক তাদের সবারই থাকবে। হয়তো সে ভিক্ষা করে খেতে পারে, কিন্তু ময়লা হয়ে রাস্তায় বেরুবে না। আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, তাদের জাতিবিচার আমাদের মতো প্রবল নয়। সঙ্গীত এবং নৃত্যশিল্প এদের জাতীয় সত্তা, এদের প্রায় সবাই কিছু গান গাইতে নাচতে এবং ছবি আঁকতে জানে। বাড়ী এসে দেখলাম যানবাহন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য। চললাম। পথে দেখলাম, একটি বাড়ীর উঠানে বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উৎসব পালন করা হচ্ছে। মেয়েদের 'অতিথি আহ্বান' নৃত্য এবং শিশুদের' গোষ্ঠলীলা' খুব ভালো লাগলো।

পরদিনই আমরা সেখান থেকে চলে এসেছিলাম। এবার ঘরে ফেরার পালা। এ-উপ নগরের ছবি চিরদিন মনের পটে আঁকা থাকবে। পাহাড়ের বুক চিরে তৈরী হয়েছে রাঙ্গা মাটির পথ, কৃষি-অফিস, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, আরো অনেক কিছু। এ দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অগণ্য। ফেরার পথে আরেকটি দিন থামলাম আরেকটি গ্রামে। এই গ্রামটিতে বাস আদি মৈতাইদের, অর্থাৎ এখনো যাদের ধর্ম সম্পূর্ণ আদিম, যদিও জীবনটা নয়। তারা ঘোর শৈব। পূজা করে ভৈরব আর সূর্যদেবতার। নিজেদের "সেনামাহী" বলে পরিচয় দেয়। এরা এখনো আদিম প্রথায় পূজা করে থাকে। তাছাড়া এই সম্প্রদায়ের সাধুদের সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এখানে এসেই প্রথম শুনলাম সূর্য-মন্দিরের কথা। শুনলাম নতুন পুরাণকাহিনী। এদের পুরাণে আছে, মৈতাইদের আদি লোক-গুরুর নাম হলো গুরু শিদাবা। গুরু শিদাবা হলেন সূর্যের পিতামহ আর পাথাংবা হলেন সূর্যের পিতা এবং মা হলেন দেবী সেনামেহী। এ গ্রামের অধিবাসীরা সেই সেনামেহী দেবীর সাধক। সেনামেহীকে আবার দেবীভৈরবীও বলে। পথে ক'জন সেনামাহী সাধুর দর্শন পেলাম কিন্তু আলাপ করতে সাহস হলো না। তাদের রুদ্র সজ্জা দেখলেই কেমন যেন ভয় করে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার, এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের গায়ের রং কালো, চেহারা বেশ উন্নত। সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের হাতে আছে সিঁদুর-মাখানো এক একটি বড় শঙ্খ; শুনেছি শঙ্খধ্বনি দিয়েই তারা একে অন্যকে আহ্বান করে।

*

আবার এসে পদার্পণ করলাম শহরের পথে, যাত্রা আর ফেরা একই জায়গায় এসে শেষ হলো। আকাশে তারা আর মাটিতে জোনাকী। ক্রমান্বয়ে তারা জলছে আর নিবছে, ভারি ভালো লাগলো আকাশ-মাটির এই খেলা।

পথের সন্ধানে

ব্রহ্মচারী প্রসূন

মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা ॥

—রামপ্রসাদ

বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের জটিলতা সরল করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই মানবধর্মেরও নববিন্যাস সাধিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। ধর্মবিজ্ঞানের অনুশীলন মানুষকে করতেই হবে কারণ তাতে সে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁচার মত বাঁচতে শিখবে, পাবে জীবনধারণের উপযোগী প্রকৃতজ্ঞান। চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে আদর্শ পন্থা অবলম্বন করতে শিখবে সে, শিখবে আদর্শ আত্মবিন্যাস বা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ। আদর্শ আচরণবিধি শিখবে সে, শিখবে আদর্শ সমাজ গঠনের ধারা। আর জানবে সমস্ত জিনিসের অন্তর্নিহিত চরম ও পরম সত্যকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জগতের অন্যান্য সকল অবতার মহাপুরুষগণই বলে গেছেন, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। জীবনযাত্রীর ক্ষমতা ও জীবনের শ্রেণীভেদে পথও বিভিন্ন এই ঈশ্বরলাভের। জীবনের যে কোনও স্তর হতেই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরাভিমুখে যাত্রা করতে পারে যদি তার পাথেয় হয় আত্মবিকাশের সাধনা। মানুষের অন্তরেই যে অবস্থান করছেন সেই ঈশ্বর, সেই অন্তরাত্মা। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে সেই ধর্মের জন্য যে ধর্ম পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝে আনবে সেই সহযোগিতা যার বলে বলীয়ান হয়ে তারা পরাভূত করবে মানবতার সকল সাধারণ শত্রুদের, দারিদ্র্য অত্যাচার ও যুদ্ধ—সকল রোগকে।

আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের কর্তব্য তাই যুগের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদান সৃষ্টি করা,—রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিদ্বেষের পরিবর্তে শান্তি, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আনয়ন করা, জাতিগত বিবাদ দূর ক'রে সাম্য আনয়ন করা, সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা, সম্বল ও শিক্ষা আনয়ন করা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য এ ধরনের সার্বজনীন প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ ও শঙ্করের বাণীর সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাই স্বামী বিবেকানন্দ, যুগেরই প্রয়োজনে। তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে আমরা সেই আহ্বানই শুনি যা বুদ্ধদেবের নৈতিক আদর্শবাদ ও শঙ্করাচার্যের আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক সুষম মিলন ঘটিয়েছে। মানুষের নৈতিক জীবন অবশ্যই আধ্যাত্মিক সচেতনতার প্রকাশ, এ দু'টি জিনিস ভিন্ন থাকলে পূর্ণাঙ্গ হয় না।

বর্তমান বিশ্বের মানবমনের প্রধান উপাদান যুক্তি। বর্তমান বিশ্বের বিন্যাস পুরোপুরি যুক্তি-সংক্রান্ত। আধুনিক যুক্তিবাদী মন ধর্মের মাধ্যমে তাই চাইবে পরম সত্যকে—বহুর মাঝে ঐক্যের অনুভূতিকে। ঈশ্বরকে তারা চাইবে সম্বন্ধসূত্ররূপে যেখানে সমস্ত বস্তুজগৎ প্রবেশ করছে, অবস্থান করছে এবং সার্থকতা লাভ করছে। জীবনকে তারা দেখতে চাইবে কর্মে পরিণত ধর্ম হিসেবে।

বিজ্ঞানী মনের ধর্মজিজ্ঞাসা তাই সদা জাগ্রত। বিজ্ঞানী মন চায় এমন সত্য যা প্রয়োগ করা যাবে জীবনের প্রতি পদে পদে। মানবব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ আনয়ন করার

প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন বিজ্ঞানী মনের, প্রয়োজন সেই মহান শক্তির সূত্রাবলী নির্ণয় ক'রে সকল মানবসন্তানদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার। প্রকৃতির প্রথম নিয়মের বিবর্ধনই ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে আত্মসংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানব-আবেগের সেই অভিব্যক্তি যার দ্বারা মানুষ চায় পার্থিব প্রতিকূল প্রভাবের বিরুদ্ধে তার অন্তরের প্রধান উদ্দেশ্যকে বজায় রাখতে। ধর্ম তাই মানুষের জীবনসত্তার প্রধান ও অচ্ছেদ্য অংশ।

বিভিন্ন ধর্মের ভাবের আদানপ্রদান ক্রমশঃ জ্ঞানের পরিধিকে বর্ধিত করবে এবং অজ্ঞানতা, তা যতটুকুই থাক, দূর করবে, -এ আশা মানুষ স্বভাবতই করে। বিজ্ঞানের যুগে ভবিষ্যতের ধর্ম কি হবে মানুষের, এ কথা ভাবলেই মনে আসে যে, ধর্ম ক্রমশঃ নিজের সংজ্ঞা নিজেই দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উপরই প্রধান জোর পড়ছে বর্তমানের ধর্মব্যাখ্যায়। আধুনিক মানুষ তার কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে সাধারণভাবে প্রচলিত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গতি খুঁজে না পেলেও ধর্মাসক্তি ত্যাগ করতে তো পারছে না!

আত্মসংরক্ষণের এবং স্বচ্ছন্দ জীবনবাসনার প্রেরণায় যদি ধর্মের প্রয়োজনবোধ আসে তা হ'লে মানুষ ও তার পরিবেশের সমন্বয়ের প্রচেষ্টার সঙ্গে তা ক্রমশঃ জড়িত হবে এবং সামাজিক নিরীক্ষারও প্রেরণা জোগাবে। বর্তমানে জীবনের পরিসর অনেক বেড়েছে। বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন ও ন্যায়নীতি প্রভৃতি হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ। মানুষের মন স্বভাবতই চাইছে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে, নতুন ক'রে সংশ্লেষণ করতে। তাই মানুষের প্রচণ্ড কর্মপ্রগতির প্রভাবে ভবিষ্যতের নব ধর্মের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যা সুরু হয়ে গেছে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাবের সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের অবস্থান কোথায়, ধর্মের প্রভাব কি এবং ধর্মের অনুধাবনে মানুষের শক্তি কেমন ক'রে বৃদ্ধি পায়,—এ সব জিনিস মানুষ যখন প্রকৃতই জানতে পারবে তখন মানুষের জীবন নিঃসন্দেহে আরও মধুর হবে।

মানবজীবনে মনন যেমন, কর্মও সে রকম তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আত্মচেতনা ও কর্ম এ দু'টি মিলেই গঠন করে প্রকৃত মানব-সংস্কৃতি। সমস্ত জগৎ এক চিরন্তনী গতির মধ্যে অবস্থান করছে। মানুষ এর একটি একক। বিজ্ঞানী মন বস্তুজগৎকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ ক'রে শেষে বুঝতে পারে যে, সকল বস্তুরই উৎস এক মহান শক্তি যার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়। মানবাত্মা ও বস্তু-জগতের এই যোগসূত্রের আদি ও অন্ত নেই। মানুষের কর্মের মধ্যে শুধু যে বৃথা কষ্টই আছে, তা বলা যায় না। কর্মের মধ্য দিয়েও মানুষ পরম শান্তি লাভ করতে পারে। মানুষের প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই মানুষ ক্রমশঃ নৈতিক জীবনোপযোগী কর্মময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ কথা ধ'রে লওয়া চলে। তাই এ সম্ভাবনার কথাও উদয় হয় যে, মানুষ উত্তরোত্তর বিভিন্ন ধর্মসূত্রে জ্ঞাত ঐশ্বরিক শক্তি ও সত্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। মানুষের লক্ষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া। আর এটাই মনে হয় মানবাত্মার মুক্তির লক্ষণ। এ বিষয়ে মানবাত্মা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণকারী, অন্য কোনও নিয়মকানুনের প্রয়োজন নেই। তাই কর্ম হবে তার উপাসনা। কারণ সে সমাজের জন্য কাজ করবে, সমাজকল্যাণের চেষ্টা করবে নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই। সে বুঝবে নিজের কল্যাণের জন্য যা করা

প্রয়োজন সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যও তা-ই প্রয়োজন।

সে ধর্ম তাই হবে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান, কেবলমাত্র সমাজের একটি বিলাস বা ফ্যাশনের উপাদান নয়। সে ধর্ম হচ্ছে মানবের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন, মানবাত্মার অন্তরের সম্পদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যদি মনে করা যায় যে, এই মানবরূপে ঈশ্বরদর্শন কেবলমাত্র আদর্শ বা ধারণা তা হলেও স্বীকার করতেই হবে যে বিজ্ঞান ও রাজনীতিপ্রধান বর্তমানের এই চলমান বিশ্বের কর্মপ্রণালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য সূত্র এই ধর্মবিজ্ঞান।

আমরা চাইব সেই ভবিষ্যতের দিকে যখন প্রতিষ্ঠানগত ধর্মের প্রয়োজন আর থাকবে না, যখন মানবসমাজ সেই স্তরে উন্নীত হবে যেখানে দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক সত্য তার কাছে সদা জাগ্রত থাকবে। এই কর্মমাধ্যমে ধর্ম অশুভ ভাবকে পরাজিত করবে, এর পূজা ও ধ্যানপদ্ধতি হবে প্রয়োগধর্মী সেই প্রকার কর্ম ও বিশ্বাস যা স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত কিন্তু মানবীয় ধারায় সার্থকরূপে মহিমান্বিত। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ধর্মকে।

বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আমরা দেখছি কত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের এক বিরাট সমাবেশ। তার সমন্বয় সাধিত হ'তে পারে একমাত্র ধর্মের বৈজ্ঞানিক পুনরীক্ষণের দ্বারা। বিশ্বের আধুনিক ঋষি বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আলোকে বেদান্তের অবদান থাকবে এই পুনরীক্ষণের মধ্যে। হিন্দুমতে একত্বই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এই এক নিত্য বস্তুই একই মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত।

ভবিষ্যতের ধর্ম হবে গতিশীল জগতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান। এ ধর্ম মানুষকে শক্তি দেবে, অন্তরাত্মাকে করবে বিকশিত, জগৎকে করবে প্রকৃতপক্ষে সুখসম্পদের ক্ষেত্র, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে দেবে বাস্তবরূপ। এক বিশ্বের আদর্শ হবে এর মূলসূত্র। এ ধর্ম নিজ প্রভাবে বিশ্ব রাজনীতির মধ্যে আনয়ন করবে মানবিকতা-বোধ। গতিশীল জগৎ এখন যে পর্যায়ে তাতে মানুষের ধর্মেরও যে নববিকাশ হবে,—এ ধারণাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত। বর্তমানের বিজ্ঞানী মন চাইবে, ধর্ম তার মানসিক জগতে আনবে বিশ্বাস ও ধারণার ক্ষেত্রে দেবে বোধগম্য ও বুদ্ধিদীপ্ত এক অর্থ। কারণ ধর্মই মানুষের আবেগ ও ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে! বর্তমানের মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম হোক তার সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয়যন্ত্র, ধর্ম করুক প্রত্যেকটি মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনাত্মক জীবনের অধিকারী। বর্তমানের মানুষের ধারণায় ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব অভিন্ন হতে পারে না। বর্তমানের বিশ্লেষণকারী মানবসত্তা সর্বাগ্রে স্থান দেবে সেই ধর্মকে যে ধর্ম তাকে উন্নত মস্তকে দাঁড়াতে শেখাবে এবং উন্নত শ্রেণীর কার্যে প্রেরণা দেবে।

উপনিষদের অমৃতবাণীর মধ্যে এই বিজ্ঞানী মনের আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর মিলে যায়। নিত্য অনুষ্ঠিত সত্য, তপ, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য দ্বারাই এই আত্মা লভ্য। আত্মাই অনুভবনীয়, শ্রবণীয়, বিচার্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। আত্মাকে জানলেই সব জানা হল, কারণ আত্মাই সব। ধীমান ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই

আত্মার বিষয় জেনে প্রজ্ঞা অবলম্বন করবেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য—স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ব্রহ্ম।

স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম মানুষের অন্তরের অপরিহার্য অঙ্গ…জীবনমাত্রই অন্তর্জীবনের বিবর্তন।…ধর্মবিজ্ঞান মানবাত্মার বিশ্লেষণ-মূলক। উপলব্ধিই ধর্ম।…আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম।…ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মানুষে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।…বেদান্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই প্রচার করে।…বেদান্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদান্ত শেখায় যে, সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।…সময় আসিতেছে যখন মহান মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।"

প্রার্থনা

শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়

'মানুষই দেবতা' এ মহা বারতা
ঘোষিলে কে তুমি বীর,
বিবেকানন্দ, অগ্নিসাধক,
(তব) চরণে নোয়াই শির!
ধ্যানেতে তোমার হ'ল দরশন
নরের হৃদয়ে জাগে নারায়ণ,
বজ্রনিনাদে ঘোষিলে সে বাণী,
ভাঙ্গিলে মোহপ্রাচীর॥

রুদ্র, তোমার বেজেছে বিষাণ
নরদেবতার ওঠে জয়গান—
বিশ্ব জুড়িয়া জাগিছে মানুষ
উন্নত করি শির!
জাগিছে, তবুও তারা পথহারা
ছুটিছে আঁধারে পাগলের পারা—
দীপ্ত সূর্য! রশ্মি তোমার
ঘুচাক ঘোর তিমির॥

সমালোচনা

খাপখোলা তলোয়ার : সুমণি মিত্র। বিবেক-ভারতী, ৫৭, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃঃ ৪৭৯ ; মূল্য আট টাকা।

তাঁর 'নরেন' সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, 'খাপ-খোলা তলোয়ার'। সুমণি মিত্র তাঁর তিন খণ্ডে পরিকল্পিত বিবেকানন্দ-জীবনভাষ্যের প্রথম খণ্ড 'সপ্তর্ষির ঋষি' গ্রন্থে স্বামীজীর জীবনের মূল পর্বটি বিশ্লেষণ করে সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি আধুনিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়করূপে স্বামীজীর সংগ্রামী-সত্তার অন্তরঙ্গ রূপায়ণ, সেদিক থেকে 'খাপ-খোলা তলোয়ার' নামটি সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দ-ভাবধারায় প্রদীপ্ত লেখকের ভাষাও এ গ্রন্থে যেমন শাণিত, তেমনি বহুবিস্তৃত মনন ও অধ্যয়নে সুসমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও পাদটীকায় লেখকের সুপরিণত চিন্তার ঐশ্বর্য পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। গ্রন্থের আদ্যন্ত তাঁরই স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রনিদর্শনগুলি লেখকের ভক্তিসমুজ্জ্বল অনুভবজগতের লাবণ্যে এক অখণ্ড ভাবতাৎপর্যের সৃষ্টি করেছে।

'খাপখোলা তলোয়ারে'র আটটি অধ্যায়ের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃতীয় অধ্যায় : স্বামীজীর যুক্তিবাদ ; চতুর্থ অধ্যায় : সংগ্রামী সন্ন্যাসী ; পঞ্চম অধ্যায় : নর-নারায়ণ-বাদ। রুচিভেদে অন্যান্য অধ্যায়ের প্রতিও পাঠকদের অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে লেখকের বক্তব্য সবচেয়ে সুবিশ্লেষিত ও সুসংহত ঐ তিনটি অধ্যায়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের শেষদিকে অনেক পরিমাণে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সারদাদেবীর কথাও এসেছে। এ সব-কিছুই লেখক তাঁর বিচিত্র কথনকৌশলে একই সঙ্গে একান্ত ঘরোয়া অথচ রীতিমতো বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে অনেক সময়ই মনে হয়েছে, কবিতার বাহ্য আবরণটুকু ত্যাগ করে সম্পূর্ণ প্রবন্ধকাররূপে দেখা দিলেই লেখক হয়তো পাঠকসমাজে বেশী স্বীকৃতি পেতেন। কিন্তু সব আভিধানিক সংজ্ঞার বাইরে নতুন সাহিত্যকৃতির মূল্যও কিছু কম নয়। এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ বেশী!

বিবেকানন্দ-মননের অন্যতম অপরিহার্য এই গ্রন্থটি প্রকাশে যিনি এবং যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁরা সকলেই জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। বিপুল-কায় অন্তঃসারহীন তথাকথিত "উপন্যাস" রচনার ভীড়ে তাঁরা অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ করেছেন যে, কেবল পৃষ্ঠা ও মূল্যের অঙ্কে সাহিত্যের মূল্যবিচার হয় না—একথা মনে রাখবার মতো সুস্থবুদ্ধি কিছু লোক এখনও এদেশে আছেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চয়ন। শ্রীপ্রমথভূষণ রায়চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস ঘোষ, ৭৪এ, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা ২০। পৃষ্ঠা ১৬২ ; মূল্য ৫৲।

গ্রন্থখানির অবতরণিকায় শ্রীমধুসূদন বেদান্ত-শাস্ত্রী লিখিয়াছেন : "দর্শনশাস্ত্র অতীব দুরবগাহ্য তথাপি শাস্ত্রব্যসনী ৯২বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় অতিশয় স্থৈর্য ও উৎসাহকারে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, ষড়দর্শন-রূপ তীব্র কণ্টকাকীর্ণ মহামহীরুহে আরোহণ করিয়া যাহা চয়ন করিয়া 'সূত্রে মণিগণা ইব' নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় 'চয়ন'-গ্রন্থে উপন্যস্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

Shri Ramakrishna Souvenir—1966. Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas. Pp. 146.

আলোচ্য স্মরণিকাটি নানা দিক হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে: বিশিষ্ট লেখকগণের সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী, উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ, সুন্দর চিত্রের সন্নিবেশ।

"Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur" প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আশ্রমটির ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট। "Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama" সচিত্র প্রবন্ধটিতে সমাজশিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

Our Traditional Values and National Culture—The Call of the Gita by Dr. Kailashnath Katju, Need for Spiritual and Moral Teachings in Educational Institutions by Sj. Saraswathi Gourishankar, Bengal in the Nineteenth Century by Hiranmay Banerjee, Sankara and Ramanuja by Swami Adidevananda. The Secret of Tapas by Dr. K. M. Munshi—প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা: ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮১।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের রূপ লইবার পর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর যে সংবিধানটি মঞ্জুর হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি আদি রাষ্ট্রের দুইতৃতীয়াংশ দুই বৎসর ধরিয়া যাহাকে স্বীকৃতি দান করে এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হইয়া যাহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, এই সচিত্র পত্রিকাটিতে পৃথিবীর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম লিখিত সেই সংবিধানের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান রূপ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। কংগ্রেসের কর্ম-পদ্ধতি, আইন-প্রণয়ন-রীতি প্রভৃতি বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য বিবরণও পত্রিকাটিতে পাওয়া যাইবে।

Common Words—(A simple English-Bengali Dictionary for boys and girls)—Compiled by Sures C. Das, M. A. General Printers & Publishers P. Ltd. Calcutta 13. Pp. 200, Price Rs 2/-.

পাঁচ হাজার প্রচলিত ইংরেজী শব্দের এই অভিধান-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকখানি কাছে রাখিলে বিশেষ লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। অভিধানখানির বৈশিষ্ট্য: নির্বাচিত ইংরেজী শব্দের সহজ বাংলা অর্থ, প্রত্যেক শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ, কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যামূলক অর্থ। স্থলবিশেষে অর্থবোধ সুস্পষ্ট করিবার জন্য চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অভিধানটি যে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহা প্রমাণ করে।

বাণী ও প্রার্থনা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। পরমশরণানন্দ-সঙ্কলিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রম, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ১৭৮; মূল্য ২৲।

প্রার্থনা ও স্তোত্রাদি, প্রার্থনা-সঙ্গীত ও বিবিধ প্রসঙ্গ—এই তিনটি স্তবকে ব্যাপ্ত সংকলনগুলিতে সংকলয়িতার উত্তম রুচিবোধের পরিচয় বিদ্যমান। দ্বিতীয় সংস্করণটি আরও জনপ্রিয়তা লাভ করিবে, মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়।

'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদা দেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয়-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২৮১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। তামিল ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীগণকে জাতীয় ভাষা (Malay) এবং ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪,৯৫৯ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ৩৮৫ খানি নূতন বই সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫২টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫৫টি ছাত্র ছিল। ছাত্রাবাসটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা-ভজনাদি ও খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ হইতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে ১৫টি বক্তৃতা দেন।

আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে ফেব্রুআরি যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে পূজার্চনা, ভজন, অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। তৎপর সান্ধ্য আরাত্রিক সুসম্পন্ন হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা-সভায় পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ত, বিদ্যুৎ ও জলসেচ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মং শু প্রু চৌধুরী ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্বের সংঘাতবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচারী সুকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ধর্মমতের ব্যাখ্যা করেন। প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল মোত্তালিব ভূঁইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সমবেত উপাসনা ও কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেন।' এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্নে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

ও পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। এডভোকেট জনাব মীর্জা গোলাম হাফেজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও স্বহস্তে উপযুক্ত ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের জনহিতকর কার্যের সুখ্যাতি করেন এবং এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া স্কুলের উন্নতি কামনা করেন। ব্রহ্মচারী সুকুমার 'প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষা' এই আদর্শানুসারে এখানে শিক্ষাদানের যে চেষ্টা করা হয় তাহা ব্যক্ত করেন এবং স্কুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিদ্যালয়টি প্রথমে প্রাইমারী স্কুল ছিল, পরে উহা মধ্য ইংরেজী স্কুল হয়. বর্তমানে উহা জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিনশত।

শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ২২শে ফেব্রুআরি মঙ্গলবার হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়দিনব্যাপী সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে ফেব্রুআরি ভোর ৫টা হইতে মঙ্গলারতি, কীর্তন ও ভজনাদি হয়। তারপর বিশেষ পূজা, অঞ্জলিপ্রদান ও হোম হয়। ঐদিনই সকালে আশ্রমের বিদ্যার্থিবৃন্দ কর্তৃক 'লীলাগীতি' গীত হয়। ইহার পর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ ও সন্ধ্যায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিদ্যার্থিগণ কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, গান ও বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

২৩শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে আগত রামায়ণগায়ক শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন। রামায়ণগানের অব্যবহিত পরেই শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কীর্তন গান করেন। এই অনুষ্ঠানটি খুবই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরদিনও সন্ধ্যায় কীর্তন ও রামায়ণ গান হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন।

২৫শে ফেব্রুআরি 'মহিলাদিবস'-রূপে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন সকালে শিলচর সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের শিশুশিল্পী-আয়োজিত 'গোষ্ঠলীলা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। শিশু-শিল্পিবৃন্দের অভিনয় দর্শকগণকে চমৎকৃত করে। সন্ধ্যায় কীর্তন ও রামায়ণগানের পর ঐ দিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৬শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ। সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী দেবানন্দজী, শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস ও শ্রীকুলেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। সভায় বক্তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দ বর্তমান সমস্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভার পর শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন।

২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার সমস্তদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণ গান করেন। তারপর স্বামী দেবানন্দ মহারাজ 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে স্থানীয় গায়ক শ্রীননীগোপাল গোস্বামী কর্তৃক পদাবলী কীর্তন গীত হয়। মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ ভাষণ দেন। ভাষণের পর শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভজনসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে নয়দিনব্যাপী শুভ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ২২শে ফেব্রুআরি শুক্লাদ্বিতীয়ায় ঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ও আরতির পর সন্ধ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত 'কথামৃত'-পারায়ণ এবং ২৩শে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ-কথকতা করেন। ২৬, ২৭, ২৮শে ফেব্রুআরি ও ২রা মার্চ সন্ধ্যায় বেতারশিল্পী শ্রীভূপেন চক্রবর্তী ভজনকীর্তন পরিবেশন করেন। ২৭শে ফেব্রুআরি সারাদিনব্যাপী 'নরনারায়ণ'-সেবায় প্রায় ৪,০০০ লোক বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন রূপায়ণে সকলেরই সহযোগিতার আহ্বান জানান। খড়্গপুর ইন্‌স্টিট্যুট অব টেকনলজীর অধ্যাপক শ্রীবি. এম. চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ২রা মার্চ স্বামী অজজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ধর্মের আলোকে আমাদের সংকীর্ণতা দূর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলাশাসক শ্রীগ্রেগরী গোমেশ সভাপতির ভাষণ দেন।

জামসেদপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি আশ্রমে গত ২০শে ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রসাদবিতরণ কিঞ্চিৎ তারতম্য করার প্রয়োজন বিধায় ফল-মিষ্টাদি প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুআরি সাধারণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৬ তারিখ সন্ধ্যারতির পরে জনসাধারণের জন্য সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাজা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী আদিনাথানন্দ সোসাইটির অগ্রগতির বার্ষিক ও সামগ্রিক ধারাবিবরণী পাঠ করিবার পর স্থানীয় কলেজের প্রফেসর শ্রীসত্যচরণ ওঝা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য এবং তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধ্যানের উপকারিতা সুললিত ও সহজবোধ্য হিন্দীতে উপস্থাপিত করিবার পরে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়। ভাষণগুলি সবই সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সাধারণ সভার পরে শ্রীসুধীর চৌধুরী রামায়ণগান পরিবেশন করেন।

২৭শে ফেব্রুআরি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কল্পতরু-ঘটনাবলী পুঁথি অবলম্বনে গীতিসম্বলিত কথকতায় পরিবেশন করেন। গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীহরিপদ কর। তৎপরে রামায়ণ গান হয়। জনসাধারণ এই উভয় শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত বিষয়বস্তু অতিশয় উপভোগ্য গণ্য করেন এবং আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন।

এই বৎসর দরিদ্রনারায়ণ-সেবাতে খাদ্য-পরিস্থিতি অনুযায়ী বসাইয়া সেবার সুযোগ ঘটে নাই, পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া ফলমিষ্টাদি বিতরণ করা হয়। হাসপাতালে রোগীদিগকে ফল বিতরণ করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

গত নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুআরি মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গৌহাটী রামকৃষ্ণ আশ্রম, পাণ্ডু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কালা-পাহাড়—গৌহাটী, রেলওয়ে কলোনী—গৌহাটী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গড়বেতা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—মেদিনীপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—

তমলুক, গোপ-মহিলা কলেজ—মেদিনীপুর, চিঁচড়া, মাতৃমন্দির—জয়রামবাটী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—কামারপুকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—কোয়ালপাড়া, সুভাষ হাইস্কুল—গরগড়িয়া, সারেঙ্গা, শ্যামাপদ উচ্চ বিদ্যালয়—বিক্রমপুর, রায়পুর হাইস্কুল, বনমালী বিদ্যামন্দির—তপ্তদামদী, মণ্ডলগুলি, মণিপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কাঁথি, প্যারুলিয়া-হাইস্কুল, বিজয়কৃষ্ণ জাগৃহি বাণীপীঠ—ম'রিশদা, নেতাজী মিলন সঙ্ঘ—কুমীরদা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—বনমালী চট্টা, জীবনকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—নাচিন্দা, বলাগেড়িয়া, আদর্শ বিদ্যাপীঠ—খেজুরী, গুরুপ্রসাদ বালিকা বিদ্যানিকেতন—কুঞ্জপুর, চতুর্ভুজচক প্রাথমিক বিদ্যালয়—ষাটকুমারী, খেজুরী, রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন—খানিপুর, আঙ্গুয়া, বেলদা ইত্যাদি স্থানে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী', 'শিক্ষা ও ছাত্রজীবন' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৪২টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৮টি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা অতি দুঃখিত চিত্তে সঙ্ঘের দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি :

স্বামী সিদ্ধানন্দ

গত ১০ই মার্চ বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময় বারাণসী সেবাশ্রমে স্বামী সিদ্ধানন্দ ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত অক্টোবর (১৯৬৫) মাসে আমাশয় ও প্রসটেট গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধিজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকগণ তাঁহার ক্যান্সার হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, অবশেষে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী সিদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী অদ্ভুতানন্দ-জীর কথোপকথন লিখিয়া রাখেন, পরে ইহা 'সৎকথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

স্বামী সিদ্ধানন্দ জীবনের অধিকাংশ কাল ৺কাশীধামে অতিবাহিত করেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী জ্ঞানানন্দ

গত ১৮ই মার্চ বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী জ্ঞানানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ৭৪ বৎসর বয়সে সহসা মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণের ফলে (cerebral stroke) দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ কিছু দিন কাটাইয়া গত ৮ই মার্চ তিনি কনখলে গিয়াছিলেন। ১৮ই মার্চ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার স্ট্রোক হয়, বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। এই সময়ে তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে দেখা যায়, তিনি তাঁহাদের ফটো-অ্যালবাম বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় নীলধারার গঙ্গাবক্ষে তাঁহার দেহ সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কিছুকাল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আমেদাবাদ শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১২.২.৬৬ শনিবার বৈকালে স্থানীয় অখণ্ডানন্দ হলে শ্রীবিবেকানন্দ পাঠ-চক্রের বার্ষিক মহোৎসব এবং বেদান্তকেশরী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের ১০৪ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পাঠচক্রের বার্ষিক বিবরণী পঠিত হয়। প্রবচনে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক প্রকাশ গর্জর, অধ্যাপক বদ্রিনারায়ণ অলোক ও অধ্যাপক ফিরোজ দাবর। বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সারগর্ভ ভাষণ দেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) গত ২২.২.৬৬ মঙ্গলবার প্রতিপালিত হয়। ভোর হইতে উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডী পাঠ হয়। বৈকালে ৫-৩০ হইতে ৯-৩০ পর্যন্ত শ্রীবিবেকানন্দ-পাঠচক্র দ্বারা অনুস্থত কার্যক্রমের মধ্যে মুখ্য ছিল বেদমন্ত্র আবৃত্তি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীমার উপদেশ পাঠ, স্বামিশিষ্য-সংবাদ পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ পাঠ, নামধুন, আরতি, ভজন, কীর্তন। ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনুরূপ কার্যসূচী দ্বারা গত ১৪.১২.৬৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১১৩তম জন্মজয়ন্তী এবং গত ১৩.১.৬৬ স্বামী বিবেকানন্দজীর ১০৪তম জন্মজয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছিল।

বরাহনগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরীর নিজস্ব ভবনে গত ১৩ই ফেব্রুআরি স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ভক্ত, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন ও ভবনাথের কয়েকটি স্মারক চিহ্ন সম্বলিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে লাইব্রেরী-ভবনের সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতি স্বামী নির্বাণানন্দজী ও স্বামী নির্জরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবনাথ সম্বন্ধে হৃদয়-গ্রাহী আলোচনা করেন। লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

ভবনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' ও 'দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী' (সম্ভবতঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) একত্র হইয়া 'বরাহনগর পিপল্‌স্ লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হয়। ভবনাথ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'-র একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে এই বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, রামায়ণকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দ মহারাজ।

আশ্রমস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত বৎসর ২৬,৬৫১ জন রোগীকে বিনামূল্যে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভালিয়া সারদা সঙ্ঘ: গত ৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে তিনদিনব্যাপী এক উৎসবে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত তেলো-

ভেলোর মাঠসংলগ্ন 'ডাকাতে কালী'র প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ধর্মসভা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সভাপতিত্ব করেন ও সুপরিচিত কবি বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রধান আতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'মালশ্রী'র সভ্যবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত গীতিবিচিত্রা 'পরমা প্রকৃতি মা সারদা' ও 'মহিষ-মর্দিনী' এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায় (বেতারশিল্পী) ও সঙ্ঘসম্পাদক শ্রীকুমার সরকার এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা ও পরিশ্রমে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কার্যবিবরণী

গোয়ালিয়র (এম. পি.) রামকৃষ্ণ আশ্রমের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি ধর্মশালায় ধর্মালোচনা, ভজন ও জনসেবামূলক কার্য শুরু করেন। ইহার পর জহর নগরে একটি ভবনে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়, বর্তমানে আশ্রম এখানেই অবস্থিত। গত পাঁচ বৎসরে সাপ্তাহিক গীতা-ক্লাস, নিয়মিত 'কথামৃত' আলোচনা, একাদশীতে রামনামসঙ্কীর্তন এবং সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমের কর্মপ্রসারের জন্য নিজস্ব জমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্টেক্‌লোস্কোন

দুইজন সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ পনের বৎসর গবেষণা করিয়া 'স্টেক্‌লোস্কোন'-জাতীয় নকল কাচের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নকল কাচ এতই মজবুত যে ইস্পাতের মতো শক্তি বহন করে, সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া যায় না। এই বিচিত্র পদার্থটি কাচের অংশের সহিত কৃত্রিম আলকাতরা মিশ্রিত করিয়া সৃষ্ট।

যাত্রীবাহী গাড়ি, স্নানের জল রাখিবার চৌবাচ্চা, জাহাজের বিভিন্ন হালকা পার্টস, মোটর গাড়ি, ঘরের আসবাবপত্র, সুটকেশ—এই সব এই নকল কাচ 'স্টেক্‌লোস্কোন' হইতে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন। প্লাষ্টিক শিল্পের ন্যায় 'স্টেক্‌লোস্কোন'-শিল্পটিও জগতের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস।

ভ্রম-সংশোধন

১৩৭২, ফাল্গুন সংখ্যা ; ৫৭ পৃষ্ঠা, ২য় লাইন : '১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার' স্থলে '১২ই মাঘ বুধবার' পড়িবেন। ৮ম লাইন : '১৪ই মাঘ' স্থলে '১৩ই মাঘ' পড়িবেন। ৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫শ লাইন : '২৫শে মাঘ' স্থলে '২৪শে মাঘ' পড়িবেন।

১৩৭২, চৈত্র সংখ্যা ; ১১৪ পৃষ্ঠা, ১১শ লাইন : 'মাধবানন্দজী অধ্যক্ষ হইবার পর' স্থলে 'মাধবানন্দজীর পর' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১।৩।৩-৪ ॥

- কঠোপনিষদ্

দেহ-রথে রথী আত্মা, ইন্দ্রিয় তাহার অশ্ব, মন বল্গা, বুদ্ধি সে সারথি,
বিষয় তাহার পথ—সে পথেতে অশ্বগণ নিয়ে চলে রথ সহ রথী।
(দেহেন্দ্রিয়মন ছাড়া বিষয়সম্ভোগ নাহি হয় কদাচন)
দেহেন্দ্রিয়মন সহ সংযুক্ত আত্মাই ভোক্তা—কহে জ্ঞানিগণ।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ১।৩।৫ ॥

চঞ্চল মানস যার, নহে সমাহিত,
সে-মনের সহ যুক্ত বুদ্ধি যার অবিবেকী হয়,
(দুর্বল) সারথি-হস্তে দুষ্ট অশ্ব সম
ইন্দ্রিয়েরে বশে রাখা সাধ্য তার নয়।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ১।৩।৮ ॥

বিবেকী যাহার বুদ্ধি, সংযত মানস যার, পবিত্র যাহার দেহ-মন,
(হেলায় চালায়ে রথ যাইতে সে পারে দিব্যধামে)
লভে সে পরম পদ, লভিলে যা পুনর্জন্ম হয় না কখন।

কথাপ্রসঙ্গে

দেশসেবকের আদর্শ

মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তাঁহার জীবনাদর্শের যে বিশেষ দিকটির প্রতি দেশ-সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইল ত্যাগ অবলম্বনে সেবা। ইহাই চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত স্বাধীনতা-লাভের জন্য যে সংগ্রাম বিপুলতর বেগে চলিয়াছিল তাহার বীর যোদ্ধাদের জীবন ছিল এই আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ ভিত্তিভূমি হইতে বহু দেশসেবকের জীবনাদর্শ সরিয়া আসিতে সুরু করে স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই। বহুজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈসাদৃশ্য প্রকট হইবার পর মহাত্মা গান্ধী যতদিন জীবিত ছিলেন প্রার্থনাসভায় প্রায় প্রতিদিনই তিনি স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের দিনের আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া উহাতে দেশসেবক-গণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এবিষয়ে সজাগ করাইয়া দিবারও লোক যেন ক্রমে বিরল হইয়া গেল। এই ত্যাগের আদর্শ ক্রমবিলুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষময় ফল আজ ফলিতেছে—সর্বত্রই আজ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অসন্তোষ আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। হৃদয়ের সহিত সংস্পর্শহীন বুদ্ধিমাত্র অবলম্বনে হয়ত কোনরূপে শাসনযন্ত্রকে অবিকল রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু ইহা জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। কেহ আমার প্রতি দরদী কি না, তাহা বুঝিবার জন্য কোন সুচিন্তিত সুবিন্যস্ত বক্তৃতা শুনিবার প্রয়োজন হয় না, আচরণ দেখিয়া সকলে স্বতই তাহা বুঝিতে পারে; আবার বুদ্ধিজ ভাষার আবরণ সত্যকে কখন ঢাকিয়া রাখিতেও পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মস্তিষ্কের ভাষা সকলে বুঝিতে পারে না কিন্তু হৃদয়ের ভাষা তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান পর্যন্ত সকলেই বোঝে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশাত্মবোধের প্রথম ব্যাপক প্রসারের সহায়কগণ, মহাত্মাজী, নেতাজী প্রভৃতি দেশের জনগণের সকলেরই হৃদয়ে যে গভীর শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উচ্চপদ বা ক্ষমতার জন্য নহে—ত্যাগনিষ্ঠ চরিত্রেরই জন্য; ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিজ ভুলভ্রান্তির প্রাচুর্যও হৃদয়কর্তৃক অধিকৃত শ্রদ্ধার এই আসনকে টলাইতে পারে নাই। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন দেশের কল্যাণসাধনের পথের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন মহামতি গোখ্‌লে যে বিষয়টির প্রতি জোর দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া—জনসেবকদের জীবন ত্যাগপূত হওয়া এবং জনসেবার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা অনুস্যূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের নির্বাচন জাতি- বা সম্প্রদায়-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা চরিত্র- ও যোগ্যতা-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন; এরূপ না হওয়ার জন্যই দেশে বর্তমান বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে।

সেবাযজ্ঞে অগণিত দেশপ্রেমিকের ত্যাগ ও সেবার বিমল ভাবমণ্ডিত জীবনাহুতি প্রদানের ফলস্বরূপ যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, বহিরাগত দুইটি দুর্যোগের ক্ষণে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে দেশের সর্বত্রব্যাপী জনসাধারণের

হৃদয় হইতে উৎসারিত (সাময়িক হইলেও ঐকান্তিক) স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগ ও সেবার সুদৃঢ় সংকল্প। জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার এবং উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য দেশসেবকগণের, বিশেষ করিয়া নেতাগণের জীবনকে ত্যাগনিষ্ঠসেবা-ভিত্তিক করার প্রয়োজন যে অনিবার্য, বর্তমান পরিস্থিতি তাহা আমাদের সকলেরই নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

পাশ্চাত্যে মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর ভারতীয় চিরন্তন ভাবধারা প্রচারের দ্বারা ভারতকে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে বসাইয়া এবং তাহার ফলে ভারতীয়তার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই 'কলম্বো হইতে আলমোড়া' পর্যন্ত যখন পূর্ণ ত্যাগ, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও সেবার সর্বোচ্চ ভাবমণ্ডিত জীবনোদ্ভূত বিপুল শক্তিময় বাণীর বিদ্যুৎস্পর্শে মৃতপ্রায় জাতিকে জাগরিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ভারতকে উন্নতির পথে গতিবেগসম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটি মূল সূত্র তিনি দিয়া গিয়াছেন, যাহা ভারতের কল্যাণের জন্য সর্বকালেই প্রয়োজ্য। তাহার মধ্যে একটি হইল—দেশসেবক হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। কথাগুলি আমরা বহুবার শুনিয়াছি, তথাপি বর্তমান সময়ে ইহা আর একবার অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, স্বদেশহিতৈষী হইতে হইলে তিনটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। "প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদের কতটুকু সহায়তা করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়-দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে।" দেশের জনগণের দুঃখদুর্দশার চিন্তা আমাদের হৃদয়কে কি তোলপাড় করিয়া তোলে?—"এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? *দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র* ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার মাত্র প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছ।"

দ্বিতীয় সোপান হইল জনগণের দুর্দশা নিবারণের কার্যকর পন্থা আবিষ্কার—"মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশার প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছ কি? মানুষদের গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পার কি?"

তৃতীয় সোপান হইল কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে সর্বস্বত্যাগ করিবার ও সর্ববাধা চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবার অটুট সংকল্প—"তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ

তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো?···নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো? তোমাদের কি এরূপ দৃঢ়তা আছে?"

"যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তোমরা অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারো। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।···তোমরা যদি পর্বতের গুহায় গিয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইবে।···অকপটতা, সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।"

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা

স্বাধীনতালাভের পর হইতে আমাদের দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে বর্তমানে মাঝে মাঝে উহা ভয়াবহ ও লজ্জাকর রূপ ধারণ করিতেছে। যাহারা দুদিন পরে দেশসেবার বিভিন্ন বিভাগে, দেশের শৃঙ্খলারক্ষার কাজেও আত্মনিয়োগ করিবে, শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহাদের এই-জাতীয় আচরণ মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

জীবনের কোন কোন দিকে কিশোর ও যুবমনের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ঢেউ বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উঠিতেছে; কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিবার যে মনোবৃত্তি এদেশে একদল ছাত্রের মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহা আর কোথাও এভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে কিনা, জানি না।

শৃঙ্খলা ছাড়া কোন মহৎ জীবন গঠিত হইতে পারে না, কোন সংগঠন বা সঙ্ঘবদ্ধ বড় কাজ চলিতে পারে না, দেশ উন্নত হইতে পারে না। নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য ইহার প্রয়োজনের অনিবার্যতা স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগা প্রয়োজন; যেমন খেলার সময় রেফারীর নির্দেশ বা কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে মনে একথা ওঠে না যে, বাধ্য হইয়া কিছু করিতেছি। স্বতঃস্ফূর্ত সে বোধের জন্য আমাদের হয়ত আরো কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সুদীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া বাধ্য হইয়া ভয়ে নিয়ম মানিয়া চলার ফলে স্বাধীনতালাভের পর এখনো আমাদের মনে বোধ হয় এভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—নিয়ম মানিয়া চলিতে গেলেই আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত লাগিবে।

তাছাড়া ইহার জন্য যে মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এখনো শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান পাইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন ও প্রসারের ব্যবস্থাই রহিয়াছে, তাহার উন্নতির জন্যই চিন্তা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু মনের উৎকর্ষসাধনের, ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের কোন ব্যবস্থাই এখনো হইল না। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ অপেক্ষাও মনের উৎকর্ষসাধনের উপরই জোর দিয়াছেন বেশী; কতকগুলি সচ্চিন্তার ছাপ মনে পুনঃ পুনঃ দেওয়া ও কতকগুলি নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে ইহা করা যায়। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি পথের নির্দেশও দিয়া গিয়াছেন। তাহার কোনটিই যথাযথরূপে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নাই। যত শীঘ্র উহার প্রবর্তন করা যায়, ততই মঙ্গল। জীবননিয়ন্ত্রণে মানসিক প্রবণতার প্রভাব বুদ্ধির প্রভাব অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা রোধের জন্য একটি কাজ ছাত্রগণই করিতে পারে। দেখা যায়, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। এই অল্প কয়েকজনই গণ্ডগোল বাধাইয়া তোলে; ইহাদের প্রেরণাও নিজস্ব অথবা বাহিরের উত্তেজনা-প্রসূত, তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। অধিকাংশ ছাত্রই এরূপ বিশৃঙ্খলার পক্ষপাতী নহে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগৃহে যে কয়টি লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ইহা প্রকট। কিছু ছাত্র ঘটনাস্থলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, দু-একটি ছাত্র-সংগঠন ইহার তীব্র প্রতিবাদ এবং ইহা নিবারণে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করিয়াছে। ইহা খুবই আনন্দ ও আশার কথা। ইহা হইতেই মনে হয়, শুভচিন্তাশীল সদ্ভাবাপন্ন ছাত্রগণ, যাঁহারা বুঝেন যে শিক্ষাব্যবস্থাকে এভাবে বিপর্যস্ত করিলে ছাত্রদেরই ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেই ইহা অতি সহজে নিবারিত হইবে।

অন্যায় বলিয়া যাহা বোঝা যাইতেছে, তাহা হইতে শুধু বিরত থাকিলেই চলে না, তাহার প্রতিরোধে সক্রিয় না হইলে স্বল্পসংখ্যক অন্যায়কারীদেরই প্রকারান্তরে সমর্থন করা হয়। অতি পুরাতন বৈদিক স্তোত্রেও তাই দেখা যায়, তেজ, বীর্য, ওজঃ (সংযমজনিত শক্তি) প্রভৃতি প্রার্থনার সঙ্গে এই প্রার্থনাও করা হইতেছে—"মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি" —তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধস্বরূপ, তুমি আমাকে অন্যায়দ্রোহী কর। আশিষ্ট, দৃঢ়-সংকল্পবান, সংযত ছাত্রের অভাব স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী প্রমুখ সিংহসদৃশ মহা-মানবের জন্মভূমিতে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি ছাত্রসংঘটন করেন, যাহার শাখা প্রতি স্কুল-কলেজেই থাকিবে, এবং যাহার কাজ হইবে মাঝে মাঝে ছাত্রজীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকগুলি আলোচনা করা, অর্থকরী বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে যথার্থ 'মানুষ' হওয়া যায় তাহার আলোচনা করা, এবং ছাত্রসমাজে অন্যায় বলিয়া যাহা মনে হইবে তাহার প্রতিরোধে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, তাহা হইলে অতি সহজে ছাত্রসমাজ হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত হইবে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলকর জীবনের দ্বারও উন্মুক্ত হইবে। অল্প কয়েকজন অকপট চরিত্রবান ছাত্র অগ্রণী হইলেই ইহা সহজে সংসাধিত হইবে। সংখ্যায় কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"চরিত্রই বাধাবিঘ্ন-স্বরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।" "বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরে যাহা করিতে পারে না—মুষ্টিমেয় কয়েকটি অকপট সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে।"

দেশের এই দুর্দিনে 'মানুষে'র একান্ত অভাব। দোষ কাহার তাহা শুধু প্রচার করিয়া লাভ নাই—ইহার প্রতিকারে বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে। ছাত্রগণকেই 'মানুষ' হইয়া ভবিষ্যতে নিজেদের চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এক সময় যেমন স্কুলে-কলেজে, গ্রামে-গ্রামে সর্বত্র ছাত্রসমাজে বহু বাধা সত্ত্বেও সংযমের দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ 'মানুষ' হইবার ব্যাপক প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, এবং সে প্রয়াস সাফল্যও আনিয়াছিল, সেই দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রয়াসের একান্ত প্রয়োজন এখন আসিয়াছে। দেশমাতৃকার সেবারূপে, নরনারায়ণের সেবারূপে গ্রহণ করিয়া যাহারা ইহাতে অগ্রণী হইবে, মানবকল্যাণে অবতীর্ণ স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ তাঁহাদের শিরে শতধারে বর্ষিত হইবে, "তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"

বুদ্ধদেব স্মরণে

স্বামী আদিনাথানন্দ

যখন অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরসর্বস্ব, নিষ্প্রাণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস কলুষিত, পরলোকে সুখলাভের উদ্দেশ্যে অবাধ পশুবলি ধর্মার্জনের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে বিবেচিত, যজ্ঞবেদীমূলে প্রাণিবধ অনুপাতে ধর্মলাভ সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত, পুরোহিতকুলের অপকৌশলে ভারতের ব্রাহ্মণেতর আপামর জনসাধারণ অজ্ঞান ও কুসংস্কারপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, বিদ্যাচর্চায় বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার, ক্ষত্রিয় রাজকুলের সহায়তায় ধর্মধ্বজী পুরোহিতকুলের প্রচণ্ড বিধি-নিষেধের নাগপাশে সমাজজীবন পঙ্গু, যূপকাষ্ঠ ও বধ্যভূমি হইতে উত্থিত অগণিত অসহায় নিরীহ প্রাণীর সকরুণ মর্মভেদী আর্তনাদে ও হাহাকারে পবিত্র সনাতন ধর্মের একটি বিকৃত রূপ প্রকাশিত, তখন বিধির বিধানে, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই অঙ্গীকার পালনার্থ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনুপমহৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি সমন্বিত গৌতম বুদ্ধ—ভারতের ত্রাণকর্তা ও 'এশিয়ার আলো'—ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একটি রাজবংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া। তাঁহার লোকোত্তর দিব্য জীবন ও সহজ সরল প্রাণস্পর্শী উদার বাণীর প্রভাব সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়াছিল। গ্রীস দেশে সক্রেটিস (Socrates) ও চৈনিক কনফুছে (Confucius) তাঁহার সমসাময়িক। উক্ত তিন জন লোকনায়কই যে মতবাদ প্রচার করিতেন তাহাতে নৈতিক আদর্শবাদ (Ethical idealism) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপার্থিব বিষয় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার পরিহার করিয়া, ইহজীবন ও সমাজজীবন যাহাতে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তাহার নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এমন এক আধ্যাত্মিক ভাবপ্লাবন প্রাচ্য ভূখণ্ডে উত্থিত হয় যে, সেই সময় হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে ও ভারতেতর দেশসকলে উহা বিস্তৃতি লাভ করে; বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাসে এক 'স্বর্ণযুগে'র সূচনা হয়।

বুদ্ধদেবের বাণী 'মৈত্রীভাবনার বাণী', যাহাকে অন্য কথায় বলা হয় 'ব্রহ্মবিহার।' মাতা প্রাণ দিয়া যেমন সর্বক্ষণ পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ অপরিমেয় প্রেমভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অহিংস ও নির্বিরোধ করিয়া উহাতে ঊর্ধ্ব অধঃ সর্ব-দিকে, সমগ্র জগতের প্রতি অপরিমিত দয়াভাব জাগ্রত করিতে হইবে। ইহাই গীতার 'ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

(গী ৫ম অঃ ১৯)

তিনি যে-ধর্ম প্রবর্তন করিলেন তাহার মূলকথা—অষ্টশীল অভ্যাস, সমাধি ও করুণা। এই তিনটি স্তর কার্যকারণ-সম্বন্ধে বিধৃত। একটির যথাযথ অভ্যাসে দ্বিতীয় অবস্থা লাভ হইবে এবং উহা হইতে তৃতীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটিবে। একটিকে বাদ দিলে অপরটি লাভ করা যাইবে না।

এদেশে ও পাশ্চাত্যে 'ধর্ম' সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা বর্তমান, শ্রীবুদ্ধের 'ধর্ম' তাহা হইতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস, আপ্তবাক্য বা কোনও প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থে (Book of Revelation) বিশ্বাস, অনুশাসনমূলক বহু আইনকানুন মানিয়া চলা, পৌরোহিত্যে আস্থা স্থাপন এবং কোনও গুরুস্থানীয় ব্যক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ। ভগবান তথাগত এই প্রকার ধর্মের বিরোধিতা করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাই তাঁহার ধর্মকে হিন্দু ধর্মের 'বিদ্রোহী সন্তান' (A rebel child) আখ্যা দিয়াছেন। বুদ্ধদেব ধর্মের সনাতন লক্ষ্যের উপরই জোর দিয়াছেন; তৎকালীন পৌরোহিত্য-শাসিত সমাজের জনগণকে নৈতিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কারণ পুরোহিতকুল ছিলেন স্বার্থান্ধ, স্বীয় অভ্যুদয়কামী এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অত্যন্ত গোঁড়া ও ব্যভিচারী; সর্বসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের কোনও চেষ্টাই তাঁহাদের ছিল না—কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান সাধন করাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন।

ভগবান তথাগত যুগপ্রয়োজনে বেদের 'কর্মকাণ্ড' পরিত্যাগ করিয়া 'জ্ঞানকাণ্ড' প্রচার করিয়া ধর্ম ও সমাজকে এক উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, বেদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হইয়াও মানবমন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে পারে এবং পরিশেষে মোক্ষলাভও করিতে পারে—প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ ও জীবনবিশ্লেষণ।

মানবমনের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে বিনাশ করিয়া তৃষ্ণাশূন্য পরম প্রশান্তির একটি অবস্থা লাভ করাই ধর্মের লক্ষ্য। পশুবলিদানে বা পুরোহিতকুলের সন্তুষ্টিবিধানেই সেই অবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে না। অথবা কেবল 'হে ঈশ্বর!' 'হে ঈশ্বর!' করিলেও সাহায্য নামিয়া আসিবে না। আত্মশক্তি-বলে নিজেকে উচ্চতর পবিত্র অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে। গীতায় বহু শ্লোকে এইভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেবের শিক্ষাপ্রণালী ছিল এইরূপ—সর্বপ্রথম অষ্টশীল অভ্যাস দ্বারা হৃদয় ও বুদ্ধি পবিত্র করিতে হইবে। ইহা সাধিত হইলেই জগৎ জীবন ও জীবের স্বরূপ প্রজ্ঞা-সহায়ে উপলব্ধি হইবে। এই প্রজ্ঞা বা বোধ লাভই অষ্টশীল অভ্যাসের চরম ফল। ভগবান তথাগত স্বীয় জীবনে ইহা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষমূলক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত অষ্টশীল বলিতে বুঝায়—সাধুদৃষ্টি, সাধুসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সৎপথে জীবিকার্জন, সৎচেষ্টা, সৎচিন্তা ও সাধুধ্যানে চিত্ত সমাহিত করা। ইহার সম্যক্ সাধনে চিত্তের নির্মল অবস্থা লাভ হয়। উক্ত শীল অভ্যাসের ফলে চিত্ত কামনাশূন্য হইলেই জীবের 'অহং-বোধ' নাশ হইবে—ইহাকেই তিনি বলিলেন নির্বাণলাভ অথবা বোধিলাভ। এই নির্বাণ একটি প্রশান্তিময় আনন্দময় অবস্থা, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—সুতরাং শূন্যস্বরূপ বলা হয়। বস্তুতঃ ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থিতি, কারণ নির্বাণলাভের পর জীবত্ব ঘুচিয়া যায়—শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে—ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। জীবত্বের অবসানে চিত্তে জাগিয়া উঠে 'অপার করুণা'। তখন তিনি 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'—এই ভাব লইয়া জগতে বিচরণ করেন। মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে 'বোধিসত্ত্ব' অবস্থা বলা হয়। হীনযানপন্থীগণ এই অবস্থা বোধগম্য করিতে সক্ষম নন, কারণ তাঁহারা শূন্যস্বরূপ হইতে চান—সব লয় করিয়া দিয়া। জাতকের মূল শিক্ষা এই যে, 'আত্মত্যাগ'-বলে বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ হয়।

বুদ্ধদেব বলিতেন—জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তারলাভই প্রকৃত জীবনসমস্যা, কারণ জীবন দুঃখময়। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা কি বস্তু—এই জাতীয় সমস্যা তর্কদ্বারা মীমাংসা করিবার চেষ্টা বৃথা। হৃদয় ও বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হইলে এই সকল তাত্ত্বিক সমস্যা মানুষ নিজেই সমাধান করিতে পারিবে; নির্মল বোধের উদয় হইলে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন অজ্ঞান থাকিবে না। মনে হয় সেইজন্য 'ঈশ্বর কি আছেন?'—এই প্রশ্ন করিলে ভগবান তথাগত মৌন থাকিতেন; ঈশ্বরতত্ত্ব ভাষায় বুঝান যায় না, কারণ উহা 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয়। যুক্তির অবতারণা করিলেই যুক্তিজাল বৃদ্ধি পাইবে—সমস্যার কোন সমাধান তাহাতে হইবে না।

তিনি কার্যকারণবাদ অনুসরণ করিয়া জন্মান্তরবাদ প্রচার করিলেন। সকল কর্মই ফলপ্রসূ; এবং কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীব-সত্তা বহুবার জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। অষ্টশীল অভ্যাসের দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে এই 'পুনরাবর্তন' বন্ধ হইয়া যায়।

তাঁহার মতে অজ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে সদসৎ কর্ম ও কর্মফল এবং তাহা হইতে জীবনমৃত্যুপ্রবাহের উদ্ভব। কামনানাশে দুঃখনাশ ও দুঃখনাশে পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। ইহা ইহ-জীবনেই লাভ করা সম্ভব। ইহা উপনিষদুক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ অনুগামী।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দরিদ্র জনগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত—এই সহানুভূতি মনুষ্য ব্যতীত অপর সকল প্রাণীর প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, "আমি দরিদ্রের জন্য, জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি। আমি প্রচলিত ভাষায় উপদেশ দিব।" যেকালে আসমুদ্রহিমাচল সংস্কৃত ভাষাকে 'দেবভাষা' বলা হইত এবং একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল, কথ্যভাষাকে অজ্ঞ ও মূর্খের ভাষা জ্ঞান করা হইত, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে বা গ্রন্থাদি উক্ত ভাষায় প্রণয়ন না করিলে অবহেলিত ও পণ্ডিতসমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত সেই কালে শাক্যমুনির এইরূপ সঙ্কল্প কিরূপ মহান ত্যাগ ও বিশাল হৃদয়ের নিদর্শন তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধদেব মানবিকতাবাদের (Humanism) প্রথম প্রচারক। তবে ইহা কিন্তু জড়বাদমূলক নহে। কারণ তিনি জীবসত্তার জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকার করিতেন।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব একটি কাজও, একটি চিন্তাও নিজের জন্য করেন নাই, সকলই পরার্থে করিয়াছেন। স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতার শেষভাগে শ্রীবুদ্ধকেই আদর্শ কর্মযোগী বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছেন। তিনি ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল কোন ভেদই রাখেন নাই; বলিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব অভিনিবেশ- ও পুরুষকার-বলে নির্বাণের পথের সন্ধান করিয়া লইতে সক্ষম। এই মহতী আশ্বাসবাণী পদদলিত অবহেলিত জনগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র তাঁহারা নবীন উদ্যম লাভ করিয়াছিলেন এবং দলে দলে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের উচ্চ হৃদয় লইয়া সমুন্নত চরিত্র গঠন করুক; ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব ধীশক্তি ও দার্শনিক চিন্তার সহিত বুদ্ধদেবের লোকোত্তর মহান হৃদয় ও অসাধারণ লোককল্যাণ-চিকীর্ষা সংযুক্ত হইলে আদর্শ চরিত্র গঠিত হইবে।

শ্রীবুদ্ধের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করিয়া আমরা সত্যই ধন্য। বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য ভগবান বুদ্ধদেবের সাম্যবাদ, জন্মান্তরবাদ উদার সহনশীলতা এবং 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্' প্রভৃতি শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবভূমি হইতে উন্নীত হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু'

স্বামী ধীরেশানন্দ

ভাবুক বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :--

'আমি সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' —ইহা ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতার খেদোক্তি নহে, ইহা যে সংসারে সকল প্রাণীরই চিরন্তন মর্মভেদী ক্রন্দন, হতাশার হাহাকার ধ্বনি! মানুষ কত আশায় বুক বাঁধিয়া অশেষ কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করে, ঘর বাঁধে, পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় এবং মনে করে যে অতঃপর সকলকে লইয়া নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে পরম শান্তিতে, মহাসুখে দিনাতিপাত করিবে। কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার অদৃষ্টদেব হাসেন। অদৃষ্টের অলংঘনীয় নিয়মে, নিষ্ঠুর দৈবের রূঢ়, নির্মম কশাঘাতে মানুষের এই সুখস্বপ্ন একদিন যেন তাসের ঘরেব ন্যায় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার বড় সাধের সাজানো বাগান যেন অকস্মাৎ শুকাইয়া যায়। তখন তাহার অশান্ত, শোকমুহ্যমান চিত্তে কেবল নৈরাশ্যের করুণ সুরটিই বাজিতে থাকে. জীবন দুর্বিষহ দুঃখময় বলিয়া মনে হয়. স্বামীজী বলিতেন—'দুঃখের মুকুট মাথায় পড়িয়া সংসারে সুখ আসিয়া মানুষের নিকট উপস্থিত হয়।' ইহা রূঢ় বাস্তব। সুখ ও দুঃখ মানুষের নিত্য-সহচর।

দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সকলেই নিজের অনুকূল বস্তুটি কামনা করে এবং স্বার্থবিরোধী পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সুখপ্রদ হইলে কোন বস্তুকে সে গ্রাহ্য মনে করে এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ দুঃখপ্রদ পদার্থকে সে ত্যাজ্য বলিয়া জানে।

মানুষ কি চায় না, অর্থাৎ কোন্‌টি তাহার ত্যাজ্য ইহাই প্রথম বিচার করা যাউক। এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবে যে দুঃখ কেহ চায় না। কিন্তু দুঃখ জিনিসটা কি? দুঃখ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ আছে কি? মনে হইবে. কেন, সর্প ব্যাঘ্র আদি পদার্থ কত দুঃখপ্রদ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে। সর্প তাহার নিকট কত প্রিয়! কত যত্নে সে উহাদের প্রতিপালন করে! শুনিতে পাওয়া যায়, স্নেহাস্পদ কন্যার বিবাহকালে সর্বাপেক্ষা ভাল অর্থাৎ বিষধর সর্পটি, খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জনের জন্য সে জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করে। সার্কাসওয়ালা ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। ব্যাঘ্র তাহার উপার্জনের সাধন, তাই ব্যাঘ্র তাহার নিকট প্রীতির বস্তু। ব্যাঘ্রীর নিকটও ব্যাঘ্র কত প্রিয়! সর্পব্যাঘ্রাদি কোন কিছুই একান্ত দুঃখপ্রদ নহে। সর্বথা হেয় বা ত্যাজ্য এরূপ কোন পদার্থই জগতে পাওয়া যায় না। আমাদের নিকট যাহা অতি ঘৃণিত, তাহাও কোন কোন জীবের ভোজ্যরূপে প্রিয়।

এভাবে যদি ইহাও বিচার করা যায় যে জগতে সকলে কি চায়, তাহা হইলে সকলে একবাক্যে বলিবে সুখ চাই, আনন্দ চাই! ধনী-ভিখারী-নির্বিশেষে সকলেই সুখ বা আনন্দ চায়। জগতে সকলেই সুখের পশ্চাতে ধাবমান। কিন্তু এই সুখ জিনিসটি কি? সুখ বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? লোকে মনে করে, কেন স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাহন, অন্ন—এই সবেতেই তো সুখ। কিন্তু স্ত্রী যদি সদা সুখরূপই হইত তবে সে-স্ত্রী কোন বিগর্হিত কর্ম করিলে লোকে তাহাকে ত্যাগ করে কেন? পুত্র যদি নিয়ত

সুখপ্রদই হইত তবে অযোগ্য, অবাধ্য ও নিন্দিত-কর্মকারী পুত্রের মুখদর্শনও লোকে করিতে চাহে না কেন? ধনেই যদি সুখ থাকিত তবে অশেষ-ঐশ্বর্যপালিত হইয়াও লোকে দুঃখী কেন? এইরূপে দেখা যায় যে, কোন পদার্থই একান্ত-ভাবে সুখপ্রদ বা সুখরূপ নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাহিরে সুখদুঃখ বলিয়া যদি কোন পদার্থই জগতে না থাকে, তবে লোকে যে সুখদুঃখ অনুভব করে তাহা কি?—ইহার উত্তরে বলা যায়, সুখদুঃখের অনুভব হয় মনে। অতএব, উহা মনেরই। সুখদুঃখ বলিয়া কোন জিনিস বাহিরে নাই। উহা মনের একটি ভাবনামাত্র। একই বস্তু মনে বিভিন্ন ভাবনা আনিতে পারে। বন্ধুসহ আমি কোথাও যাইতেছি। সম্মুখে একটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া আমি 'মা' 'মা' বলিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। বন্ধুর নিকট তিনি সাধারণ একজন মহিলা ছাড়া আর কিছুই নন। অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে 'ভগিনী' বলিয়া সম্বোধন করিল। কেউ বা তাঁহাকে 'কন্যা'রূপে বা অন্য কোনরূপে দেখিল। এখন এই নারীটি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। 'মা', 'ভগিনী', ইত্যাদি বাহিরে কিছুই নাই, এগুলি সবই বিভিন্ন ব্যক্তির মনোময়ী কল্পনা। বাহিরে কেবল একটি স্থূল দেহমাত্র বিদ্যমান। তাহাকেই স্ব স্ব ভাবনানুযায়ী কেহ মাতৃরূপে, কেহ বা ভগিনীরূপে, কেহ বা কন্যারূপে দর্শন করিতেছে। তেমনি সুখদুঃখ বলিয়াও কোন পদার্থই জগতে নাই। বাহিরে বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং যে পদার্থ যখন আমার অনুকূল বলিয়া মনে হয় তখনই সেটি আমার সুখপ্রদ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। সেই পদার্থই পরমুহূর্তে বা কালান্তরে প্রতিকূল মনে হইলে দুঃখপ্রদ বলিয়া ভান হয়। বিষয় কিন্তু নির্বিকার। বিষয়ের প্রতি স্বরচিত অনুকূলতা-বা প্রতিকূলতা-বুদ্ধিই আমার সুখদুঃখ অনুভবের কারণ।

কিন্তু সুখ বা দুঃখ যখন আমরা অনুভব করি, সে অনুভবও তো স্থায়ী হয় না। সুখ অনুভব করিতেছি কিন্তু চিত্ত অন্য ব্যাপারে যখনই লিপ্ত হইল তখনই সে সুখানুভবও বিলুপ্ত হইল। তদ্রূপ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে যখনই চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইল দুঃখও তখনই অদৃশ্য হইল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অনুভবকালেই কেবল সুখদুঃখ বিদ্যমান। ঐ অনুভবের পূর্বে বা পরেও তাহা নাই। অসহ্য দেহব্যথায় কাতর ব্যক্তিও যখন মূর্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে তখন আর তাহার সে দুঃখবোধ থাকে না। কিন্তু পুনঃ জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতে থাকে। পুত্রশোকাতুরা মাতাও গভীর নিদ্রাকালে পরমসুখে মগ্ন হইয়া থাকে, তখন কোন শোক, কোন দুঃখবোধও তাহার থাকে না। দুঃখবোধ করিবার করণ মনটিও তখন নাই। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রতে মন উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই শোক, দুঃখবোধ ফিরিয়া আসে। সুতরাং সুখদুঃখ মনঃসমকালীন। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় মন আছে তখনই সেই অবস্থায় সুখদুঃখ আছে, আর যখন মন নাই তখন সুখদুঃখও নাই। অনুভব বা জ্ঞানকালেই সুখদুঃখের বিদ্যমানতা বা সত্তা। অনুভবের পূর্বেও ইহা নাই এবং পরেও ইহা থাকে না। ইহাকেই বেদান্তে বলে 'জ্ঞাত সত্তা' বা 'জ্ঞানসমকালীন সত্তা' বা 'প্রাতিভাসিক সত্তা'। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি কেবল একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, সুতরাং উহা মিথ্যা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ স্বপ্নকে লওয়া যাউক। স্বপ্নে কত কি বিচিত্র সৃষ্টি, কত

অভিনব পদার্থই না মন কল্পনা করিয়া থাকে! কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বস্তুতঃ কিছুই নাই। মনের কল্পনাকালেই উহাদের স্থিতি। স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও ঐ পদার্থসমূহ ছিল না এবং স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও উহাদের আর দেখা যায় না। কেবল স্বপ্নানুভবকালেই ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ও সেগুলিকে বাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। জাগ্রতে ফিরিয়া আসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট-পদার্থের আর কোন বাস্তব সত্তাই অনুভূত হয় না।

সেইরূপ যখন স্বপ্নানুভব হয় তখন জাগ্রৎ পদার্থও আর থাকে না এবং উহার অনুভবও হয় না। স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থায় মন উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রৎ সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। পুনরায় মন স্বাপ্নসৃষ্টি কল্পনা করিতে থাকিলে এই বিশাল জাগ্রৎপ্রপঞ্চ আর থাকে না। সুষুপ্তি-অবস্থায় যখন মন বিলীন হয় তখন পূর্বোক্ত উভয় সৃষ্টি এবং তদনুভবও আর ভান হয় না। এইরূপে দেখা গেল যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই মনঃসমকালীন বা অনুভবসমকালীন। অতএব এই উভয় অবস্থা এবং অবস্থাগত পদার্থসমূহও জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ প্রাতিভাসিক, শুধু একটা সাময়িক প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা।

কিন্তু 'আমি' থাকি। এই নিয়ত-পরিবর্তনশীল তিন অবস্থায় 'আমি' সতত বিদ্যমান। অবস্থাগুলি পরস্পর পৃথক, এক অবস্থায় অন্য অবস্থা থাকে না, কিন্তু 'আমি' এই সর্বাবস্থাগুলির মধ্যে একভাবে 'অনুগত' হইয়া আছি। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থা ও তাহার সুখদুঃখাদি ধর্ম হইতে 'আমি' পৃথক্, ইহাই স্পষ্ট অনুভব হয়।

সুষুপ্তিতে মহা আনন্দ, মহা সুখ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সংখ্যাতীত মানঅভিমান, আশানৈরাশ্য, ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ নিরন্তর অনুভব করিয়া জীব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে ও একটু সুষুপ্তিসুখের জন্য লালায়িত হয়। কষ্টলব্ধ প্রভূত ধনের বিনিময়েও সে একটু সুষুপ্তিসুখ লাভার্থ ব্যাকুল হয় ও সেজন্য কত চেষ্টাই না সে করিয়া থাকে! সুষুপ্তিতে এত আনন্দ আসে কোথা হইতে? সুষুপ্তিতে কোন দুঃখ থাকে না; তাহার কারণ দুঃখের নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই সব কিছুই সেখানে নাই। সেখানে থাকি কেবল একা 'আমি'। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইল যে যখন আমাতে একমাত্র 'আমি' থাকি তখনই সুখ। অর্থাৎ সুখ আমারই স্বরূপ। জগতের কোন সুখই সুষুপ্তি-সুখতুল্য নহে। মন বুদ্ধি আদি আগন্তুক উপাধিগুলি আসিয়া হাজির হইলেই যত দুঃখদ্বন্দ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন 'আমি' তাহাদের সহিত জড়িত হইয়া নিজেকে সুখী-দুঃখী, কর্তা-ভোক্তা মনে করিয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকি।

শংকা হইতে পারে যে, সংসারেও তো লোকে সুখ ভোগ করে। হাঁ, করে, কিন্তু তাহা কতটুকু? দেখিতে দেখিতে উহা যেন কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায় এবং পরিণামে দুঃখই দিয়া থাকে। সাংসারিক সুখ যেন বিষসংপৃক্ত মিষ্টান্ন। মানুষের চিত্ত বিষয়-ভোগলালসায় সদা চঞ্চল, তাই সে দুঃখী। চাঞ্চল্যই দুঃখ। প্রভূত আয়াসে প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তিতে চিত্ত যখন ক্ষণিক শান্ত হয় তখন সেই শান্তচিত্তে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাই বিষয়ানন্দ বা বিষয়সুখ। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, আনন্দ বিষয়ে নাই। শান্ত চিত্তে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা আমার স্বস্বরূপভূত আনন্দেরই অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। চঞ্চল জলের উপরিভাগে যেমন চন্দ্রবিম্ব সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হয় না, স্থির জলই সম্যক্ প্রতিবিম্বধারণে সমর্থ, ইহাও তদ্রূপ।

কিন্তু এই বিষয়ানন্দও নিন্দিত, বিনাশী ও দুঃখরূপ বিষয়সহচারী বলিয়া বিনাশী ও সর্বথা ত্যাজ্য। শুদ্ধদর্পণতলে প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডলই সকলের প্রিয় হইয়া থাকে, অশুচিপদার্থপূর্ণ ভাণ্ডে বা সুরাপাত্রে প্রতিবিম্ব-দর্শনে কেহ রুচি প্রকাশ করে না, বিষয়ানন্দও তদ্রূপ। বিষয়ানন্দও স্বরূপানন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। ঐ স্বরূপানন্দেরই অধিক প্রকাশ হয় সুষুপ্তিতে। কিন্তু উহাও অজ্ঞান-ব্যবহিত বলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপটির পূর্ণ অভিব্যক্তি তখনও হয় না। কিন্তু যেটুকু হয় তাহাতেই সর্বজীব পরিতুষ্ট, এবং উহার তুলনা জগতে পাওয়া যায় না। জাগতিক কোন আনন্দই সুষুপ্তির আনন্দসহ তুলিত হইতে পারে না, ইহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ। আবার, বিচারজনিত জ্ঞানসহ মন যখন স্বস্বরূপে স্থিত হয় তখন নির্দ্বৈত ও অজ্ঞানাবরণবিরহিত যে স্বরূপানন্দ অভিব্যক্ত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সুষুপ্তির আনন্দও তাহার নিকট তুচ্ছ।

সুতরাং দেখা গেল স্বস্বরূপে স্থিত থাকাই সুখ। স্বস্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটিলেই দুঃখ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, মানুষ যখন সুস্থ থাকে, ভাল থাকে, তখন তাহাকে, 'কেন ভাল আছ' বা 'কেন সুখে আছ'—এরূপ প্রশ্ন কেহ করে না। কিন্তু যদি কেহ বলে, 'বড় কষ্টে আছি' 'বড় কষ্টে দিন কাটিতেছে'—তখন লোকে তাহার দুঃখের কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাহা স্বাভাবিক অবস্থা, সে বিষয়ে কাহারও শংকা হয় না। অগ্নি উষ্ণ। তাহা কেন উষ্ণ, এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে না। জল শীতল। উহা কেন শীতল, এ প্রশ্নও কেহ করে না। কারণ উহা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বিপরীত হয় তবে লোকে প্রশ্ন করে। যদি অগ্নি শীতল ও জল উষ্ণ হয় তবে লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি করিয়া উহা সম্ভব হইল, কোন্ নিমিত্তবশতঃ উহা ঘটিল। সেইরূপ সুখে থাকাই জীবের স্বভাব। কারণ সুখ তাহার স্বরূপ। তাই সুখে থাকিলে অর্থাৎ স্বরূপে থাকিলে কোন প্রশ্ন হয় না, নিজের মনেও কোন অশান্তি জাগে না। দুঃখ অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতি ঘটিলেই প্রশ্ন হয়, অশান্তি হয়—কেন ওরূপ হইল এই শংকা মনে জাগে। অতএব স্বস্থতাই সুখ ও অস্বস্থতা অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতিই দুঃখ।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্তি যখন বহুলাংশে স্বস্থতাবশতঃ একটি পরম আনন্দময় অবস্থা, তখন উহাই কাম্য এবং কুম্ভকর্ণের ন্যায় সকলের কেবল সুষুপ্ত হইয়া থাকিবারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে? উহাও একটি অজ্ঞানময় অবস্থাবিশেষ। জাগ্রৎ- ও স্বপ্ন-ভোগপ্রদ কর্মক্ষয়ে সুষুপ্তি-অবস্থা জীবের স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উহা জীব স্বেচ্ছায় করিতে পারে না। চেষ্টা করিলেও কেহ ইচ্ছামত সুষুপ্ত হইতে পারে না। চেষ্টা করিতে গেলে স্বপ্নই বৃদ্ধি পাইবে, সুষুপ্তি আসিবে না।

তবে দুঃখসাধন দেহ, মন, বুদ্ধি আদির সাহচর্য রহিত হইয়া পরম আনন্দময় স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার উপায় কি?—উপায় বিচার। মন, বুদ্ধি আদিই দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ আমাতে আনয়ন করতঃ বিবিধ দ্বন্দ্ব ও দুঃখের দুর্নিবার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই মন, বুদ্ধি আদি সবই আগন্তুক, জাগ্রৎ ও স্বপ্নে থাকে কিন্তু সুষুপ্তিতে থাকে না। ইহারা আগমাপায়ী, নিয়ত-পরিবর্তনশীল ও অনিত্য বলিয়া একান্তই মিথ্যা। এখন মনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র বিচার। সমাধি আদির অভ্যাস মনকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র। উহার বিলোপ

করিতে পারে না। ব্যবহারকালে যে 'অহং' —'আমি' 'আমি' করে, সে 'অহং'ও তো সুষুপ্তিতে থাকে না। কিন্তু 'আমি' তখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাই কি? কখনই নহে। 'আমি' থাকি—ইহাও সকলের অনুভবসিদ্ধ কথা। মন, বুদ্ধি, অহংকার রহিত সেই 'আমি'ই আসল 'আমি'। উহাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উহা অনুভবমাত্রস্বরূপ। সেই 'আমি'ই জাগ্রৎ ও স্বপ্নে আগন্তুক মনবুদ্ধিসহ জড়িত হইয়া মিথ্যা অহংকারের রূপ ধারণ করি এবং তখন সংসারে অশেষ দুঃখের স্রোতে ভাসিয়া চলি।

বেদান্তশাস্ত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞানদ্বারা 'হৃদয়গ্রন্থিভেদের' কথা বলিয়াছেন। এই গ্রন্থিভেদ হইলেই সর্বসংশয় দূর হয়, পাপপুণ্য সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়, সর্বদুঃখনিবৃত্তি হয় এবং পুরুষ স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া পরম আনন্দময় অবস্থালাভে কৃতকৃত্য হন। এখন এই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদের' অর্থ কি? কত লোকে ইহার কত বিভিন্ন ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন! সরল সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—হৃদয় অর্থ মন বা বুদ্ধি। উহার ভেদ অর্থ উহার নাশ অর্থাৎ উহার অসত্তাবোধ, মন, বুদ্ধি আদি বস্তুতঃ নাই, এইটি জানা। বস্তুতঃ মন, বুদ্ধি আদি কোন পদার্থই যে নাই, এগুলি প্রাতিভাসিক, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র, এবং একমাত্র আত্মাই—'আমি'ই—সর্বাবস্থায় একরূপে নির্বিকার থাকিয়া সদা বিদ্যমান—এইটি জানার নামই 'হৃদয়গ্রন্থিভেদ।'

কিন্তু মন বুদ্ধি আদির বিদ্যমান দশাতে অর্থাৎ জাগ্রতে (স্বপ্নের মন ও তাহার কার্য সব কিছুই প্রাতিভাসিক ইহা সর্বলোকসম্মত, তাই কেবল জাগ্রতের কথাই ধরা হইল) যতই কেহ বিচার করুক না কেন যে মন আদি বস্তুতঃ নাই, একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র,—সে জ্ঞান কখনও অপরোক্ষ হইবে না,—উহা পরোক্ষই থাকিয়া যাইবে। কারণ তৎকালে, বিচারকালে সাক্ষাৎ মন রহিয়াছে, সুতরাং কি করিয়া বোঝা যাইবে যে মন নাই? সেইজন্য তৎকালে সাধকের এমন একটা অবস্থার স্মৃতির প্রয়োজন, যখন মন থাকে না; যেমন সুষুপ্তি বা সমাধি। সমাধি তো আর সকলের হয় না? কিন্তু সুষুপ্তি অল্পবিস্তর সকলেরই হয়। সুষুপ্তিকালে মনবিহীন 'আমি' থাকি। এটি সকলেরই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতিসহ যদি জাগ্রতে কেহ বিচার করে যে জাগ্রতেও মন বস্তুতঃ নাই, তাহা হইলেই জাগ্রৎকালেও মনের অভাব প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে ও মনরহিত এক সুখস্বরূপ 'আমি'ই অবশেষ থাকিয়া যাইব। এই বিষয়ে স্ফটিক ও জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে কখনও স্বচ্ছ স্ফটিক অন্যকালে দেখে নাই, স্ফটিকের সম্মুখে জবাকুসুম যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সে কখনই এবং কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিবে না যে স্ফটিক স্বচ্ছ, লাল নহে। তাহাকে অন্যত্র স্বচ্ছ স্ফটিক দেখাইলে পর সেই স্মৃতিবলে সে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবে যে স্ফটিক স্বচ্ছ, জবাকুসুম-সান্নিধ্যে রক্ত স্ফটিক দৃশ্যমান হইলেও স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে, স্ফটিকের রক্তিমা জবাকুসুমরূপ উপাধিনিবন্ধন মিথ্যা প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। তখনই স্ফটিকের স্বচ্ছতার অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার হইবে।

এইরূপ বিচারসহায়ে দেহাদি সর্বপদার্থের পারমার্থিক সত্যত্ববুদ্ধির নিঃশেষে বিলোপ ঘটিয়া থাকে এবং স্বস্বরূপভূত ও সুখস্বরূপ আত্মাতেই স্থিতিলাভ হয়। এই স্বরূপস্থিতিই মোক্ষ। পরমানন্দপ্রাপ্তি বা সর্বদুঃখনিবৃত্তি ইহারই নাম।

অতএব দেখা গেল যে, অর্থবুদ্ধি বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুঃখনিবৃত্তি হয়

না। দেহাদি বিষয় আছে, ইহা সত্য—এই বুদ্ধি থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। বাহ্য বিষয় ও দেহাদি পদার্থ কিছুই বস্তুতঃ নাই, কেবল মিথ্যা প্রতীতিমাত্র—ইহা জানিতে পারিলে তবেই যথার্থ সুখপ্রাপ্তি, আত্মস্থিতি বা দুঃখনিবৃত্তি হয়। এ কথাই কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্বীয় অনুভববলে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

'ন জারা জায়েগা জবৃতক্
নজারা নামরূপোঁকা।
ন জব্ জায়ে নজর তবৃতক্
নিঠুর দুঃখ দুইকী॥'

—যতক্ষণ পর্যন্ত নানারূপাত্মক দ্বৈতের নজর অর্থাৎ সত্যবুদ্ধি জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠুর দ্বৈত-দুঃখ কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

অর্থবুদ্ধি না করিলে অর্থাৎ অর্থাধ্যাস ত্যাগ করিলে থাকে শুধু জগতের প্রতীতিমাত্র। প্রাতীতিক জগৎ লইয়া ব্যবহারে শুধু বিনোদই হয়। অর্থবুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের সত্যত্ববুদ্ধিই দুঃখের হেতু। অর্থবুদ্ধি না থাকিলে বিক্ষেপ, অশান্তি, দুঃখ কোথায়? দ্বৈত ছাড়িয়া মানুষ যাইবে কোথায়? যাইবার তো জায়গা নাই। **সুতরাং দ্বৈত নাই, অর্থাৎ উহার সত্যত্ব-বুদ্ধিত্যাগই দ্বৈতের ত্যাগ।** দুঃখদ দ্বৈতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় এই ত্যাগ—ইহাই সর্ব বেদান্তও একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তখন কেবল আনন্দ। প্রতীতিমাত্র, মিথ্যা দ্বৈতের খেলা দর্শনে তখন আনন্দই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ হইতে পারে না। ঐন্দ্রজালিকের মিথ্যা ক্রীড়াদর্শনে সকলের বিনোদমাত্রই হয়, কোন বিক্ষেপ বা দুঃখ কাহারও হয় কি?

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় আমাদের প্রাকৃতিক পাঠশালা। এই পাঠশালায় আমাদের শিক্ষণীয়—এই বিচার। এই বিচার কোন দেশ, কাল বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ, সীমিত নহে। ইহা সার্বজনীন। স্বানুভূত এই অবস্থাত্রয়ের বিচার সহায়েই ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জগতের সকলেই স্বস্বরূপ-স্থিতিরূপ পরমলক্ষ্যে পৌঁছিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। ইহাই বেদান্তোক্ত অসাম্প্রদায়িক সাধন এবং ইহাই সার্বজনীন শ্রেয়োমার্গ শাশ্বত সুখলাভের উপায়।

"বাণীর অমৃত ঢালো"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঘনতমসায় সব ডুবে যায়!
অকাশ কালোয় কালো!
হে রামকৃষ্ণ! আনো দিগন্তে
নবীন ঊষার আলো।
হেথা যেন কেহ দুখী নাহি রয়!
সকলেই হোক্ আনন্দময়,
নিরাময়, সবে সবার মাঝারে
দেখে যেন শুধু ভালো!

তুমি বলে গেলে, 'কারে দিবে ফেলে?
সবই সেই নারায়ণ!
শুষ্ক তুলসী—ঠাকুর-সেবায়
তারও আছে প্রয়োজন!'
যত মত তত পথ—এই কথা!
নব-জীবনের শোনালে বারতা!
যুগের তৃষিত অধরে তোমার
বাণীর অমৃত ঢালো!

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আপনার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় মিল এই যে আপনিও মানেন যে, ধর্মীয় অনুভব উপলব্ধি যার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে সে ধর্ম সম্বন্ধে অনুভবের বাইরের কোনো সাক্ষীরই প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে না। সে বলে তার দেখার কথা, শোনার কথা, অনুভবের কথা, যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" আমি জানি সেই সূর্যকল্প মহাপুরুষকে যিনি অজ্ঞান তমসার যবনিকার আড়ালে দাঁড়িয়ে। অথবা বৃহদারণ্যকের (২.৪.৫): "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো, *নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—"শুধু আত্মাকেই দেখা চাই, শোনা চাই, জানা চাই, চেনা চাই।"* আপনি আরো লিখেছেন: "যারা অবৈজ্ঞানিক হিসেবে জানে যে, পায়ের নিচে মাটিও আছে, আর মাথার উপরে আকাশ আছে তাদের পক্ষে এইটেই সুখবর যে, বৈজ্ঞানিকরা এখন শুধু 'মাটি ছাড়া আর কিছু জানবার নেই'—এমন কথা আর জোর ক'রে বলছেন না, আকাশের দিকে চাওয়াকেও আর মূর্খতা ব'লে অবজ্ঞা করছেন না।"

এ-কথায় সায় দিয়েও আমার শুধু এইটুকু টুকবার আছে যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের মনে বিজ্ঞানের সর্বার্থসাধিকা শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে বলেই তাঁদের সুর ফিরেছে। রাসেল এতে বেশি দুঃখ পেয়েছেন দুটি কারণে। প্রথমটির কথা বলেছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডির ভিতরকার রূপটা খুলে দেখাতে: যে, যুক্তিতে বিশ্বাসও মূলতঃ অন্ধ বিশ্বাস, হিউমের এ-অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ তিনি খাড়া করতে পারছেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে বেজেছে এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের যে-সন্ধানের ফলে মানুষের শক্তি বাড়ছে তার মান হু হু ক'রে বাড়লেও যে-বিজ্ঞান নিছক সত্যসন্ধানী তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আজ মুমূর্ষু।*

একে আমি নাম দিয়েছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডি এজন্যে নয় যে, আমি রাসেলের সঙ্গে একমত যে, বিজ্ঞানে শ্রদ্ধাকে আজ মুমূর্ষু বলা চলে বিজ্ঞানের শক্তিমত্তায় শ্রদ্ধা বাড়ার জন্যে। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি—বিজ্ঞান প্রথম দিকে যে ভাবত সে সবজান্তা ও সবপার্তা হ'তে পারে, তার এ-বিশ্বাস তাকে ভুল পথে চালিয়েছিল ব'লেই সে ধর্মকে মিথ্যা দিশারি নাম দিয়ে অপদস্থ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু রাসেল প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানপূজক এ-অত্যুক্তি করলেও মানুষের মন থেকে ধর্মের মূলোচ্ছেদ করা শুধু যে সহজ নয়, তাই নয়, করতে গেলে সে এমন অথই জলে পড়ে যে তার শেষটা মনে হয়ই হয় যে, ধর্ম আত্মা ভগবান পরকাল প্রভৃতি যদি সবই মিথ্যা হয়, যদি এই কথাই সত্যি হয় যে, এ-বিশাল অচেতন

---

* J. B. S. Haldane তাঁর Inequality of Man-এ "A Mathematician Looks at Science" প্রবন্ধে লিখছেন: "I feel that Russell's preoccupation with mathematical physics is largely responsible for the pessimism which attributes to scientists. He writes: 'While science as the pursuit of power becomes increasingly triumphant, science as the pursuit of truth is being killed by a scepticism which the skill of the men of science has generated'." (p. 240)

গতিশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী নামে জীবজগতে চেতনার জন্ম হয়েছে দৈবাৎ, অথচ মরণ নিশ্চিত (থার্মডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় বিধান অনুসারে—তার পরে আমরা কেউ থাকব না শুধু কোটি কোটি নিশ্চেতন শক্তি-পারাবার নাহক ছুটোছুটি ক'রে চলবে—কত কোটি বৎসর, কে জানে ?) তাহ'লে এ-বাঁচা তো বিড়ম্বনা। কেনই বা মানুষ স্বপ্ন দেখবে শিব সত্য সুন্দর চিরন্তনের ? সে বলবেই বলবে : এ-সৃষ্টি যদি নিরর্থক, লক্ষ্যহীন দাপাদাপি মাত্র হয় তবে এসো যে যতটা পারি ভোগ ক'রে নিই- eat drink and be merry for tomorrow we die, ওরফে চার্বাকের ভাষণে : "যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

ট্র্যাজিডি এল বিজ্ঞানের গোড়াকার উপপত্তিটিই (premise) ভুল ছিল ব'লে : যে, এ-বস্তুবিশ্বের মূল উপাদান জড় কিনা অচেতন, এবং এহেন জড় জগতে জীবের প্রাণ মন চৈতন্য এ সবই অবান্তর, অন্তিম সত্য হচ্ছে এর জাড্য, ওরফে অচেতনতা। তাঁরা মহাত্মা মহাপুরুষদের এজাহার সরাসর অস্বীকার ক'রে বললেন : "ওঁদের কথা আমরা মানতে যাব কী দুঃখে যখন আমার বিশ্লেষণী বুদ্ধির সৃষ্ট বকযন্ত্রে ভাগবত চেতনার রসের ছিটে ফোঁটারও দেখা পাচ্ছি না ?" মহাপুরুষেরা বললেন : "যে-বিশ্বচৈতন্যের রসের খবর পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি, সে-ভূমাকে দেখে জেনে চেখে চিনে তুমিও ধন্য হ'তে পারো যদি চাও। কিন্তু চাইলে ছাড়তে হবে এই দাবি যে, তিনি দেখা দেবেন তোমার সর্তে তোমার বকযন্ত্রে —তোমার স্ট্যাটিষ্টিক্সকে মান দিতে। বলতে হবে তোমাকেও : আমি তোমার শরণ নিলাম তুমি আমাকে গ্রহণ ক'রে আমাকে দেখা দিয়ে কোলে তুলে আমাকে ধন্য করো। তোমার কী ইচ্ছা আমাকে জানাও আমার চেতনাকে তার প্রামাণিক জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে।" বৈজ্ঞানিক একথায় রেগে ওঠে বললেন : "অসম্ভব। আগে থাকতে মেনে নেব কেমন ক'রে ? আগে জানব তবে মানব।" মহাপুরুষ বললেন হেসে : "এ-সর্ত ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব। কেননা তাঁর বিধান—আমরা জেনেছি প্রত্যক্ষভাবে—আগে মানলে তবে জানতে পারবে।" এরই খৃষ্টান নাম—meekness ওরফে humility, সংস্কৃত নাম—দীনতা, শরণাগতি। মহাপুরুষ বললেন, অনুকম্পায় গ'লে "আনন্দের সমুদ্র তোমার আশপাশে ব'য়ে চলেছে বন্ধু, কিন্তু তার সঙ্গে যোগসূত্র তোমাকে অর্জন করতে হবে যদি সে-আনন্দসাগরে স্নান ক'রে ধন্য হ'তে চাও। এ-যোগসূত্রের একটিমাত্র পথ আছে : তোমার ক্ষুদ্র অহং-এর দাবিকে নাকচ ক'রে মাথা নোয়াতে হবে অজানা সত্তার কাছে অন্তরের দিশাকে বরণ ক'রে প্রশ্নসংশয়দের দাবিদাওয়াকে দাবিয়ে রেখে।" বৈজ্ঞানিক বললেন : "অসম্ভব। যে-পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিসংখ্যানের পথে চ'লে আমি আজ জগন্নাথ হয়েছি সে-পদবী আমি ছাড়তে নারাজ।" মহাপুরুষ বললেন হেসে : "বেশ, তবে চলো এই মিথ্যে পদবীর ঘোড়শোয়ার হ'য়ে তোমার সীমাবদ্ধ যুক্তিবিচারকে লাগাম ক'রে, দেখ ঘুরেফিরে—ওপথে যা পাও তাতে মন ভরে কি না। আমার মন যে-পথে ভরেছে সেপথে আমি চলব। কেবল ব'লে রাখি—লিখে রাখো—যে, এই গোয়ালে একদিন না একদিন সবাইকেই মাথা মুড়তে হবে—এই শরণাগতির আবাহনের মন্ত্র জপ ক'রে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—যদি মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হ'তে চাও। তাই এখন আসি। যখন দেখবে

যে তোমার পথে চ'লে না পাবে মনে শান্তি, না আনতে পারবে তা জগতে—গণমনের আসুরিক প্রবৃত্তিরা আস্কারা পেয়ে সুরু করবে সৃষ্টি করতে মারণাস্ত্র (যার শেষ পরিণতি আণবিক বোমা); যখন দেখবে যে, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতার নানা আবিষ্কারে মানুষের বাহ্য সমৃদ্ধির চাবিকাঠি মিললেও কোনো গভীর আন্তর সার্থকতার দিশা মেলে না, প্রেম জাগে না, প্রাণের ভাষা থাকে না, বুকের মধ্যে কেবল শূন্যতার হাহাকারই ফুলে ওঠে, তখন হয়ত আসবে তোমার চিত্তে সেই দীনতার ডাক যে অন্তরদেবতাকে বলে: "আমি চাই অমৃত হ'তে, কেবল তার পথ জানি না, তুমি পথ দেখাও—কারণ আমি জেনেছি যে, এ-ভাবের সুর আমার হৃদয়ে জেগেছে তোমারি কৃপায়। সেই কৃপাকেই আমি চাই আরো পূর্ণভাবে পেতে, যে-আলোর কণিকা দিয়েছ আমাকে তাকেই জ্বালিয়ে রেখে পথ খুঁজে পাবই পাব কেন না আমি জানতে পেরেছি যে এই-ই তোমার বিধান।"

বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞ হেসে এ-সুরকে মিডীভাল (সেকেলে) ব'লে বাতিল করলেন ব'লেই দেখতে পেলেন না যে, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই এই শ্রদ্ধার বীজ থাকলেও তাকে লালন না করলে ফসল ফলে না। কিন্তু ক্রমশঃ পরে যখন দেখলেন যে কোনো প্রশ্নেরই চরম উত্তর মানস বুদ্ধিবিচারের পথে পাওয়া যায় না, মনের কালি কাটে না, স্বভাবের বর্বর নিচুটান কাটানো সময়ে সময়ে অসম্ভব হ'য়ে অশান্তিতে মন অন্ধকার হ'য়ে আসে তখন গভীরদর্শী কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে দাবিয়ে-রাখা ধর্মে-শ্রদ্ধার চারাগাছ ফের মাথা তুলল, তাঁরা একটু একটু ক'রে এই কথাটি বুঝবার কিনারায় এলেন যে, বিজ্ঞান ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারলেও অপ্রমাণ করতেও যখন পারে না, তখন মহাপুরুষদের কথায় কান দিয়ে তাঁদের নির্দেশপথে চলতে চেষ্টা করতে যদি নাও পারি তাহলেও যাঁরা সেপথে চ'লে অনেক কিছু আনন্দময় সত্য উপলব্ধি করছেন তাঁদের এজাহারকে বাতিল করা হবে অযৌক্তিক। যে-পথে চ'লে তাঁরা অধ্যাত্ম-সত্যের দেখা পেয়েছেন সে-পথে না চ'লেই তার লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মত দেওয়া হবে গাজোয়ারি ঔদ্ধত্য। এই কথাটিই বড় চমৎকার ক'রে বলেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স জীন্‌স তাঁর অনবদ্য THE MYSTERIOUS UNIVERSE-এর শেষ অধ্যায়ে। এখানে এ-অধ্যায়টির চুম্বক দেওয়ার স্থান নেই। তবু তাঁর শেষের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

তিনি অগ্নিময় ব্রহ্মাণ্ডের বেগময় সত্তার পরিচয় দিয়ে বলছেন যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকের কাছে এ-ব্রহ্মাণ্ডকে আর মনে হয় না এক বিশাল যন্ত্র যে গাণিতিক ভঙ্গিতে চলেছে তার নির্দিষ্ট পথে; মনে হয় বরং এক বিশাল চিন্তার আধার যেখানে মন বস্তুর স্রষ্টা তথা নিয়ন্তা হ'তে চলেছে—খণ্ড মন নয় অবশ্য—সেই মহামন যার অতল গর্ভে অণুপরমাণুর নিত্য অধিষ্ঠান। বলতে সুরু করেছেন তিনি বিনয়ী ভঙ্গিতেই যে, এক সময়ে আমরা বিজ্ঞানের সত্য-আবিষ্কারের ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই কেন না বড়াই ক'রে থাকি—"No scientist who has lived through the last thirty years is likely to be too dogmatic either as to...the direction in which reality lies." বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট অ্যালেকসিস ক্যারেল তাঁর যুগপ্রবর্তক MAN THE UNKNOWN-এ এই কথাটিই বারবার বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে বিজ্ঞান এতদিন

কেবল বাহ্য বস্তুজগতেরই খবর চেয়ে এসেছে —সে-খবর পেয়ে সে যথেষ্ট লাভ করেছেও বটে, কিন্তু তবু—বলছেন তিনি জোর দিয়েই—বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুধু মানুষের বাহ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান নয়, তাকে চাইতে হবে মানুষের আন্তর (আধ্যাত্ম) সাধনা মানুষের কাজে লাগতে। তাই "As much importance should be given to feelings as to thermodynamics. It is indispensable that our thought embraces all aspects of reality."* কারণ আমাদের সন্ধানী চিন্তা মানুষকে সমগ্রভাবে নিরীক্ষা পরীক্ষা না করলে হবে যা হয়েছে (হায়রে!): "We have gained the mastery of everything which exists on the surface of the earth, excepting ourselves."† এ-যুগের আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জে. বি. রাইন তাঁর বিখ্যাত NEW FRONTIERS OF THE MIND-এও ক্যারেলের সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, অবশেষে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আজ, তাই এতদিনে আমাদের চোখে পড়েছে আমাদের সমাজের সত্যি সত্যি কী টলমলে অবস্থা, আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সব অবস্থা জানতে হবে আমাদের নিজেদেরকে, নৈলে আমাদের দুরবস্থার নিরসন হবার নয়।···কারণ যথার্থ আত্মজ্ঞান না হ'লে আমরা আগেকার যুগের মতন চলব সেই সনাতন হাৎড়ে হাৎড়ে চলার পথে—আর এভাবে চলার পথে যে বিপদ সমূহ তা কি আর বলতে হবে?[১]

এ-বিপদ যে কী তা কি আজ কারুর অজানা আছে দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের নরকতাণ্ডবের পর? বিজ্ঞান ভেবেছিল যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষকে প্রকৃতির নানা শক্তির 'পরে কর্তৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামরাজ্য আসবেই আসবে—সৌভ্রাত্রের হাটে বসবেই বসবে সমৃদ্ধির অফুরন্ত আনন্দমেলা—দেখতে দেখতে পত্তন হবেই হবে বিশ্বসাম্রাজ্যের (one world, one empire) যেখানে নানাজাতি দেবে প্রেমের রাজকর—যে-রাজ্যের কথা Norman Angel তাঁর The Great Illusion সর্বপ্রথম বইটিতে এঁকেছিলেন মোহন রঙে পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-বর্বর অসুরের বাস তাকে না স্থানচ্যুত করতে পারলে কে বসাবে এই রামরাজ্য? বার্নার্ড শ মিথ্যা বলেন নি যে মানুষের নানা আসুরিক প্রবৃত্তিকে যদি বিশ্ব-প্রেমের কাছে দীক্ষা নিতে বাধ্য ক'রে সভ্যভব্য করতে না পারা যায় তাহলে যে-কোনো মহৎ কাজেই তাকে নিয়োগ করো না কেন সে সব ভেস্তে দেবে যেমন কাম ও অহঙ্কার যে-কোনো প্রেমকে ভেস্তে দেয় আবিল ক'রে।

কিন্তু এ-মহাসাধনার ভার নিতে পারে না, দিশা দিতে পারে না আমাদের বস্তুবিচারী মানস বুদ্ধি (materialistic intellect) যা বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার। হাত পাততে হবে বুদ্ধির পারে বোধির কাছে যে বলে: "জ্ঞান

---

* Chapter VIII The Remaking of man ... ... MAN THE UNKNOWN,

† Chapter I, Need of a Better Knowledge of Man ...... MAN THE UNKNOWN

১ "...... the most urgent problem of our disillusioned and floundering society is to find out more about what we are, in order to discover what we can do about the situation in which we exist today. In the conduct of our ...... outward and inward lives, we recognise more and more the need for a profounder self-knowledge than any former age had. Until we know more about ourselves ...... we are moving blindly in a world whose patterns are constantly more complex and hazardous." (Chapter 1.)

এবং ঘুচাতে সর্বপাশৈঃ"—ভগবানকে জানলে তবেই মানুষ জীবন্মুক্ত হ'তে পারে, নৈলে নয়। বিজ্ঞান আজকের দিনে চাইছে যে-ঠুনকো যান্ত্রজ্ঞান নানা মনস্তাত্ত্বিক মনোবিকলনের বিশ্লেষণের আলোয়, সে-আলো কিছুদূর অবধি পথ দেখাতে পারে বটে কিন্তু তার সাধ অসীম হলেও সাধ্য সামান্যই। তাই বৈজ্ঞানিককে নত হতে হবে শেষমেশ মহাপুরুষেরই পায়, দিশা চাইতে হবে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার সকল মহামানবের তথা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের কাছে। নৈলে সাধন হবে না নব-আবাহন গভীর-তম আত্মবোধের—মিলবে না পরাবিদ্যার বর—চরম বিশ্বাস বিশ্বাত্মবোধ—শুধু মস্তিষ্কচালনী বুদ্ধির কাছে মিলবে না এ দিশা, কেন না:

"The limitations of reason become very strikingly, very characteristically, nakedly apparent when it is confronted with that great order or psychological truths and experiences which we have hitherto kept in the back-ground—the religious being of man and his religious life Here is a realm at which the intellectual reason gazes with the bewildered eyes of a foreigner who hears a language of which the words and spirit are unintelligible to him and sees everywhere forms of life and principles of thought and action which are absolutely strange to his experience. He may try to learn this speech and understand this strange and alien life, but it is with pain and difficulty, and he cannot succeed unless he has, so to speak, unlearned himself and become one in spirit and nature with the natives of this celestial empire."

ভাবার্থ: "বুদ্ধির যে সীমা কোথায় সেটা অতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে যখন তাকে আধ্যাত্মিক জগতের সত্য ও উপলব্ধি-সমূহের সামনাসামনি দাঁড় করানো যায়—যে-জগৎকে আমরা এতদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নি। এই একটি জগতের সামনে পড়লে বুদ্ধির যুক্তি-তর্ককে বাঙ্মূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেন সে কোথাকার কোন্ পরদেশী, যে না বোঝে এখানকার ভাষা, না বোঝে তার নিগূঢ় অর্থ। এ-জগতের সংস্পর্শে সর্বত্রই জীবনের এমন সব রূপের, চিন্তার, কর্মের তত্ত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে যা তার অভিজ্ঞতায় একেবারেই চৈনিক হেঁয়ালি। অবশ্য সে এই ভাষা শিখবার, এই অচেনা অজানা জীবন বুঝবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতি পদে তার বাধা ও বেদনা বাজে। এ-চেষ্টা তার বিড়ম্বনা—যদি না সে আপন গভীর শিক্ষাদীক্ষা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে এই অমৃতলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মে ও প্রকৃতিতে এক হ'তে শেখে *

এ ধরনের কথা শুনলে প্রথমটায় বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের চটে ওঠা আশ্চর্য নয়, কারণ কোনো কিছু 'জানি না' কবুল করতে মানস বুদ্ধির নধর অহমিকায় আঘাত লাগে, সাধুসন্তের কাছে মাথা নত করতে হবে ভাবতেও সে রেগে আগুন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি নব সত্য নব উপলব্ধিরই দাম দিতে হয় সব আগে আত্মাভিমানকে বর্জন ক'রে বলতে শিখে: "আমি জানি না, কিন্তু সত্যিই জানতে চাই, তাই চাই পথের দিশা—কোন্ পথে গেলে জানা যায় "যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যদ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে"—যা জানলে—অর্থাৎ পরা বিদ্যা—আর কিছু না জানলেও চলে—কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নাগালের বাহিরে, কেন না:

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ১৩শ অধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

"The mind and the intellect are not the key. They can only trace out and revolve in a circle of half-truths and uncertainties. But in the mind and life, in all the action of the intellectual, the aesthetic, the ethical, the dynamic and practical, the emotional, sensational, vital, physical being, there is that which sees by identity and intuition and gives to all these things such truth and such certainty and stability as they are able to compass." "Man's road to supermanhood will be open when he declares boldly that all he has yet developed, including the intellect of which he is so rightly, and yet so vainly proud, are now no longer sufficient for him, and that to uncase, discover, set free this greater power within shall be henceforward his great preoccupation."

ভাবার্থ:—"মন ও বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ দিশারি নয়। এরা যা পারে, সে হচ্ছে একটা অর্ধ-সত্যের ও অনিশ্চয়তার বৃত্ত এঁকে তারই বর্ত্মে চক্রাকারে আবর্তন করতে। কিন্তু মানুষের মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যজ্ঞান, নীতিবোধ ও গতিধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম ও ভাবপ্রবণতা, ভোগ-লোলুপতা ও শারীর চেতনা এ সবের মধ্যেই আছে সেই পরম চেতনা যার দৃষ্টি সকল সৃষ্টির স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার ফল, এবং এই চেতনাই মন প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদির প্রত্যেককে দান করছে ততটা সত্য, ততটা স্থিতি, ততটা প্রতিষ্ঠা, যতটা তারা প্রত্যেকে ধারণ করতে সক্ষম।" "মানবে অতিমানব হবার পথ খুলে যাবে তখনই—যখন সে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এতদিন পর্যন্ত সে যা গ'ড়ে তুলেছে, আয়ত্ত করেছে (এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত—যার জন্যে সে ন্যায়তঃই, এবং কতকটা অবোধের মতনও বটে, গর্ব অনুভব করে) তা আর তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং তার নিজের মধ্যেকার বৃহত্তর শক্তিকে মুক্ত করাই হবে তার পরম ধ্যান, চরম স্বপ্ন।"*

এই-যে-সত্য, এই-যে-চেতনা মানুষকে আবহমানকাল বর্তমানের শোকাবহ বাস্তবতার পর্ব থেকে অনাগত আলোর যুগান্তরের দিকে রওনা ক'রে দিয়ে এসেছে, এ কি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা মানস যুক্তিতর্কের ধার ধারতে পারে? যুক্তিতে তো সে বিধৃত নয়, যুক্তিই যে এ-দৈব প্রেরণায় বিধৃত—তাকে প্রকাশ ক'রে তবেই না যুক্তির সার্থকতা! সে যে ধ্রুব করায়ত্তকে ছাড়ে অন্তরের দুর্নিবার প্রণোদনায়, বিচক্ষণ যুক্তির সাবধানী তাগিদে তো নয়। নীটশের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, সব অধিগত সম্পদকে সে ছাড়ে এই জন্যেই যে সে অন্তরে অন্তরে জানে যে, "Um die Erfinder von neuen werthen sich die welt"—অর্থাৎ "নূতনের (values) পূজারীকেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে।"

বিজ্ঞান ভালো করতে গিয়ে মন্দও করেছে কম নয়—টেনে এনেছে আমাদের সর্বধ্বংসের সামনে। তাই হয়ত আজ তার বুদ্ধি অহঙ্কার নম্রশীর্ষ হ'য়ে বিনয়ের কাছে হাত পেতেছে আলোর জন্যে। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনকে মানতে হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের চর্চায়ই মানুষের মুক্তি নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কালি-ফর্ণিয়ায় তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন,

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ২২শ অধ্যায়; শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

বিজ্ঞান কী ভাবে চলেছে আত্মঘাতের পথে। দুঃখ করেছিলেন এই ব'লে যে, "বিজ্ঞান যুদ্ধে আমাদের হাতে জুগিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে বিষ দেবার বা বিকল করবার ক্ষমতা, আর শান্তিকে আমাদের করেছে কর্মব্যস্ত অনিশ্চিত ও যন্ত্রের দাস।" (পীটার মাইকেল মোর-এর সদ্যোজাত "EINSTEIN" জীবনী থেকে উদ্ধৃত।)

এ-ট্রাজিডির কথা আরো বিশদ ক'রে লিখেছেন অলডাস হক্সলি তাঁর বহুপঠিত ENDS AND MEANS-এ। তাঁর BELIEFS অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন, এখানে তার চুম্বকটুকু দিচ্ছি :

"আমরা আজ আর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের যুগের মুগ্ধ আত্মপ্রসাদের যুগে নেই, এসে পড়েছি মোহভঙ্গের দুঃখময় প্রভাতে যখন গোলাপী নেশা কেটে গেছে দেখতে পেয়ে যে, বিজ্ঞান আমাদের উন্নততর হাতিয়ার জুগিয়েছে নিম্নতর লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে। বিজ্ঞান মানুষের আর একটা অপকার করেছে এই যে, আজকের গণমত বিজ্ঞানের গোনা-গন্তির জগৎকেই এ-ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য রূপ ব'লে ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে—প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতন* — যে সৃষ্টির না আছে কোনো মাথামুণ্ডু, না আছে কোনো উদ্দেশ্য। কিন্তু এহেন জগতে কেউই বাঁচতে চায় না। লক্ষ্যহীন গতির নেশায় মত্ত হয়ে থাকতে পারে মানুষ কদিন? কাজেই জীবনের 'পরে একটা উদ্দেশ্য আরোপ করতে তারা জাতীয়তা, ফ্যাশিসম্ ও কম্যুনিসম্‌কে বরণ করেছে—দার্শনিক দিক দিয়ে যাদেরকে হসনীয়ই বলব। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-সব বুলির মধ্যে দিয়ে তারা জীবনের যাহোক একটা অর্থ খুঁজে পায় তো, তাই এ নিয়ে করে দুরন্ত সিংহনাদ।

আশা করা যাক গণমনও ক্রমশ বুঝবে ঘা খেতে খেতে যে, এসব বুলিতে নেই শান্তি কি সান্ত্বনা, মানুষকে সার্থক হ'তে হলে চাইতেই হবে মানবতাকে কাটিয়ে দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠা—ভগবানের আবাহনে নব ধর্মরাজ্যের প্রবর্তনে। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর মন্ত্রঝংকৃত ভাষায় :

A deathbound littleness is not all we
are :
Immortal our forgotten vastnesses
Await discovery in our summit
selves.

মৃত্যুঘেরা নগণ্যতা নহে তো স্বরূপ আমাদের :
বিস্মৃত বিপুল ব্যাপ্তি আছে পথ চেয়ে—কবে
তারে
আমরা চিনিয়া লব আপনার সত্তার শিখরে।

আজকের বিজ্ঞান যে-পথে চলেছে সে-পথ ভুল পথ বলি না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে বরণ করতে হবেই হবে মানবাত্মার শিখর-অভিযান, অমৃত-তীর্থযাত্রা। এ-সাধনারও দিশা পাবেই পাবে অনাগত যুগের বৈজ্ঞানিক যদি সে সত্যি চায় সে-দিশা ও বরণ করে সে-সন্ধানের সর্ত ও সাধনা। সেই দিনই কেবল বিজ্ঞানের কাপালিক ট্রাজিডির অবসান হ'য়ে তার সবেজাগা সুমতির শেষফল ফলবে—জ্ঞান প্রেম ভক্তি ও সেবার মহাসমন্বয়ে।

* যদিও এযুগের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে তাদের সুমতি হয়েছে ব'লে, তাই একথা তাঁরা আর বলেন না। আজ তাঁরা কী সুর ধরেছেন একটু আগেই তার ছবি এঁকেছি।

আলমবাজার মঠ

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আজ হইতে তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে কোন এক স্নিগ্ধ অপরাহ্নে আপনি যদি কোন বন্ধুর সহিত বা একাকীই আলমবাজার মঠে যাইতেন, আপনাকে কলিকাতার বীডন স্কোয়ারে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া চিতপুর রোড হইয়া বাগবাজার পুলের উপর দিয়া কাশীপুর রোড ধরিয়া বরাহনগর বাজারে পৌছাইতে হইত। তখনকার দিনে সামান্য কয়েকটি পয়সা খরচ করিয়া শেয়ারের গাড়ীতে বীডন স্কোয়ার হইতে বরাহনগর বাজারে আসা যাইত। কাছেই রাস্তার পূব পাশে ফাগুর প্রসিদ্ধ খাবারের দোকান। সেই দোকান হইতে মঠের সাধুদের জন্য খাস্তা কচুরি কিনিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। শুনা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ফাগুর দোকানের কচুরি ভালবাসিতেন।* যেখানে এই দোকান ছিল সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী। নিম্নতলে ডাক্তারখানা ও কয়েকটি দোকান। দ্বিতলে ব্যাঙ্ক, ত্রিতলে অনেক গৃহস্থ আশ্রয় পাইয়াছেন।

তাহার পর কিন্তু আপনাকে হাঁটিতে হইত। অবশ্য নিজের গাড়ী থাকিলে আর হাঁটিতে হইত না।...তাহার পর আলমবাজার চৌমাথায় পৌছিয়া মঠের সন্ধান করিলে যে কেহ আপনাকে মঠবাড়ী দেখাইয়া দিত। কিছুক্ষণ সাধুসংসর্গে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আরও মাইল দেড়েক উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলানিকেতন। রানী রাসমণির অমর কীর্তি ভবতারিণীর মন্দিরও দেখিয়া আসিতে পারিতেন। উহা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বলিয়াই বিশেষ পরিচিত।

আর যদি নৌকায় যাইবার আপনার ইচ্ছা হইত, বড়বাজার বা আহারীটোলার ঘাট হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া আলমবাজারে লোচন ঘোষের ঘাটে গিয়া পৌছিতেন। গঙ্গার নিসর্গ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ঘাটের উপর দ্বাদশ শিবমন্দির দর্শন করিয়া পূর্ব দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই চৌমাথা। সে স্থান হইতে অল্প দূরেই মঠ।

এখন কিন্তু কলিকাতা হইতে ৩২ বা ৩৪নং বাসে, কিংবা ট্রেনে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নামিয়া একেবারে আলমবাজার চৌমাথায় পৌছিতে পারেন। কাছেই পোষ্ট অফিস। তাহার কিছু পশ্চিমে ২৫নং দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম) —এর দ্বিতল বাড়ীতেই মঠ ছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আদি লীলা কামারপুকুরে, মধ্য লীলা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ও কলিকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে এবং অন্ত্যলীলা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট রবিবার রাত্রি ১টার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিমগ্ন হন। ৯০নং কাশীপুর রোডস্থ উদ্যানবাটীর লীজ (Lease)-ও প্রায় ফুরাইয়া আসে। তখন তাঁহার গৃহত্যাগী শিষ্যদের কোন আশ্রয় ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তপ্রবর সুরেশচন্দ্র মিত্রকে দর্শন দিয়া তাঁহার ছেলেদের সাহায্য করিতে আদেশ করেন। সুরেশচন্দ্রও তদনুসারে স্বামীজীকে বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে বলেন, এবং তিনি মাসিক

---

* শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা—১৫৪।

যে অর্থ সাহায্য করিতেন[১] তাহাও করিতে থাকিবেন এ প্রতিশ্রুতি দেন।

বাড়ীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অবশেষে কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রায় এক মাইল উত্তরে বরাহনগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার মুন্সীদের ভগ্নপ্রায় দ্বিতল বাড়ীটি মাসিক ১০৲ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়। গৃহত্যাগী ভক্তদের একটু আশ্রয় মেলে।[২] ভক্ত ভবনাথ বাড়ীটি ভাড়া করিয়া দেন।*

১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট হইতে অনেক শিক্ষিত যুবক বরাহনগর মঠের সন্ধান পাইয়া তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী শুদ্ধানন্দ), কালীকৃষ্ণ বসু (স্বামী বিরজানন্দ), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিমলানন্দ), গোবিন্দচন্দ্র শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বোধানন্দ) এবং সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী প্রকাশানন্দ)-ই প্রধান। কালীকৃষ্ণ বসু প্রমুখ কয়েকজন যুবক বরাহনগর মঠেই যোগ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন এই ভগ্নপ্রায় সংকীর্ণ বাড়ীতে স্থানাভাব ঘটিল। সেই কারণে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আরও মাইল-দুই উত্তরে আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হইল। গৃহত্যাগী যুবকেরা সেখানে আশ্রয় পাইলেন। বৃদ্ধা গোপালের মা ও গৌরী-মাও মাঝে মাঝে সেখানে আসিয়া এক তলায় একখানি ঘরে থাকিতে লাগিলেন।[৩]

শুনা যায় প্রামাণিক ঘাট রোডের ৺বৈদ্যনাথ দে মহাশয় কাশীপুর শ্যামাচরণ মৈত্র লেনের ৺নবীন গুড়ের (৺নবীনচন্দ্র দে মহাশয়ের) আলমবাজারের বাড়ীটি মাসিক ১০৲ টাকাতেই ভাড়া করিয়া দেন।

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা ৺মহেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণিত আলমবাজার মঠবাড়ীর চিত্রটি এইরূপ : "মোটা-থামওয়ালা বাটী, সদর-দোর দিয়ে ঢুকে, দুটো ছোট ছোট রক্, সামনে উঠান ও তার পশ্চাতে তিনফোকর ঠাকুরদালান। উঠানের একপাশে ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দুটো বারাণ্ডা। পূর্বদিকের বারাণ্ডার পশ্চাতে একটা বড় ঘরের সামনে একটা ছোট ঘর। দক্ষিণের বারাণ্ডা দিয়ে তিন খানা ঘরে যাওয়া যায়। বাঁদিকের ঘরটি ঠাকুর-ঘর। ঠাকুরঘরের পাশ দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পূর্ব কোণের ঘরটিতে ভাঁড়ার থাকতো। দক্ষিণের আর একখানি ঘরে সকলে থাকতো। এ ছাড়া বাড়ীটার পশ্চিম দিকেও তিনখানা ঘর ছিল। তার একটিতে শশী মহারাজ থাকতেন। তার পাশের ঘরটিতে কালী মহারাজ থাকতেন। আর একখানিতে তুলসী মহারাজ থাকতেন। নীচে রান্নাঘরের সুমুখে একটা গলি, তার পরে বাঁধান পুকুর। পূর্বদিকেও আর একটি পুকুর ছিল। লাটু মহারাজ মঠে আসিয়া দোতলায় পূর্বদিকের বড় ঘরখানিতে থাকতেন।"[৪]

পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁহার "স্মৃতি-কথায়" লিখিয়াছেন—"মঠবাড়ী এত বড়, কিন্তু

১ The History of Sri Ramakrishna Mission—Page. 43

২ বরাহনগর মঠের বিশদ বিবরণ ১৩৭১ সালের চৈত্র ও ১৩৭২ সালের বৈশাখ মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

* শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা। (২য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা—২৭৫

৩ The History of Sri Ramakrishna Misson. Page—68

৪ শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (২য় সংস্করণ)—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়—পৃষ্ঠা ২৯৭

ভাড়া মাত্র ১০৲ টাকা। ইহার কারণ দুজন লোক এ বাড়ীতে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এজন্য এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া জুটিত না।"

ভূতের বাড়ী বলিয়া সাধুদের মধ্যে বেশ ঠাট্টা তামাসা চলিত। নিজেদের মধ্যেই কয়েকজন ছাদের উপর ডাম্বেল গড়াইয়া গড়্‌গড়্‌ শব্দ করিতেন যাহাতে অন্যান্য সাধুরা ভয় পান। লাটুমহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ভূতের ভয়ে সমস্ত রাত্রি ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিতেন।[৫]

গঙ্গাধর মহারাজের 'স্মৃতিকথা'য় আরও জানিতে পারা যায় যে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তিনি তীর্থপর্যটনের পর আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন, তখন ঐ স্থানে স্বামী প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, ও সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) প্রভৃতি মহারাজেরা বাস করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ ও ত্রিগুণাতীত মহারাজ প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন।[৬] আরও কিছুদিন পরে তাঁহারা স্থায়িভাবে সকলেই আলমবাজার মঠে বাস করিতে থাকেন।

স্থানাভাবে সাধুরা বাটী পরিবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকেই প্রায় "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" হইয়া থাকিতেন। বাহিরের অপরিচিত কোন ভদ্রলোক আসিলে একখণ্ড বহির্বাস টানিয়া লইয়া পরিতেন। আহারাদির ব্যবস্থাও অনুরূপ ছিল। দিনের বেলায় কোন রকমে ভাত, ডাল ও চচ্চড়ি, এবং রাত্রে শুকনো রুটি জুটিত। যে দিন অল্প একটু দুধ মিলিত, সে দিন উৎসব লাগিয়া যাইত।[৭]

এখানেও ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে দিন কাটিত। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই সময় মঠে আসিত। গুরুভ্রাতারা সকলেই সাগ্রহে সেই সকল পুস্তিকা পাঠ করিতেন। স্বামী অভেদানন্দ হৃষীকেশের মণ্ডলীশ্বর স্বামী ধনরাজ গিরির নিকট শারীরক-ভাষ্য পড়িয়া আসেন। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিদিন বৈকালে দুইঘণ্টাকাল বেদান্তভাষ্য পড়িতেন। আলমবাজার মঠে বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।[৮]

বরাহনগর মঠের ন্যায় আলমবাজার মঠেও শশী মহারাজ নিজস্কন্ধে সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনার ভার লইয়াছিলেন। পূজার জন্য অপরের বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইত। ভোগাদি সংগ্রহের জন্য তিনি ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন আর সুরেশচন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু মহাশয়দ্বয় জীবিত নাই যে মঠের অভাব অনটন দূর করিয়া দিবেন।

হরিপ্রসন্ন মহারাজ তখন এটোয়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার। ভ্রাম্যমাণ সুবোধানন্দজীর নিকট হইতে আলমবাজার মঠের আর্থিক দুর্গতির কথা শুনিয়া তিনি কিছুদিন প্রতি মাসে ষাট টাকা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজ তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ ও কনিষ্ঠ-ভ্রাতার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মঠে যোগ দেন। মঠ তখন বর্তমান বেলুড় মঠের দক্ষিণে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে।

৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৬৫
৬ ঐ পৃঃ ১৩১
৭ ঐ পৃঃ ১৩৩
৮ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৩৫

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে হরিপ্রসন্ন মহারাজের নূতন নামকরণ হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

আলমবাজার মঠের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর নাগেশ্বর চাঁপা ফুল খুব ভালবাসিতেন। একদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের জন্য ঐ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ ঘুঘুডাঙ্গায় (বর্তমানে—উত্তর দমদম) ডি. গুপ্তের বাগানে উক্ত ফুলের সন্ধানে যান। সেখানে গিয়া মালাদের কাছে শুনিলেন, ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে (দমদম স্টেশনে) যাইবার বড় রাস্তার (বর্তমান খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সরণী) উত্তর ধারে সাতপুকুরের বাগানে এই ফুল পাওয়া যাইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে একাকীই গেলেন। কিন্তু দেখিলেন গাছ আছে বটে, তাহাতে তখনও ফুল ধরে নাই। মালীরা তাঁহাকে বলিল, সতের-আঠার দিন পরে আসিলে ফুল পাওয়া যাইবে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সংকল্প করিয়াছিলেন ফুল না লইয়া মঠে ফিরিবেন না। তাই তিনি বারাসত অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সেখানকার ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন লোকদিগকে দেখিয়া তাঁহার কোমল অন্তরে ব্যথা লাগিল। তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ উপায়গুলি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আঠার দিন কাটিল। তখন সাতপুকুরের বাগানে আসিয়া দেখিলেন—'সুন্দর সুবাসিত ফুলভারে নত নাগেশ্বর চাঁপার গাছটি মৃদুমন্দ ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।" গঙ্গাধর মহারাজের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মালীরাও তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত মনে কলাপাতার ঠোঙা করিয়া বিস্তর নাগেশ্বর চাঁপা ফুল তাঁহার হাতে দিল। তিনিও উহা লইয়া মহানন্দে আলমবাজার মঠে ফিরিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার পক্ষাধিককাল অজ্ঞাতবাসের কাহিনী শুনিয়া এবং রাশিকৃত নাগেশ্বর চাঁপা ফুল পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন, পরমানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ফুলগুলি নিবেদন করিলেন।[৯]

পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শশী মহারাজকে আলমবাজার মঠেই একদিন বলিলেন—"তুই যে ঠাকুরের পূজা ফাঁদলি, কে যোগায় তোর নিত্য পান, বুট, আর মিছরির পয়সা? তোর ঘণ্টা নাড়ার বাড়াবাড়ি দেখলে আমার ভয় হয়।" শশী মহারাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন -"তোমায় ঐ নিয়ে ভাবতে হবে না। যাঁর পূজা ফেঁদেছি, তিনিই তাঁর ভোগের পয়সা যোগাবেন।"[১০]

নিষ্ঠাবান রামকৃষ্ণানন্দের এ কথা কোন দিনই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই। "তিনি যখনই ভাবতেন ঠাকুরকে কি ভোগ দেবেন, তখনই কোন না কোন ভক্তপ্রেরিত এক কুঁদা মিছরি, মালসাভরা নবীনের রসগোল্লা ও ঠাকুরসেবার অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়া পৌছিত।"[১১]

যে সকল যুবক আলমবাজার মঠে যোগ দেন তাঁহাদেরও কথা এখানে কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সুশীল মহারাজের বরাহনগর মঠে যাতায়াত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি আলমবাজার মঠে যোগ দেন এবং সেই স্থানেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রকাশানন্দ নামে অভিহিত হন।

---

৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৫৫।

১০ উদ্বোধন—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা পৃঃ ১৯৩।

১১ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-কৃত, পৃঃ ১০৬।

খগেন মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই মঠে যোগ দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—স্বামী বিমলানন্দ। সুধীর মহারাজ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগ দেন এবং ঐ বৎসরই মে মাসে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পান। তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে ভূষিত হন। শুকুল মহারাজ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ মঠে যোগ দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মানন্দ—এই নাম প্রাপ্ত হন। হরিপদ মহারাজ এই মঠে যোগ দিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয়—স্বামী বোধানন্দ।[১২]

কানাই মহারাজ ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মঠেই স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া যথাক্রমে নির্ভয়ানন্দ ও নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ইঁহারা দুজনেই বরাহনগর মঠে যাতায়াত করতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীও বরাহনগরে। তিনি নানাভাবে বরাহনগর মঠের সাধুদিগের সেবা করিতেন। সস্ত্রীক কাশীবাস কালে কাশী-ধামেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তাঁহার আপনজন কেহ না থাকায় তিনি আলমবাজার মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার কয়েক মাস পরেই স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করেন।[১৩]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বসু আলমবাজার মঠে যোগ দেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা যথাক্রমে স্বরূপানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দ নামে অভিহিত হন।[১]

আলমবাজার মঠেও সাধু-সজ্জনের সমাগম হইত। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, অধ্যাপক বহুবল্লভ শাস্ত্রী, সিন্ধু প্রদেশের প্রসিদ্ধ "সোফিয়া" পত্রিকার সম্পাদক (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) প্রায়ই সাধুদিগের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। নাগ মহাশয়ও একদিন সস্ত্রীক আলমবাজার মঠে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামীজীর মার্কিন ভক্ত ডাক্তার টার্ন বুল (Dr. Turn Bull) কলিকাতায় আসিবার পর প্রায়ই এই মঠে আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগের পুতসঙ্গ লাভের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে তিনি কিছুদিন বাসও করিয়া-ছিলেন। স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহিমবাবু বা মহেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতার সিমলা অঞ্চল হইতে পদব্রজে আলমবাজার মঠে আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজের ভ্রমণকাহিনী শুনিতেন। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মধ্যে মধ্যে এই মঠে আসিয়া সাধুদের সাহচর্য লাভ করিতেন। শশিপদবাবু বরাহনগরে যে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সাহায্যকল্পে আমেরিকা হইতে স্বামীজী কয়েক-বার কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলেন।[১৫]

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখিবার মানসে রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেওঘরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দেহাতীকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও বিশেষ দুর্দশাপন্ন দেখিয়া অনুকম্পায় মথুরবাবুকে বলেন—"তুমি তো মার দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও। আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" বহু ব্যয়ের আশঙ্কায় মথুরবাবু প্রথমে

১২ উদ্বোধন—বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা।

১৩ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৩৪।

১৪ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 117

১৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৭৭—১৮৯।

একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া কলিকাতা হইতে উপযুক্তসংখ্যক কাপড় আনাইয়া এই কাজ সুসম্পন্ন করেন। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দেও মথুরানাথের জমিদারিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দিয়া অনুরূপ জনসেবা করান। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে ভক্তদিগের মধ্যে মথুরবাবুই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৬]

বরাহনগর মঠে থাকিতে এবং পরেও গৃহত্যাগী ভক্তেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে কিছু কিছু জনসেবা করিতেন বটে, কিন্তু আলমবাজার মঠে থাকাকালেই উহা বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজী যখন বিশ্রামার্থে দার্জিলিঙ পর্বতে, তখন গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) মুর্শিদাবাদ জেলায় মহুলা গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা আরম্ভ করেন। স্বামীজী দার্জিলিঙ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের নিকট এই সেবা-কার্যের কথা শুনিয়া নিজ তহবিল হইতে দেড়শত টাকা গঙ্গাধর মহারাজকে পাঠাইয়া দিলেন। স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য মহুলায় পাঠাইলেন।

এই সেবাকার্যে মঠের সকলেই গঙ্গাধর মহারাজকে উৎসাহিত করেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠান। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) আলমবাজার মঠ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন গঙ্গাধর মহারাজকে একখানি পত্রে লেখেন—"তুমি যে মহৎ কার্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তাহার আর তুলনা নাই। আমি দুর্বল, তোমাকে আর কি উৎসাহিত করিব। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, দুর্বলের বল, সকল শুভ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিদাতা তোমার উদ্যম সফল করুন, এবং তোমাকে অজর ও দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ আরও শত শত জনহিতকর শুভ কাজের উদ্যোগী করুন।··· রাজা তিনদিন পূর্বে তোমাকে ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন, আজ ১০৲ টাকা পাঠাইতেছেন।"[১৭]

পূজনীয় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন গঙ্গাধর মহারাজকে আলমবাজার মঠ হইতে ৫০৲ টাকা পাঠান এবং লেখেন—"আমাদের এখান হইতে ২ জন·· যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্যের জন্য যাইবে। যদি না যাওয়া হয়, তবে তোমার ওখানেই পাঠাইব।"[১৮]

জনসেবা-পরিচালনার নির্দেশও আলমবাজার মঠ হইতে দেওয়া হইত। উক্ত পত্রের অপর অংশে দেখা যায়—"তোমরা adultদিগকে যে ½ সের করিয়া চাউল দিবে মনে করিয়াছ সে উত্তম কথা। কিন্তু উহার মধ্যে বাছিয়া দিবে। ···যতক্ষণ না আমাদের লোক যায় ততক্ষণ আন্দুলবেড়িয়া বা অন্যত্র রিলিফ খুলিও না। এ সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক পরে লিখিব।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ আলমবাজার মঠ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে আর একখানি পত্রে লেখেন—"ভাই গঙ্গাধর, আমি গত পরশু দিবস তোমাকে ইনসিয়র্যান্স করিয়া ১৫০ টাকা পাঠাইলাম।···বাছিয়া বাছিয়া যাহারা যথার্থই অকর্মণ্য, কোনরূপ খাটিয়া খাইতে অক্ষম, তাহাদিগকেই চাউলাদি দিবে। আমাদের এখান হইতে একজন বোধ

---

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।

১৭ স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

১৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

হয় শীঘ্রই যশোহর খুলনার দিকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাইবে।"[১৯]

আলমবাজার মঠ হইতেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ বিশদভাবেই দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শুধু দুর্ভিক্ষ নিবারণই নয়। এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজী অনাথ বালকদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সংকল্প করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তিনি নটুবিহারী দাস নামে ৯।১০ বৎসরের একটি বালকের সন্ধান পান, এবং তাহাকে মহুলায় লইয়া গিয়া অনাথ আশ্রমের সূত্রপাত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই প্রথম অনাথ আশ্রম। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসগুলিতে এবং বিভিন্ন আশ্রমে অনেক অনাথ বালক-বালিকা প্রতি-পালিত হইতেছে।[২০]

মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইবার পর পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি স্বামীজী কলিকাতায় পৌছান। সেই বৎসর হইতে তাঁহারই প্রবর্তিত নিয়মাবলী মঠে চালু হয়, এবং মঠের সমস্ত কাজ তদনুসারেই নির্বাহ হইতে থাকে।[২১] এমন কি জনসেবার কার্যও তাঁহার ইচ্ছামত চলিত। আলমোড়া হইতে লিখিত ২০-৬-১৮৯৭ তারিখের স্বামীজীর একখানা পত্রে দেখা যায়—"I have sent some of my boys to works in the famine districts. It has acted like a miracle." দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে আমার কয়েকটি ছেলেকে পাঠাইয়াছি। উহাতে অপূর্ব কাজ হইয়াছে।" ৯-৭-৯৭ তারিখের পত্রেও দেখা যায়—"My boys are working in the midst of famine and disease and misery—nursing by the mat-bed of Cholera-striken Pariah and feeding the starving Chandala." "আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দুর্দশার মধ্যে কাজ করিতেছে। মাদুরে শায়িত কলেরাক্রান্ত অচ্ছুতের সেবা করিতেছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডা-লকে আহার দিতেছে।"[২২]

মঠের সকল কাজে সকল সাধুরই মতামত লওয়া হইত। এই ভাবে মঠ ও মিশনের একটি সুষ্ঠু নিয়মকানুন গড়িয়া উঠিলে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে কলিকাতার বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে সকল সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগকে ডাকিয়া এক সভায় সকলকে বুঝাইয়া বলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী প্রচার করিতে হইলে এবং তাঁহার আদর্শে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে একটি বলিষ্ঠ সঙ্ঘের প্রয়োজন। একথা তিনি প্রতীচ্য দেশ ভ্রমণ করিয়া বেশ বুঝিয়াছেন। তখন সকলেই উৎসাহ ও আনন্দের সহিত স্বামীজীর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সেই সভাতেই "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন সকলে আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন।[২৩]

ইহার এক বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামীজী আমেরিকা হইতে লণ্ডনে

১৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

২০ স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত পৃ. ১৪২।

২১ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭১।

২২ Letters of Swami Vivekananda.

২৩ The life of Swami Vivekananda.

আসিয়া তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া পাঠান। তাহার পরেই স্বামী অভেদানন্দের ডাক পড়ে। তাঁহারা দুজনেই আলমবাজার মঠ হইতে বিদেশ যাত্রা করেন।[২৪]

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শশী মহারাজকেও স্বামীজী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আলমবাজার মঠ হইতে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে যান স্বামীজীরই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দজী। মান্দ্রাজে গিয়া শশী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনা পূর্বের মতই প্রাণ দিয়া করিতে থাকেন, এবং তাঁহার জীবনাদর্শ ও অমিয়বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মান্দ্রাজ মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫]

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে একদিন নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক টুকরা কাগজে লিখিলেন – নরেন লোক শিক্ষা দিবে। নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আপত্তি করিয়া বলিলেন—না, আমি পারিব না। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোর ঘাড় পারিবে।[২৬] ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যেদিন স্বামীজী আমেরিকার চিকাগো সহরে উপস্থিত হন, সেই দিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা বিশেষভাবে ফলবতী হইতে আরম্ভ করে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে হিন্দু ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা ও বেদান্ত প্রচারে যে অত্যধিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে স্বামীজীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশে ফিরিয়া তাঁহার শ্রমের কিছুই লাঘব হইল না। অবিরাম অভ্যর্থনার উত্তর দেওয়া, সংগঠনমূলক কার্যাবলীর জন্য চিন্তা ও নানা স্থানে বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুআরি আলমবাজার মঠ হইতে তিনি একখানি পত্রে লেখেন :—

"I have not a moment to die, as they say…I am almost dead. As soon as the Birthday (celebration of Sri Ramakrishna) is over I will fly off to the hills. … I do not know whether I would live even six months more or not, unless I have some rest."[২৭]—"লোকে যেমন বলিয়া থাকে, আমার মরিবারও অবসর নাই, আমারও সেইরূপ অবস্থা। অত্যধিক পরিশ্রমে আমি মৃতপ্রায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইলেই আমি কোন পার্বত্য প্রদেশে পলাইব। বিশ্রাম না লইলে আমি আর ছয় মাসের বেশী বাঁচিব কি না সন্দেহ।"

আলমবাজার মঠ হইতেই স্বামীজী দার্জিলিঙ যাত্রা করেন, সঙ্গে যান স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী আলমবাজার মঠেই অবস্থান করেন। এই স্থানেই এবং এই সময়েই স্বামি-শিষ্যসংবাদ-প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন।[২৮]

এক বৎসর আগের ঘটনা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে আলমবাজার মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষ্যে গৃহী-ভক্তগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

---

২৪ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 95, 98.

২৫ ঐ p. 118

২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

২৭ Letters of Swami Viyekananda.

২৮ স্বামিশিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. ৩৪-৩৮।

প্রধান উদ্যোক্তারা দুই রকম প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন—সাধারণ লোকদিগের জন্য কলাইডালের খিচুড়ি, এবং বিশিষ্ট ভদ্র-লোকদিগের জন্য ভুনি খিচুড়ি। মঠের সন্ন্যাসীরা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা সকলের জন্যই ভুনি খিচুড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। শেষে পর্যন্ত ভুনি খিচুড়িই হইল।

এই ব্যাপারেই দক্ষিণেশ্বরে সাধারণ মহোৎসবের দিন স্ত্রীলোকদিগকে উৎসবে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া কলিকাতার নানা স্থানে "প্লাকার্ড" টাঙ্গান হইয়াছিল, এবং স্ত্রীলোকেরা যাহাতে হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারের টিকিট না পান, তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কয়েকজন যুবকের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল এই বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু বেশীই হইয়াছে।[২৯]

আমরা বরাহনগরের ৺হরিদাস বোড়াল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, একথা স্বামীজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দু'চার জন পতিতাই যদি উদ্ধার না পাইল, তবে পতিতপাবন ঠাকুরের আবির্ভাবের কি প্রয়োজন ছিল?"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন কলিকাতায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৪ই জুনের এক পত্রে লেখেন—"গত পরশ্ব দিবস বৈকালে এখানে এক অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া আমাদিগের মঠের অনেক স্থান ভগ্ন এবং অনেক স্থানে crack হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে।[৩০]

জুন মাসের ১৫ তারিখে আলমবাজার মঠ হইতে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে দেখা যায়—"মঠের কোন স্থান যদিও একেবারে পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানই ফাটিয়া বিশেষ জখম হইয়া একেবারে বাসের অনুপযুক্ত করিয়াছে। আমরা পরদিন হইতেই বাড়ীর সন্ধান করিতেছি, কিন্তু সুবিধামত পাওয়া যাইতেছে না।"[৩১]

স্বামীজীও এই সংবাদ পাইয়া আলমোড়া হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন এক পত্রে লিখিলেন—"A number of boys are already in training, but the recent earthquake destroyed the poor shelter we had to work in, which was only rented, any way. Never mind. The work must be done without shelter and under difficulties.[৩২] "কতক-গুলি ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ভাড়া করা যে সামান্য আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের কাজ চলিতেছে, এখনকার ভূমিকম্পে তাহা ভগ্নপ্রায়। যা হয় হোক, ভাববার কিছু নাই। আশ্রয়হীন হইলেও এবং নানা অসুবিধার মধ্যে পড়িলেও আমাদের কাজ চলিতে থাকিবে।"

যুগমানবের শুভ সংকল্প কখনও ব্যর্থ হয় না। অনতিকাল মধ্যেই ভাগীরথীর পূর্বকূলে কোন সুবিধাজনক স্থান না পাইয়া পশ্চিম তীরেই ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি মঠ স্থানান্তরিত হইল।[৩৩]

---

২৯ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃ. ১৫৮

৩০ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২।

৩১ স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র—উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২।

৩২ Letters of Swami Vivekananda.

৩৩ The History of Sri Ramakrishna Mission. p. 124.

আলমবাজার পোষ্ট-অফিসের কিছু পশ্চিমে ৯৫নং দেশবন্ধু রোডে পুরাতন মঠ-বাড়ী কিছু নূতন আকার ধারণ করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তবে তাহা এখন অন্য লোকের অধিকারে। বাহির হইতে সে মঠ-বাড়ী আর চিনিবার উপায় নাই। উহার সম্মুখভাগে যে জোড়া জোড়া থামওয়ালা বারান্দা ছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তৎ-পরিবর্তে সেখানে রহিয়াছে অনেকগুলি দোকানঘর। মঠের সম্মুখেই রাস্তার অপর দিকে ৺জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ী ছিল, [illegible]হারও কোন অস্তিত্ব নাই। তবে তাঁহার বংশধরেরা সেই স্থানেই নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের পুরাতন ঠাকুর-দালানটি এখনও কোনরকমে টিকিয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য যে বাড়ী হইতে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ যে স্থানে বাস করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন, সঙ্ঘের ধাত্রীস্বরূপা সেই মঠ-বাড়ীর স্মৃতিরক্ষার কি কোন উপায় হয় না?

প্রেম-রূপ

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রাজ্য-ধন স্বপ্নসম হল মূল্যহীন
হে বুদ্ধ, তোমার কাছে! বসি নিশিদিন
যোগাসনে, সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লভিয়া
সেথা হতে যবে তুমি আসিলে ফিরিয়া
জীবতরে অন্তহীন করুণার ধারা
ঝড়াইলে দুনয়নে, প্রেমে হলে হারা!

মা-কালীরে জ্ঞান-খড়্গে দ্বিখণ্ডিত ক'রে
লভি জ্ঞান, রামকৃষ্ণ আসিলেন ফিরে।
সে-হৃদয়ও তৃণ 'পরে পদভার হেরি
অন্তহীন বেদনায় উঠিল গুমরি!

লীন হয়ে ব্রহ্মে, নির্বিকল্প সমাধিতে
বীরেশ বিবেকানন্দ ফিরিলা জগতে;
কহিলেন, 'জনেকেরও মুক্তির কারণে
লাখ বার জন্ম নিতে ইচ্ছা জাগে প্রাণে।'

নিত্য পূর্ণ শুদ্ধ বোধ স্বরূপ যাঁহার
তিনিই অসীম নিত্য প্রেম-পারাবার।

প্রাণের পরিচয়

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে বেদান্তবিনোদ

গ্রীষ্মকালে যদি একটু বেশী গরম পড়ে, তবে আমরা অমনি বলিতে থাকি "উঃ, কি বিশ্রী গরমই পড়েছে! একেবারে প্রাণান্ত করে তুলেছে।" আবার শীতের দিনে যদি একটু কড়া শীত পড়ে, তাহা হইলেও বলি "বাপরে বাপ! কী ঠাণ্ডা! শীতে মারা গেলাম।" ঝড়বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময়ে আমরা প্রাণভয়ে গৃহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি। রোগে শোকে আমাদের প্রাণ মুহ্যমান হয়; আবার আনন্দের দিনে আমাদের প্রাণ যেন উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। আমাদের আমিত্বের সাথে প্রাণের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে 'আমিটাই' প্রাণ না প্রাণটাই 'আমি', তাহা বুঝিতে পারি না। আহারান্তে আমরা মনের সুখে নিদ্রা যাই, কিন্তু প্রাণের বিশ্রামও নাই, নিদ্রাও নাই; সে বেচারী জাগ্রত থাকিয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত চলাচল করায়, ভুক্তান্ন পরিপাকের ব্যবস্থা করে, তাহা হইতে গ্রহণযোগ্য সারাংশদ্বারা রক্তমাংস অস্থিমজ্জা মস্তিষ্কাদির পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত থাকে, আর অসারাংশ বহির্নিষ্কাশনের পথে প্রেরণ করে,—এক কথায় আমাদের দেহরক্ষার্থ যাহা কিছুর প্রয়োজন সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকে। আর জাগ্রতাবস্থায় তো তাহার অক্লান্ত সেবার কথাই নাই; তাহার সাহায্য ব্যতীত একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, চলাফেরা কাজকর্ম করা তো দূরের কথা।

প্রাণ যে কেবলমাত্র আমাদের দেহযন্ত্রটি সৃষ্টি করিয়া সেই দেহের ভিতরে থাকিয়া অহর্নিশি আমাদের সেবায় নিযুক্ত থাকে, শুধু তাহাই নহে। এই প্রাণই যে সূর্যচন্দ্র আকাশ-বাতাস অন্ন প্রভৃতি রূপে আমাদিগকে বহির্জগৎ হইতে নিরন্তর প্রাণ আহরণ করিয়া জীবিত থাকিতে সাহায্য করে, একথা আমরা আমাদের অনাদি জ্ঞানভাণ্ডার শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। শ্রুতি বলেন, "আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ" (প্রশ্নোপনিষদ্ ৩।৮), সূর্য প্রাণের বাহ্য অভিব্যক্তি। "এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥ (প্রশ্নঃ উপঃ ২।৫)। এই প্রাণ অগ্নি হইয়া প্রজ্বলিত হন। সূর্যরূপে তাপ দেন, ইনি মেঘ, ইনিই বায়ু, ইনি পৃথিবী, ইনিই অন্নরূপে সকলকে পুষ্ট করেন, (অধিক কি) যাহা স্থূল, মূর্ত, যাহা সূক্ষ্ম, অমূর্ত, যাহা অমৃত, এই প্রাণই সেই সমস্ত হইয়াছেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"॥ (কৈবল্যঃ উপঃ ১৫, মুণ্ডক ২।১।৩)। "ব্রহ্ম হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, এবং প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং বিশ্ববিধাত্রী পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।" * এইখানেই প্রাণের নিষ্কাম সেবার ইতি হয় নাই; আমাদের মৃত্যুর পরেও প্রাণের সেবার বিরাম হয় না। আয়ুষ্কাল শেষ হইলে

---

* শ্রুতির এই সকল উক্তিতে আধুনিক মনে অবিশ্বাস আসিতে পারে। সেজন্য দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমাদিগকে একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই সকল সত্য বর্তমান সময়ের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সেযুগে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালীও এ যুগের প্রণালী হইতে পৃথক ছিল। বৈদিক যুগের মন যে কবিত্বপূর্ণ ছিল, একথা সর্ববাদিসম্মত। তাঁহারা সূক্ষ্মতম দার্শনিক তথ্যাদিও যে অপূর্ব কবির ভাষায় এবং

যখন আমরা পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি, তখনও প্রাণ আমাদের কর্মসংস্কার এবং কর্মফলাদির বোঝা স্ব-স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া আমাদিগকে দেহান্তর বা লোকান্তর প্রাপ্ত করাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে সাথে যাত্রা করেন। আমরা কিন্তু এমনই অকৃতজ্ঞ যে আমাদের এই জীবন-মরণের—এই জন্ম-জন্মান্তরের অকৃত্রিম বন্ধুটির পরিচয় লইবার চেষ্টা ভুলিয়াও কখনো করি না এবং এই অকৃতজ্ঞতার ফলে অন্তহীন জন্মমৃত্যু-চক্রে পিষ্ট হই। শ্রুতি বলেন যে, তোমরা যদি প্রাণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় অবগত হইয়া প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণাত্মবিদ্ হইতে পার, তবে অমরত্ব লাভ করিবে (অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তোমাদের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটিবে)—

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে॥

(প্রঃ উঃ ৩।১২)

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব, বাহ্য এবং অধ্যাত্ম ভেদে পঞ্চবিধ অবস্থিতি জানিয়া (উপাসক) অমরত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং একবার আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্মের এই নিষ্কাম সেবকটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? অতএব যে পরম পুরুষের সহিত প্রাণের অবিনাভাব সম্বন্ধ, তাঁহার চরণে, এবং যে সকল মহর্ষিবৃন্দ অশেষ কৃপাপরায়ণ হইয়া আমাদের হিতার্থে প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে প্রাণের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার প্রয়াস পাই।

অতি প্রাচীনযুগে আশ্বলায়ন নামক জনৈক ঋষি প্রাণতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়া পরম ঋষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্! কুত এষ প্রাণো জায়তে?"—ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্নেতদাততম্।" (প্রঃ উপঃ ৩।৩)—বৎস! আত্মা (বা পরমেশ্বর) হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে; ছায়া যেরূপ সর্বদা পুরুষের অনুগত থাকে, এই প্রাণও তদ্রূপ সর্বদা পরমেশ্বরকে অনুসরণ করে (প্রাণশ্ছায়াবদীশ্বর-মনুগচ্ছতি—আনন্দগিরি)। এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে এই জন্মলাভ ব্যাপারটা কি

বহুস্থলে রূপকের ছদ্মবেশে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের উপনিষদ্গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পরিভাষাও ছিল পৃথক। এই সকল কারণে তাঁহাদের উক্তির মর্ম অনুধাবন করিবার জন্য সশ্রদ্ধ চিন্তাশীলতার আবশ্যক। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝা যাইবে। যেমন—সূর্যের একটি নাম 'সপ্তাশ্ব'; সূর্যদেব সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া আকাশমার্গ পরিভ্রমণ করেন, কথিত আছে। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃশ্যমান আলোক-তত্ত্বে আমরা বুঝিয়াছি যে, ইহার অর্থ সূর্যকিরণে সাতটি দৃশ্যমান বর্ণ বর্তমান। আমাদের ঋষিরা বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে বলিয়া গিয়াছেন—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ", সেই সত্য আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যে, যদি তোমার অপান বায়ুর ক্রিয়া না থাকে, তবে তুমি উদান বায়ুর ক্রিয়াফলে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে; আর যদি তোমার উদান বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে অপানপ্রভাবে তোমাকে নিজ শরীরের ভারে মাটিতে শুইয়া থাকিতে হইবে, দাঁড়াইতে কিংবা চলিতে পারিবে না। ইহা হইতেই কি বুঝা যায় না যে তাঁহারা 'অপানবায়ু' কথাটি আধ্যাত্মিক অপানবায়ুর অতিরিক্ত 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তি অর্থে, এবং 'উদানবায়ু'ও তদ্রূপ 'সৌর আকর্ষণ' শক্তি অর্থে ব্যবহার করিতেন? শুধু পরিভাষার তফাৎ মাত্র! বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—"জড় বলিয়া কিছু নাই, সবই শক্তি"; Lord Kelvin বলিয়াছেন, "পদার্থ (matter) এবং মন (mind) একই উপাদানে সৃষ্ট, আর আমাদের শ্রুতি কোন্ আদিম যুগে বলিয়া গিয়াছেন যে প্রাণ হইতেই মন, পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। একটি পরমাণু যে শক্তির ঘনীভূত অবস্থামাত্র, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, একথা 'প্রপঞ্চসারতন্ত্রে' বিবৃত শক্তির উন্মেষ প্রসঙ্গ একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

প্রকারের; ইহার অর্থ সাধারণ প্রাণীর ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া নহে। প্রাণের এই জন্মগ্রহণ ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্বিকল্প সমাধির দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার প্রাণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিত, শ্বাসপ্রশ্বাস বা হৃৎস্পন্দন একেবারেই থাকিত না; আবার যখন সেই সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতেন, তখন তাঁহার প্রাণের ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হইত। ঠিক সেই প্রকার প্রলয়কালে বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তি পরমেশ্বরে বিলীন অবস্থায় থাকে, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাণ যেন সেই ভগবদ্‌বিধানেই জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্পন্দিত হয়। 'জন্ম লাভ করে' এই অর্থেই বুঝিতে হইবে। তাহা হইতে পৃথকত্ব প্রাপ্ত হয়, এরূপ অর্থে নহে; কারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তিন অবস্থাতেই প্রাণ পরমেশ্বরেই আশ্রিত থাকে। ভগবদধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই স্পন্দনের দ্বারা প্রাণ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের এবং তত্তৎনিবাসী দেবমনুষ্য পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদির, —এককথায় স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থেরই সৃষ্টি করে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, কোন পদার্থই 'নষ্ট' হইলে শূন্য হইয়া যায় না—তাহার সূক্ষ্মতর কারণেই পর্যবসিত হয়। জগতের যাবতীয় পদার্থ এভাবে তাহাদের মূল কারণ শক্তিতে পর্যবসিত হইতে পারে, এবং শক্তি হইতেই আবার সেগুলি অনুকূল পরিবেশ পাইলে উদ্ভূতও হয়। জড়বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার প্রাণতত্ত্ব বুঝিতে খুবই সহায়তা করে। বিশ্বজগতের সব কিছুই প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণেই উহার বিলয় হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রাণ হইতে জগৎসৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে। (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১ম অনুবাক)*

চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রাণই যে সৃষ্টির মূল, তাহা একাধিক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। নিত্যমুক্ত পুরুষ সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, "যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্; প্রাণঃ প্রাণেন যাতি" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।১৫।১) "রথচক্রের শলাকাসমূহ যেমন চক্রের নাভিতে (Hub) সংলগ্ন থাকে, সেই প্রকার সমস্ত প্রাণে আশ্রিত রহিয়াছে; প্রাণ স্বাধীনভাবে গমন করে।" ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রাণকে মহারাজের মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় পরমেশ্বরের সর্বার্থসম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্নঃ উপঃ ২।৬): "রথচক্রনাভিতে চক্র-শলাকাসমূহের ন্যায় সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে।" "প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" (প্রশ্নঃ উপঃ ২।১৩); "ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই প্রাণের বশীভূত।" "প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধম্" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৩) "প্রাণের দ্বারাই জগৎ বিধৃত আছে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে তাঁহার পরা-প্রকৃতি প্রাণদ্বারা এই জগৎ বিধৃত আছে (গীতা ৭।৫)। গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন, "সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোহংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্" (মাণ্ডুক্যকারিকা ১।৬); "প্রাণ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে এবং পুরুষ চৈতন্যাংশের কারক।

* ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও প্রশ্নোপনিষদে প্রাণোপাসনার উপদেশ আছে।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ"—এখানে আত্মা হইতে আকাশ অর্থ ঠিক নহে। আত্মা নির্বিকার, তাঁহার বিকার হইতেই পারে না। এই হেতু আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে আকাশ ইত্যাদি এই প্রকার শ্রুতিসম্মত অর্থই গ্রাহ্য।

"প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি" (ছান্দোগ্য, ৫।১।১৫ এবং ৭।১৫।৪); "প্রাণই নামরূপের দ্বারা পরিজ্ঞাত মূর্ত পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অমূর্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সব হইয়াছে।" আমরা একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারি যে আমাদের চিন্তা, কল্পনা, ভাব (Ideas), ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, তথা লজ্জাঘৃণারাগদ্বেষাদি যাবতীয় সদসৎ প্রবৃত্তি, সবই প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ বা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এ জগৎ যে প্রাণস্পন্দনের দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রাণস্পন্দনের দ্বারা সঞ্জীবিত, তাহা আমরা শ্রুতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। কঠোপনিষদে আছে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (২।৩।২); "সমস্ত জগৎ এবং যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই প্রাণস্পন্দনের ফলে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে স্পন্দিত হইতেছে।" শক্তির স্পন্দন দ্বারা যে কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা প্রপঞ্চসারতন্ত্র হইতে জানিতে পারি। আর প্রাণস্পন্দনের উপরে যে স্থিতি (প্রাণরক্ষা) নির্ভর করে, তাহা আর আমাদিগকে কাহারও নিকট হইতে শিখিবার প্রয়োজন হয় না; প্রাণস্পন্দন থামিয়া যাওয়ার অর্থ যে মৃত্যু, তাহা কাহারও অজানা নাই। আমরা ইহাও বেশ জানি যে আমাদের প্রাণস্পন্দন যদি অসমভাবে বা অনিয়ন্ত্রিতরূপে হইতে থাকে, তবে তাহাও মারাত্মক হয়। সুতরাং জগতের সৃষ্টি এবং স্থিতির জন্য ঠিক তালে তালে এবং নিয়মিত ভাবে (Rhythmically) প্রাণের স্পন্দন হওয়া আবশ্যক। স্থূল সূক্ষ্ম অনন্তকোটী স্তরে প্রাণের এই Rhythmical Vibration দ্বারা, একই প্রাণতত্ত্ব অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্তকোটী নামরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

প্রাণদ্বারা যেরূপ ক্রম অনুসারে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহাও আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥" (১।১।৮); অর্থাৎ "সৃষ্টি-উপযোগী প্রণিধান বা পর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্ম উপচয়প্রাপ্ত হয়েন; তখন ব্রহ্ম হইতে অব্যাকৃত (গুণসাম্যাবস্থাপন্ন অবিভাজ্যমান) প্রকৃতি উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে প্রাণ, † প্রাণ হইতে মন, মন হইতে পঞ্চবিধভূত তন্মাত্রা (এবং তাহা হইতে স্থূলভূত); তাহা হইতে ভূরাদি লোকসমূহ উৎপন্ন হয়; লোকাধিবাসী মনুষ্য দ্বারা কর্ম কৃত হয়, কর্ম হইতে কর্মফল (অমৃত) সমুৎপন্ন হয়; (সেই সমষ্টি-কর্মফলই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ বা কারণ হয়,—এই প্রকারে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে)।" ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যদ্ ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণ উৎপদ্যতে, ন যুগপদ্ বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ।" ব্রহ্ম হইতে এই ক্রমানুসারেই জগৎ সৃষ্ট হয়, একমুষ্টি কুল ছড়াইয়া দিবার মত একসঙ্গে নহে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে প্রাণ হইতে অমূর্ত মন, এবং মন হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূলতর মূর্ত পদার্থাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাণ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহা প্রশ্নোপনিষদেও আছে: "স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ অন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ॥" (৬।৪)। এইরূপে প্রাণের উন্মেষাত্মক স্পন্দনে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হয়,

† ভাষ্যকার প্রাণ অর্থে 'হিরণ্যগর্ভ' বলিয়াছেন; হিরণ্যগর্ভ প্রাণোপহিতচৈতন্য, আমরাও প্রাণকে চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া আসিতেছি। তাছাড়া কেহ কেহ প্রাণ অর্থে Vital Force বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

প্রাণ দ্বারাই তাহা বিধৃত থাকে; পুনরায় প্রলয়কালে প্রাণের নিমেষাত্মক স্পন্দনে বিলোমক্রমে স্বস্ব বিশিষ্টতা হারাইয়া সবই প্রাণে বিলীন হয়।

এই প্রাণশক্তি ভগবানের শক্তি; শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই, এই জন্য প্রাণকেও ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) বলা হইয়াছে; যথা—"প্রাণো হ্যেষ আত্মা" (ব্রহ্মোপনিষদ্ ১); "যঃ এষ প্রাণঃ সা এষা প্রজ্ঞা · প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" (কৌষীতকী উপঃ)। "প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে" (বৃহঃ উপঃ ৩।৯।৯)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রাণকেই জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা-দেবাত্মশক্তি বলা হইয়াছে। যোগিবর শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "Prakriti is the WILL and EXECUTIVE POWER of Prusha. It is not a separate entity, but one and the same with Him." "প্রকৃতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি এবং কার্যকারিণী শক্তি; ইহা পুরুষ হইতে পৃথক্ নহে, পুরুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন।"

এই প্রাণ এবং চৈতন্য (জ্ঞান) দ্বারা যে কিরূপ সম্মিলিত ভাবে সৃষ্টিস্থিত্যাদি কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা আমরা গভীর অভিনিবেশ লইয়া সৃষ্ট যে-কোন পদার্থের অন্তর্নিহিত তথ্য পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি। যেমন ধরা যাক আমার সম্মুখে একটি ৭৫।৮০ ফুট উচ্চ আম্রবৃক্ষ আছে। মাটির ভিতরে উহার নূতন নূতন শিকড়গুলি (যাহা অতীব সূক্ষ্ম এবং এত কোমল যে স্পর্শ করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়) তদপেক্ষা বহুগুণ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে; এই প্রক্রিয়ার অন্তরালে যে শক্তিটি নিহিত আছে, তাহা অচিন্তনীয় নহে কি? দ্বিতীয়তঃ, মাটির ভিতর হইতে শিকড়গুলি রস আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ৮০ ফুট উর্ধ্বে প্রেরণ করিতেছে। তৃতীয়তঃ সেই একই রস হইতে পাতার উপযুক্ত রস পাতাগুলিকে, ছালের উপযোগী কষায়-রসটুকু ছালকে, Silico-calcium-প্রধান রসটুকু কাণ্ডকে ইত্যাদি যথাযথভাবে বৃক্ষের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবেশন করিতেছে; ভুলিয়াও ফলের মিষ্ট রস ছালের ভিতরে বা কাণ্ডের প্রয়োজনীয় রস পাতার ভিতরে দিতেছে না। চতুর্থতঃ মাটির ভিতর হইতে উপাদান আনিয়া উহাকে সুগন্ধ পদার্থে, মধুতে পরিণত করিয়া তাহা প্রতিটি ফুলের ভিতরে এবং শর্করাপ্রধান রস প্রতিটি ফলের ভিতরে রাখিতেছে। পঞ্চমতঃ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকারের নব নব বৃক্ষসৃষ্টির জন্য অনুরূপ শক্তি পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ অঙ্কুরটি সাবালক না হওয়া অবধি তাহার জন্য খাদ্যটুকু পর্যন্ত আঁটির ভিতরে সঞ্চিত রাখিয়া কঠিন আবরণ-দ্বারা তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। এইরূপে প্রতিটি কার্য সুনিপুণভাবে সম্পাদিত হইতেছে; অনন্ত কোটি ক্ষেত্রে ইহা ঘটিতেছে, কিন্তু কোথায়ও কোন ভুলভ্রান্তি কিংবা ইতস্ততঃ ভাব নাই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে দেবতা পর্যন্ত সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের ভিতরেই নিয়ত এবম্বিধ চৈতন্যসমন্বিত প্রাণের কার্য—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তির লীলা বিদ্যমান; চৈতন্য-টুকুই আত্মা, এবং প্রাণ তাঁহারই জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি; চৈতন্য আশ্রয়, প্রাণ আশ্রিত। এই চৈতন্য এবং প্রাণ উভয়ই বিশ্বব্যাপী, উভয়ই এক এবং অদ্বিতীয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,"—বাহ্যদৃষ্টিতে নামরূপের যতই বৈচিত্র্য, যতই বিভিন্নতা থাক না কেন, তত্ত্বহিসাবে সবই এক, অভিন্ন।

শ্রুত্যুক্ত প্রাণপ্রসঙ্গ হইতে এইরূপে আমরা জানিতে পারি যে প্রাণ জগতে মাত্র একটিই; আপনার প্রাণ হইতে আমার প্রাণ বিভিন্ন নহে, বা আমার প্রাণ হইতে পশুপক্ষীতৃণলতাদির

প্রাণও ভিন্ন নহে। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণশক্তির একমাত্র উৎস পরমপুরুষ পুরুষোত্তম; আর ধাতুপরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা অবধি আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের যন্ত্র মাত্র। প্রকাশের পার্থক্য দ্বারা শক্তির বা তদধিষ্ঠান চৈতন্যের ভিন্নত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রাণের এই ঐক্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকেই প্রাণাত্মবিদ্ বলা হইয়াছে; ব্যষ্টিপ্রাণের সহিত এই বিশ্বব্যাপী প্রাণের তাদাত্ম্য উপলব্ধি দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ব্রহ্মশক্তয়ে প্রাণায় চ ওঁ ॥

সোঽহম্

শ্রীগুরুদাস দাশ

মানব জনম লভিলে যখন
হ'য়োনা মায়ার ভৃত্য,
আত্মজ্ঞানের প্রদীপ জালিয়া
আলোকিত কর চিত্ত!

নিজেরে শুধাও - কোথা হ'তে এলে,
এ ধরায় কেন জনম লভিলে,
কোন্ সে অজানা দেশে যাবে পুন
কিবা আছে চিরসত্য?

'আমি' কোন্ জন—দেহ, না অন্য?
স্বরূপ তাহার কি,
মৃত্যুর পারে আর কিছু আছে?
সার সত্যটি কি?

এ বিশ্ব মাঝে এতো শৃঙ্খলা;
চালায় তাহারে কে?
শুধু অচেতন শক্তি, নিয়ম,
অথবা চেতন সে?

আপন স্বরূপ, বিশ্বস্বরূপ
ফুটিবে যখন মনে
দাস আর নাহি রহিবে জড়ের,
রাজা হবে সেইক্ষণে।

মানব জনম হবে সার্থক,
লাভ হবে অমৃতত্ব—
অসীমের সনে হবে একাকার,
বিশ্ব চলিছে নির্দেশে যাঁর
দেখিবে নিজেরে তাঁরি সাথে এক—
চির অবিনাশী তত্ত্ব।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূধরানন্দ

বর্তমানে শিক্ষাসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইতেছে। উন্নতিমূলক উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হইয়া দেশে এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। জাতির উন্নতি সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে শিক্ষার উপর। যে জাতির শিক্ষিতের সংখ্যা যত উচ্চ সেই জাতি তত উন্নত। ইদানীং শিক্ষার মান খুব উন্নত না হইলেও উহার উন্নয়নের নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। প্রয়োজনমত যোগ্য শিক্ষকের অভাব, যথাযোগ্য পুস্তকের অভাব, সর্বোপরি যথেষ্ট অর্থের অভাব ইত্যাদিও উপযুক্ত শিক্ষার প্রবর্তনের পথে অন্তরায় রহিয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সুনির্বাচিত না হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ নাই। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশিষ্ট মতানুযায়ী পাওয়া যায় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল চরিত্রবান, আত্মবিশ্বাসী এবং সমাজ ও দেশের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযুক্ত লব্ধবিদ্য 'মানুষ' তৈয়ারী করা, কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের উপযোগী বিদ্যায় ভূষিত করা নহে। চরিত্র গঠিত না হইলে লব্ধবিদ্য, তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি দ্বারাও দেশের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এজন্য অর্থকরী বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের চিন্তাই ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়, এবং সংস্কারই চরিত্রের নিয়ামক। সেজন্য চরিত্রগঠনে প্রয়োজন সচ্চিন্তার পরিবেশন। ধর্মের মাধ্যমে ইহা সহজে করা যায়। ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণও হয় না। কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—উহাই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। ধর্ম বলিতে স্বামীজী বলিয়াছেন, "অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন," "যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে।"

শিক্ষার মাধ্যমে 'মানুষ' হওয়ার অর্থ, যে চরিত্রবান ব্যক্তি দেহ মন সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিয়া বিজ্ঞানাদির জ্ঞানে ভূষিত হইয়া জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এইরূপ শিক্ষা বিদ্যার্থীকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্পন্ন করিয়া তাহার মস্তিষ্ক উচ্চ চিন্তা ও আদর্শে পূর্ণ করে, দুর্বল স্বার্থপর না করিয়া দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও সাহসী করে, সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে শিক্ষা দেয়; শিক্ষা তাহার মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হয়।

প্রাচীন কালের গুরুগৃহে শিক্ষার মধ্যে এই 'মানুষ' গড়িবার দিকটিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইত। অভিভাবকগণ বালকদের গুরুগৃহে পাঠাইতেন। সেখানে ব্রহ্মচর্যব্রত, সেবা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং বিশেষ করিয়া জ্বলন্ত পাবকসদৃশ আচার্যের জীবনের সংস্পর্শে যুবকগণ বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিমল চরিত্রেরও অধিকারী হইয়া সমাজে ফিরিয়া আসিত। শুধু যে তাহাদিগকে বেদাদি শিক্ষাই দেওয়া হইত তাহা নহে, জাগতিক বিদ্যাও দান করা হইত; 'পরা' ও 'অপরা' উভয় বিদ্যাই। চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্রনির্মাণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার তখন প্রভূত

উন্নতি হইয়াছিল। আচার্যগণই বিদ্যার্থিগণের সব ব্যয়ভার বহন করিতেন। বিবিধাকার দানের মাধ্যমে সমাজ আচার্যগণকে এ বিষয়ে সহায়তা করিত।

গুরুগৃহগুলির পরিবেশও ছিল বিদ্যার্থীদের জীবনগঠনের অনুকূল। লোকালয় হইতে দূরে মনোরম অনাড়ম্বর পরিবেশে উহা স্থাপিত হইত। মনের একাগ্রতা সাধনের জন্য এরূপ পরিবেশ অপরিহার্য।

একাগ্র মন এত শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহা দ্বারা অনায়াসে এবং স্বল্প সময়ে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়। মন একাগ্র না হইলে, সুষ্ঠুরূপে মনোযোগ দিতে না পারিলে অধ্যয়ন কোন অবস্থায় সন্তোষজনক হয় না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্যসংগ্রহ করা নহে। আবার যদি আমাকে নূতন করিযা শিক্ষালাভ করিতে হইত এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া আমি মোটেই মাথা ঘামাইতাম না। আমি আমার মনের একাগ্রতা ও নির্লিপ্ততার ক্ষমতাকেই ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতাম; তারপর এভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রসহায়ে খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। মনকে একাগ্র ও নির্লিপ্ত করিবার ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা শিশুদের একসঙ্গেই দেওয়া উচিত।" গুরুগৃহে গুরুর পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে বিদ্যার্থীদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পবিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হইত। শিক্ষায় অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইত বিদ্যার্থীর অন্তরস্থ জ্ঞানের উন্মেষের পথের বাধাপসারণে, সুযোগ্য মালী যেরূপ নির্দিষ্ট চারাগাছটিকে উহার পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য বেড়া ও সার দিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, পর্যাপ্ত বারি সেচন ও বৃহৎ বৃক্ষের আচ্ছাদন হইতে রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করে, উপযুক্ত অভিজ্ঞ গুরুও তদ্রূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিষ্যকে তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথের প্রতিবন্ধ অপসারণের ও অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের বা দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্য-ব্যবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে যত্ন এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহসেচন ও স্বাধীনতাদান করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

অভিজ্ঞ আচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রায় দ্বাদশবর্ষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য জাগ্রত আত্মপ্রত্যয়-সহ দেবোপম চরিত্রের অধিকারী হইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমনের অভিলাষ গুরুকে নিবেদন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তিনি এইরূপ আশীর্বচন উচ্চারণ করিতেন, 'উঠ বৎস, সাহস অবলম্বন কর, বীর্যবান হও, সমুদয় দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে লও—জানিয়া রাখ তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃজনকর্তা। তুমি যাহা কিছু বল বা সহায়তা চাও তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে।'

অর্জিত জ্ঞানকে সংস্কারে পরিণত করিয়া পূর্ণ মানুষ তৈয়ার করিবার রীতি তখনকার আচার্যগণ জানিতেন। সমাজ তখন এইরূপ চরিত্রবান মানুষ দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রাচীন কালের এই শিক্ষাব্যবস্থাই ভারতের জাতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি। দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার নানারূপ গলদ ও শিক্ষিতগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং পূর্বোক্তরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির পুনরায় প্রচলনে দেশের সকল রকমে উন্নতি হইবে মনে করিয়া ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে দেশবাসীকে

আহ্বানপূর্বক বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস—গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগৃহ-বাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না।"

বর্তমান কালে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সহিত প্রাচীনকালে এই গুরুকুলপ্রথার যথাসম্ভব সংমিশ্রণ সাধন করিতে হইবে—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদি জাগতিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে চরিত্রবলেও বলীয়ান হইয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অপর দেশের যে শিক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতকারী বিবেচিত হইবে তাহা নিজেদের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ধ অনুকরণ কখনো কল্যাণজনক হইবে না।

ব্রহ্মচর্যের প্রতি বিদ্যার্থিগণের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। সংযমই সকল শক্তির উৎস - এটি তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যোগীরা বলেন মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে ; যাহার মস্তিষ্কে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়। ইহাই ওজো-ধাতুর শক্তি।··· কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন।" ছাত্রগণের হৃদয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি, ভারতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের চর্চা, এবং ছাত্রদের ধর্মজীবন গঠনে প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"··· "আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি।"··· "আধ্যাত্মিকতাই জীবনের অন্যান্য কার্যসমূহের ভিত্তি। আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সবলতা সম্পন্ন মানব যদি ইচ্ছা করেন অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন, আর মানুষের ভিতর আধ্যাত্মিক বল না আসিলে, তাহার শারীরিক অভাবগুলি পর্যন্ত ঠিক ঠিক পূরণ হয় না।" (শিক্ষাপ্রসঙ্গ)।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন গুরুকুলপ্রথার সহিত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয় চাহিয়া-ছিলেন। আধুনিক যুগের সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে যাহাতে চরিত্রবলে বলীয়ান– যথার্থ "মানুষ" করিয়া তোলার শিক্ষাও দেওয়া হয়, তাহা তিনি চাহিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণমিশনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বামীজীর সেই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপায়িত করিবার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সময়ে দেশে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি অল্প। তাছাড়া মনোমত প্রতিষ্ঠানগঠনে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহুবিধ বাধাও রহিয়াছে। তথাপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যাহাতে স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া তোলা যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। ছেলেদের যথার্থ শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। শুধু অর্থকরী বিদ্যালাভই নয়, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য, দেশের ও সমাজের যথার্থ কল্যাণকারী হইবার জন্য আরো যে সব যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা সবই পরিবেশন করার আয়োজন প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ইহার জন্য বর্তমানে কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া মনে হয় অসম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িবার সময় তাহা করা যায়, স্কুলের জন্য তো বটেই।

ইহার জন্য, বলা বাহুল্য, শিক্ষকদের নিজের জীবন ও আচরণের দিকে সর্বাগ্রে নজর দিতে হইবে। নিজের আচরণে যদি আদর্শের বিপরীত হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণকে আদর্শনিষ্ঠ করানো সম্ভবপর নহে।

আদর্শনিষ্ঠ, সহানুভূতিশীল শিক্ষকের সংস্পর্শে ছাত্রগণ যত অধিক সময় কাটাইতে পারে ততই ভাল। সেজন্য শিক্ষায়তনগুলি আবাসিক হইলেই সবচেয়ে ভাল হয়। উহা সম্ভবপর না হইলে অন্তত: অর্ধ-আবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে ছাত্রগণ সকালে যাইয়া শিক্ষকগণের সহিত সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতে পারে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। সকালে ও বিকালে ক্লাস করিতে পারিলেই ভাল। দ্বিপ্রহরে ছাত্রগণের আহারের ও বিকালের জলযোগের আয়োজন শিক্ষায়তনের মধ্যেই থাকিবে। বর্তমানে প্রচলিত 'ডে-ষ্টুডেণ্টস হোম'গুলির অনুকরণে ইহা করা যায়; ছাত্রগণ স্বল্পব্যয় বহন করিবে, বাকী ব্যয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বহন করিলেই ভাল। অবসর-সময়ে পাঠের সুবিধার জন্য লাইব্রেরীও সেখানে থাকিবে। খেলাধুলার মাঠ এবং ব্যায়ামাগারও থাকা চাই।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান সহরাঞ্চলে হইলে তাহা সহর হইতে ২।৩ মাইল দূরে কোন উন্মুক্ত অঞ্চলে হওয়া চাই। ফুলবাগান, সব্জিবাগান প্রভৃতির জন্য জমিও যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। ছাত্রগণ সেখানে অবসরকালে নিজেরা একটু আধটু বাগানের কাজ করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। সহজ, স্বাভাবিক ভাবে ছাত্রদের মনে আনন্দময় ভাব, সামান্য শারীরিক শ্রম, একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস, পবিত্রতা ও সর্বোপরি কিছু ধর্মভাব যাহাতে প্রবেশ করে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই আয়োজন সেখানে রাখিতে হইবে। একটি প্রার্থনাগৃহ একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের কার্যারম্ভের পূর্বে ছাত্রগণ যেখানে সমবেত হইয়া প্রার্থনা, ভজন ইত্যাদিতে কিছুক্ষণ কাটাইতে পারে। এই গৃহে ধর্মাচার্য-গণের আলেখ্য থাকিবে, প্রার্থনাদির সময় ধূপ জ্বালানো হইবে, ফুলদানিতে কিছু ফুলও থাকিবে। এমন একটি পরিবেশ হওয়া চাই, যেখানে প্রবেশ করিবামাত্র মন স্বতই শান্ত হইয়া আসে। অভ্যাস ছাড়া মনের মধ্যে কোন কিছুর ছাপ স্থায়ীভাবে দেওয়া যায় না।

এককথায়, যে গুণগুলি ছাত্রজীবনে অর্জন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, সেগুলিকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে নিয়মিতভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতক-গুলি সদভ্যাসের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। দৈনন্দিন কার্যসূচীতে সেগুলি থাকা প্রয়োজন। অথচ সর্বদা নজর রাখিতে হইবে, ছাত্রেরা যেন কখনও ভাবিবার অবসর না পায় যে তাহাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে। সহানুভূতিশীল শিক্ষকগণের সহিত কেবল পড়াশুনার সময় নয়, খেলাধুলা, প্রার্থনা, গল্পগুজব প্রভৃতির সময়ও মেলামেশার ফলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধন দৃঢ়তর হইবে, এবং ছাত্রগণ অনুভব করিতে পারিবে যে তাহারা যাহা শিখিতেছে তাহা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। এরূপ হইলে শিক্ষা 'মানুষ' তৈয়ারীর উপযোগী হইবে।

ছাত্রগণের আবাস হইতে দুইতিন মাইলের মধ্যে শিক্ষায়তনগুলি রাখিতে পারিলে আরো একটি সুফল হইবে; ছাত্রগণ সকালে সেখানে হাঁটিয়া যাইতে ও বিকালে হাঁটিয়া ফিরিতে পারিবে। অধিকাংশ ছাত্রকে খাওয়ার পরই হাঁটিয়া অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে হয়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

লাইব্রেরীতে সর্বধর্মের মহাপুরুষদের, বড় বড় দেশনেতা, সাহিত্যিক প্রভৃতির জীবনী এবং আলেখ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনে হয়, আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইলে আমরা এভাবে বা উন্নততর অন্য কোন উপায়ে ছাত্রগণকে অর্থকরী বিদ্যালাভের সহিত চরিত্রবলেও বলীয়ান করিয়া তুলিয়া দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে পারিব।

পরলোকে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ১৬ই এপ্রিল, ১৯৬৬, শনিবার বিকাল ৫টা ৩২ মিনিটের সময় দেশনন্দিত শিল্পসাধক, নন্দলাল বসু ৮৩ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁহার নিজস্ব ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-যজ্ঞের এই অন্যতম প্রধান ঋত্বিকের দেহাবসানে শিল্পজগতের, বিশেষতঃ ভারতীয় চিত্রকলার যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে তিনি জন্মলাভ করেন; তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু তখন সেখানে কর্মব্যপদেশে বাস করিতেন।

দ্বারভাঙ্গাতে তাঁহার ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। ১৬ বছর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং ২০ বছর বয়সে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ.এ পড়িবার জন্য মেট্রোপলিটনে (বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। কিন্তু শিল্পের প্রতি আকর্ষণের আধিক্য-হেতু পাস করা সম্ভব হইল না। শিক্ষার অন্যান্য বিভাগে পড়াইবার জন্য অভিভাবক-গণের চেষ্টাও ব্যর্থ হইবার পর তিনি কলিকাতা গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টস্-এ ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ তখন উহার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে অবনীন্দ্রনাথ প্রিন্সিপ্যাল ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যে প্রীত হন। স্কুলে এবং পরে বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথের নিকটই তিনি শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত তাঁহার বহু চিত্র প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় ভগিনী নিবেদিতা একদিন আর্টস্ স্কুলের এই তরুণ শিল্পীর চিত্রনৈপুণ্যে বিশেষ আকৃষ্ট হন। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বতোভাবে পুনরুজ্জীবনের জন্য ভগিনী নিবেদিতা যে বিষয়ে যাঁহাকে উন্নতির সহায়ক দেখিতেন, তাঁহাকেই যথাসাধ্য সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দান করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্নিযুগের ঋত্বিকদিগকে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি যেভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই অসীম আগ্রহ লইয়া ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনু-প্রেরণা দান ও সহায়তা করিয়াছিলেন নন্দলাল বসুকে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি লেডি হেরিংহাম অজন্তা গুহার চিত্রগুলি নকল করিতে আসিয়াছিলেন; ভগিনী নিবেদিতাই সে সময় নন্দলাল বসুকে সেখানে পাঠাইয়া দেন তাঁহার কাজে সহায়তা করিতে। নন্দলালবাবুর সহকর্মী অসিত হালদারও তাঁহার সঙ্গে যান। ভগিনী নিবেদিতার নিকট তিনি নানাভাবে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, পরজীবনে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি পুনঃপুনঃ সে কথার উল্লেখ করিতেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর কলাভবনে যোগ দিবার পর শান্তিনিকেতনের সহিত নন্দলাল বসুর আত্মীয়তা গভীর হইয়া উঠে এবং এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সেখানেই তিনি স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন;

কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। শান্তিনিকেতনের কলাভবন তাঁহারই কীর্তি বহন করিতেছে। বহু বিদেশাগত ছাত্র এখানে ভারতীয় ছাত্রদের সহিত ভারতীয় শিল্প শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে তিনি ভালবাসিতেন গভীরভাবে, স্বাধীনতা দিতেন তাহাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। কলাভবন ও শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহার স্মৃতি নিবিড় ভাবে বিজড়িত।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত চীন, জাপান, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া আসেন, এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত যান সিংহলে।

মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লবণআইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত করেন।

ভারতীয় শিল্পে তাঁহার অতুলনীয় অবদানের জন্য ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন; বিশ্বভারতী তাঁহাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন কিছুকাল পরে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি. লিট.' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভগিনী নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত নিবিড় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরের মন্দিরটি তাঁহার পরিকল্পিত। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিপূত মাটির ঘরগুলিকে ঠিক সেই ভাবেই রক্ষা করিয়া, এবং সেগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই তিনি মন্দিরটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কামারপুকুরের কথা উঠিলেই তিনি উহাকে তাঁহার পরমতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের বেদী এবং উহার পৃষ্ঠপট, মন্দিরগাত্রের নবগ্রহের মূর্তি প্রভৃতি বহু অঙ্গ তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিতও তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত বহু পুস্তকের প্রচ্ছদপট এবং উদ্বোধন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলির বহু চিত্রাদি তিনি আঁকিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্যসাধারণ গুণভূষিত হইয়াও তিনি অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর আচরণের সংস্পর্শে যাঁহারা একবারও আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট তাঁহার নিরহঙ্কার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত।

তাঁহার দেহাবসানে শিল্পজগতের ও বিশ্বভারতীর যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। উদ্বোধন কার্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণও অপরিমেয়।

এই মহাপ্রাণ শিল্পাচার্যের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শিল্পচর্যায় শিল্পাচার্য নন্দলাল

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী

মর্মরিত শালবীথির ছায়ায় স্তব্ধবেদনায় নিথর হয়ে আছে কলাভবন। নিদাঘদিনের প্রখর দুপুরে লালধুলোর ঘূর্ণীহাওয়া তাকে ছুঁয়ে চলেছে বারে বারে—ফেলেআসা দিনের কত স্মৃতি বাতাসের ঐ উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে হৃদয় মথিত করে যেন বেরিয়ে আসছে। কত দিনের নিবিড় সম্পর্ক তাঁর সাথে! এই ভবনের অন্তরালে কত গ্রীষ্ম এসেছে ঘুঘুডাকা ক্লান্ত দুপুরে শ্রান্ত পথিকের রূপ ধরে, কত বর্ষা এসেছে মল্লার-রাগে নৃত্যপরা হয়ে, বাউলের একতারায় আগমনীর সুরে কত শরৎ বিধৃত হয়েছে রূপে রঙে; তুলির স্পর্শে সজীব হয়েছে সোনার ফসলে উপচেপড়া হেমন্তলক্ষ্মী, কুহেলী আবরণে নিজেকে ঢেকে প্রকাশিত হয়েছে শীতঋতু আর বিচিত্র সাজে কতবার কতভাবে মূর্ত হয়েছে চিরহরিৎ বসন্ত। শান্তিনিকেতনের এই শান্ত-পরিবেশে দিনের পর দিন আচার্য নন্দলাল একান্তে শিল্পদৃষ্টি তুলে ধরেছেন প্রকৃতির বিবর্তনের ছন্দলয়ের দিকে—মনের গভীরে প্রেরণা পেয়ে পুলকিত চিত্তে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন শিল্পচর্যার জোয়ারজলে। প্রাণ দিয়ে যা অনুভব করেছেন আবেগ দিয়ে তা নিঃশেষে প্রকাশ করেছেন তুলি ও বর্ণের অপরূপ বিন্যাসে; রঙের জগতে রূপের জগতে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করেছেন আপন আনন্দে বিভোর হয়ে। কল্পনার ভাবলোকে আরূঢ় থেকেও তিনি বাস্তব সংসারকে দূরে না রেখে তার সঙ্গে সংযোগসূত্র বেঁধেছেন অতি নিপুণভাবে। তাঁর শিল্পীসত্তা বাস্তব জীবনকে ঘিরে অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে প্রতিফলিত করেছিল স্বর্ণরশ্মির বর্ণচ্ছটায়; তাঁর বস্তুধর্মী চিত্রও তাই এক অদৃশ্য মায়ায় মনকে বাস্তবতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। বিশ্বপ্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ত স্পন্দিত হয়েছে তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টায়। বনানীর শ্যামলিমার মাঝে লালমাটির পথ বেয়ে যারা দলবেঁধে গান গেয়ে চলেছে তাদের উচ্ছলতা চিত্রের রেখাবন্ধনী ছাপিয়ে উঠে মনকে জানিয়ে যায় শিল্পী নিজেকে কতটা একাত্ম করে নিয়েছেন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, কত নিবিড় ভাবে অনুভব করেছেন গ্রামীণ জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্নাকে। সাঁওতাল পল্লীর নিতান্ত সাধারণ ঘটনাও দরদী-মনের ছোঁয়া পেয়ে রূপায়িত হয়েছে অপরূপ মহিমায়। জীবনের নাট্যমঞ্চের একপাশে বসে গেছেন শিল্পী রঙতুলি হাতে করে আর একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন—সাধারণ ঘটনাও সেখানে জীবন্ত তাৎপর্য নিয়ে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

ঘনায়মান অন্ধকার দিনে গুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসাধনার যে দীপশিখাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন তারই বিচ্ছুরিত আলোয় শিষ্য নন্দলাল দেখতে পেলেন শিল্পপরিক্রমার নূতন সরণী—নূতন দিগন্তের দিক্‌চক্ররেখা ধীরে পরিস্ফুট হ'ল অপস্রিয়মাণ তমিস্রা ভেদ করে। রূপছন্দের অনুসরণ করে সুরু হ'ল পথচলা। অনির্বাণ শিখায় জ্বলে রইল সাধনার দীপটি আর তারই আলোয় শিল্পচেতনা ছুটে চলল অর্গলমুক্ত পথে বাধাবন্ধহারা। নিত্যনূতন শিল্পসম্পদ আহরণ করে চললেন চলতি পথের দুধার থেকে; সৃষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল অভিনব চিত্ররূপে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব ও রীতি এসে মিলেছিল

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতির ভিতর কিন্তু উত্তর-সাধক নন্দলাল মনে প্রাণে সাড়া দিলেন প্রাচ্য-ভূমির শাশ্বত রূপকলার আহ্বানে—ভারতের ভাবগঙ্গার পেলব পলিতে অঙ্কুরিত হ'ল চারু-শিল্পের শ্যামল সম্ভাবনা। সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের হাতছানিতে সে অচিরে বিকশিত হয়ে উঠল রূপে রসে ছন্দে। প্রতীচীর শিল্পে অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকাশের অবকাশ নেই; বস্তুজগতের অপরূপ ব্যঞ্জনা সেখানে রূপে রঙে বিধৃত হয়ে আছে। অথচ চোখের দেখা ছাড়িয়ে মনের গভীরে একান্ত নিভৃতে শিল্পের রসাস্বাদনে বিভোর থাকা ভারতের আবহমানকালের ঐতিহ্য। প্রাচীন ভারতের শিল্প তার সকল শিল্পকর্মে অরূপের বাণী চিরদিন বয়ে এনেছে রেখার বন্ধনে, রঙের আভাসে, ভাস্কর্যের ভঙ্গীতে আর স্থাপত্যের উৎকর্ষে। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের এই ইন্দ্রিয়াতীত আবেদনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই প্রতীচ্যের প্রভাব কাটিয়ে তাঁর শিল্প যাত্রা করেছিল প্রাচ্যরীতির অভিযানে। গুরুর এই অভিযানকে নিজ শিল্পশৈলীর দিশারী-রূপে নন্দলাল বরণ করে নিয়েছিলেন—রেখার সাবলীল ছন্দকে মনোনীত করেছিলেন ভাব-প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে।

ভারতীয় চিত্রকলার শিল্পৈশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে প্রেরণা লাভের উৎসমুখে কল্যাণীমূর্তিতে দাঁড়িয়ে নন্দলালকে দিনের পর দিন উৎসাহ দিয়েছেন ভারতকল্যাণে নিবেদিত-প্রাণা ভগিনী নিবেদিতা। কালের যবনিকার অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা ভারতসংস্কৃতির গৌরবময় শতাব্দীগুলি দুর্নিবার আকর্ষণে নিবেদিতাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-সৌধের সিংহদ্বারে—অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন আস্তীর্ণ স্মারকপ্রান্তে। তাঁর ক্রান্তদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'ল আগামী ভারতের নবরূপ—শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপর যার ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। ভাবী জাগৃতির আগমনপথ সুগম করতে তাই তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। শিল্পসংস্কৃতির পুনর্জাগরণে অবনীন্দ্রনাথকেও তিনি অনুপ্রাণিত করেন। নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় নন্দলালও ভারতীয় ভঙ্গীতে নিজস্বভাবে চিত্রকৃতি সুরু করেন। জননীর মমতায় ঘিরে, অকৃত্রিম স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত করে নিবেদিতা নন্দলালকে নিয়ে গেলেন ভারতীয় চিত্রকলার চিরায়ত সৌন্দর্যের বেদীমূলে—চিরসুন্দরের উপাসনার সংকল্প নিয়ে নন্দলাল নিবিষ্ট হলেন শিল্পসাধনায়। তাই অজন্তার ভিত্তিচিত্রের অনুকৃতি করতে বসে তিনি আবেগবিহ্বল চিত্তে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন; বিচিত্র চিত্রবাজি তাঁর শিল্পীসত্তায় ঝংকার তুলে আনন্দতানে মেতে উঠল; মুখর অতীত রূপরসের বরণডালা সাজিয়ে নবীন অতিথিকে অভিনন্দিত করে নিয়ে গেল নন্দনসৌধের মণিকুট্টিমে—শিল্পীমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল চিরকালের জন্য। সেই উচ্চ সৌধশিখর থেকে তিনি দেখতে পেলেন জাগ্রত শিল্পচেতনার সুদূরবিস্তৃত পরিধি। নবোদ্যমে প্রাণবন্যাধারায় প্লাবিত করলেন ঊষর শিল্পক্ষেত্র; দিকে দিকে জেগে উঠল নূতন প্রাণের স্পন্দন—পুনরুজ্জীবনের দোলায় হিল্লোলিত হ'ল ভারতীয় শিল্পকলা; সার্থক হ'ল নিবেদিতার স্বপ্ন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিবেদিতা নন্দলালকে নিয়ে গেলেন সনাতন ভারতের আত্মিকরূপের সংস্পর্শে; অন্তর্দৃষ্টির বিমল আলোয় নন্দলাল বিভোর হয়ে দেখলেন সেই বিভাসিত রূপটি।

অধ্যাত্মচিন্তার আবেষ্টনে সকল কর্মপ্রচেষ্টায়

ছন্দোবদ্ধ ভাবটি ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল শিল্পীর অন্তরে দীর্ঘমূল বিস্তার করে—উত্তরকালে তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তপ্রকরণে রূপের প্রদীপ দিয়ে আরতি করে চললেন অপরূপের মানসমূর্তি। আত্মনিবেদনের সুরটি অন্তরে ধ্বনিত হয়ে অভিব্যক্ত হ'ল ভক্তিরসনিষ্যন্দী তুলির রসধারায় বিচিত্র বর্ণপ্রলেপে রেখার সৌকর্যে আর রূপের মধুরিমায়। রূপের পূজারী ক্রমে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে রূপাতীতলোকের দ্বারদেশে উপনীত হলেন—মঙ্গলজ্যোতির উদ্ভাসিত আলোকে সুন্দরের সোপান অতিক্রম করে আশ্রয় পেলেন সত্যসুন্দরের পদপ্রান্তে। সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্ময়বপু পুরুষের সৌন্দর্যচ্ছটায় ভাস্বর হয়ে একে একে প্রকাশিত হ'ল আচার্যের পৌরাণিক চিত্রাবলী। মহাযোগী শংকরের রূপসৃষ্টির আবেদনে তাই মিলেছে অভ্রভেদী শৈলশিখরের গাম্ভীর্য আর নীলাম্বুর গভীর ব্যাপ্তি; বর্ণবিন্যাসে ফুটেছে ভিখারীর রিক্তসৌন্দর্য। রূপলাবণ্য যোজনায় শিল্পী প্রতিপদক্ষেপে প্রকাশ করেছেন ভারতের চিরকালের শ্রদ্ধানত ভাবটি এবং সেইজন্যই আচার্যের তুলির স্পর্শে প্রতি দেবচরিত্র বা মহামানবচরিত্রই দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে মহিমোজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে। কল্পনার মন্দাকিনীতে অবগাহন করে পৌরাণিক চিত্র মাত্রই অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উঠে এসেছে রসোত্তীর্ণ সৈকতভূমিতে নবোদিত সূর্যের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য অঙ্গে ধারণ করে।

অন্তহীন যাত্রাপথে মহাকালের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অগণিত প্রাণের আবর্ত সৃষ্টি করে; তারই প্রবাহে আজ আনন্দসাগরে যাত্রা করেছে শিল্পাচার্যের মুক্ত আত্মা। বসুন্ধরার কোলে সেখানে যখনই অসীম আশা নিয়ে শিল্পীমন বিকশিত হয়ে উঠবে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে শিল্পী যখন যথার্থই নিজেকে উৎসর্গ করবে শিল্পসাধনার বেদীমূলে, ঊর্ধ্বলোক থেকে আচার্যের আশিস্‌ধারা নেমে এসে শিল্পীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে চরমপ্রাপ্তির লক্ষ্যে - শিল্পের হবে অমৃতসাগরে উত্তরণ।

শ্যামাসঙ্গীত

(সুর—রামপ্রসাদী)

শ্রীসুধীরকুমার দাস

বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ,
আমি শরণ নিলাম সেই চরণে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

যা করছি মা মর্ত্যলোকে
সব কিছুই মা দিলাম তোকে
আপনার বলতে রইলো শুধু
ওই চরণের শরণ মনে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

(আমি) বিশ্বজনে বলবো ডেকে,
তোরা দেখে যারে আমার মাকে,
মা বসে আছেন আলো করে
সবার হৃদি-সিংহাসনে।
ভয় নাই মাগো আর মরণে॥

সমালোচনা

Parliament of Religions (1963-1964) Published by Swami Sambuddhananda, Secretary, Swami Vivekananda Centenary, 163, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta 14. *Pp.* 409+xvi. Price Rs. 18/-.

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত Parliament of Religions স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। স্বামীজীর উদাত্ত বাণীর মধ্যে মানবসমাজ সেদিন ধর্মসমন্বয়ের গভীর সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ধর্মসমন্বয়ের মহাবাণীই যে মানবজাতিকে যথার্থ ভ্রাতৃত্বের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এ তত্ত্ব মানুষ সেদিন নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল।

সেই ধর্মমহাসভার অবিস্মরণীয় কাহিনীকে মানস-নেত্রের সম্মুখে রাখিয়া স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিকীতে তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাস পর্যন্ত একটি ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই ধর্মমহাসভায় যে-সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল সেগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি Parliament of Religions নামক একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তা ও মননশীলতার জগতে এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি একটি বহুমূল্য সম্পদ।

ধর্মসমন্বয়ের জগতে স্বামীজীর অতুলনীয় ভূমিকার উপর এই গ্রন্থে নানা দিক হইতে বিভিন্ন মনীষিগণ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছেন। বিভিন্ন রচনাগুলির দীপ্তিতে স্বামীজীর বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভার একটি মহৎ আলেখ্য পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ-কথায় তাই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার অভ্রান্ত ভাবেই বলিয়াছেন—"It is needless to add that the towering personality of Swami Vivekananda emerges out of all these discourses as the great guide of the future of humanity."

গ্রন্থটিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি (সম্প্রতি-লোকান্তরিত) স্বামী মাধবানন্দজীর ও শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতির ভাষণ ব্যতীত ৫৮টি রচনা স্থান পাইয়াছে। রচনাগুলি চিন্তাশীলতা ও ওজস্বিতার দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মসমন্বয় যে কেবল একটি পবিত্র সঙ্কল্পমাত্র নহে, তাহার যে একটি গভীর তাৎপর্য আছে, স্বামীজীর বাণীর আলোকে বহু মনীষী এই গ্রন্থে তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্মসমন্বয়ের প্রকৃত অর্থ, প্রত্যেক ধর্মই আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষের ধর্ম-জীবনকে পুষ্ট করিবে।

স্বামী মাধবানন্দজীর ভাষণে সকল ধর্মের এই প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে—"The religion of the less advanced tribes is as much religion as that of more civilized communities."

শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রশান্ত-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতায় ভাস্বর একটি মনোজ্ঞ রচনা। তাঁহার একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য। ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে শ্রীমুখোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদীপ্ত ভাষণে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"The emphasis on inner life has therefore to be re-established, for the

very practical reason to bring order in the outer life. The principle of the one who experiences the inner life is to become all things to all men throughout his life. ···He promises sincerity, he commands trust, he spreads goodness and gives the impression of God and truth and spreads it everywhere. His every act is a meditation and worship."

জীবন-তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতারূপে স্বামীজীর অসামান্য ভূমিকার বিশ্লেষণে দুইটি অসাধারণ প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধদুইটি Mrs. Maria Burgi লিখিত Western and Indian Minds' structure and Vivekananda এবং Science and Vivekananda. প্রথম প্রবন্ধে Madam Burgi দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্পর্কে দ্বৈততত্ত্বের সমস্যা কেমন করিয়া স্বামীজীর দর্শনব্যাখ্যার মধ্যে তাহার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। Mrs. Burgi বলেন—"It is the problem of contradictions as explained in the Maya doctrine by Vivekananda which reveals to us, Westerners, the characteristic Indian outlook of philosophy. ···Indian metaphysics constitutes a method and in order to help us to transcend opposition and to do it 'here and now' it asks us to follow different paths adapted to the temparament of each one of us—actif, affectif, reflectif. Different paths are the Yogas which Vivekananda exposes to the West with an unsurpassable clarity for us and mind's austerity."

Science and Vivekananda প্রবন্ধে Mrs. Burgi ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিজ্ঞান তাহার সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা চরম সত্যের সম্বন্ধে যে তত্ত্বের আভাস পাইতেছে স্বামীজী বিজ্ঞানের এই পরিণতির সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁহার অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন।

Mrs. Burgi-র মতে "In the gross, mechanical materialism of our environment Swami Vivekananda, profoundly rooted in the spirit of Advaita Vedanta was able to foresee the dawn of a new Era and to point the way to a new epoch. This prophet of titanic strength and superhuman courage raised his voice to give spiritual expression to the new perspectives of the West. আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সাম্প্রতিক আবিষ্কার স্বামীজীর প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তকে কি বিস্ময়কররূপে সমর্থন করিতেছে এ প্রবন্ধটি পাঠ না করিলে তাহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। Mrs. Burgi তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে এই স্মরণীয় উক্তি করিয়াছেন—"Vivekananda came to the West to attest the strength and the significence of life's non-manifested power. His presence among us was like a guiding beacon of power and of light, which the benevolent Providence had seen fit to send us. He showed us the way to broader reality, away from the suffocating workshops of the Machine."

এই গ্রন্থের আরও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধের পরিচয় পুস্তক-সমালোচনার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নহে। দর্শন, বিজ্ঞান, স্বামীজীর প্রচারিত জীবনবাদ এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে এ গ্রন্থে যে সকল উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তুলনা যথার্থ ই বিরল। স্থানাভাববশতঃ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদারের Universal Religion,

Gustav Mensching রচিত The Message of Swami Vivekananda, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের The Buddha, Sri Sankaracharya and Swami Vivekananda প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলির কেবল নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

বস্তুতঃ স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সার্থক আয়োজনটি কেবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয় নাই। গভীর চিন্তা ও নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে স্বামীজীর বাণীর পুণ্য মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রথিত কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

—প্রেমবল্লভ সেন

স্মৃতি-সঞ্চয়ন : স্বামী তেজসানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৪৯, মূল্য—সাড়ে তিন টাকা। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষসংশ্রয়—বহুজন্মদুর্লভ এই সৌভাগ্যত্রয়ের মিলিত আস্বাদে পরিপূর্ণ 'স্মৃতি-সঞ্চয়ন' সাম্প্রতিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা-জগতে অনন্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-ভাগীরথীর পুণ্যোদকস্পর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের জীবন-ধারায় প্রবাহিত হয়ে তাঁর অন্তর্জীবনে যে অমৃতসঞ্চয় রেখে গেছে, অতীত-স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তারই কিছু অংশকণা তিনি পাঠকদের উদ্দেশে প্রকাশ করেছেন। 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় প্রকাশকালে এই স্মৃতি-চিত্রগুলি পাঠকসমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেকথা আজও অনেকেরই মনে আছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেই স্মৃতি-চিত্র-চতুষ্টয়ের সঙ্গে জীবনীচিত্রও সংযোজিত হওয়ায় দিব্যজীবনের পটভূমিতে স্মৃতির উজ্জ্বলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ—এই চারজন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রকাশে চিরায়ত সাহিত্যের সংযম, গভীরতা ও ওজোগুণ-মণ্ডিত ভাষা বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সেই সঙ্গে পাঠকের অন্তরে অধ্যাত্ম-আগ্রহের উদ্দীপনেও এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। পরম-শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর লিখিত ভূমিকায় আছে—"দেবপ্রতিম এই সব মহা-পুরুষদের সান্নিধ্যে আসিয়া যে-সকল ব্যক্তি ধন্য হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে তাঁহারা সুকৃতিবান। ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিতে অবশ্যই মহা-পুরুষদের পবিত্র সৌরভ ভরিয়া থাকে—আর সে সৌরভে অন্যরাও আমোদিত হয়। বর্তমান স্মৃতি-পুস্তিকাখানিরও প্রকৃত মূল্য এইখানে।" উদ্ধৃত মন্তব্যসম্বন্ধে পাঠকমাত্রেই একমত হবেন। এ বই একবার পড়ে বহুবার পড়তে ও ভাবতে ইচ্ছা জাগবে। বলা বাহুল্য, খুব কম বই সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে।

সমগ্র গ্রন্থের স্মৃতিসৌরভ যে প্রশান্ত লাবণ্যে এ গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে বিধৃত, তার জন্য প্রচ্ছদ-শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী আমাদের আন্তরিক সাধুবাদের যোগ্য। প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, সৌন্দর্য ও রুচির সমন্বয় বিশেষ প্রশংসনীয়।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মুক্তধারা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [সংস্কৃতানুবাদ : অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সাহিত্যশাস্ত্রী] ১৩২।৫, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা ৩১। মূল্য—পাঁচ টাকা।

ভারত-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা একহিসাবে সমার্থক। সংস্কৃতের ধ্রুপদী পটভূমি না থাকলে

এ দেশের জীবন, মনন, সাহিত্য বা সাধনা কোনটিই সম্পূর্ণতা পায় না। সংস্কৃত অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা, বর্তমান ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাব-উৎস। ভাষাশাস্ত্রের পণ্ডিতমণ্ডলী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের মূলান্বেষণে 'সংস্কৃত'-চর্চার দ্বারাই সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের সব সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড়ো কারণ সংস্কৃতের বিপুল ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য। স্বাভাবিকভাবেই, সংস্কৃতের এই বহুযুগব্যাপী ধারণীশক্তি লক্ষ্য করে একালের বিদ্বন্মণ্ডলীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ রাষ্ট্রভাষার বিরোধ নিরসনে সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর নানা ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে সংস্কৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখিত। বিশেষতঃ তাঁর পরিকল্পিত ও আংশিক-লিখিত 'India's message to the World' গ্রন্থের সূচনায় ভারতবর্ষের ভাষাগত ঐক্যসম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আজকের দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষাসমস্যার) একমাত্র সমাধান।"

কোন বিশ্রুতকীর্তি লেখকের রচনাকে সংস্কৃতে অনুবাদের অর্থ সর্বভারতীয় ভাবলোকের সঙ্গে তার সংযোগ-সাধন। কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তো সংস্কৃতানুবাদের ক্ষেত্রে সে হিসাবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেখক। আধুনিক বাংলায় সংস্কৃতের সবচেয়ে সার্থক প্রভাবের নিদর্শন রবীন্দ্ররচনাবলী। ভাষার নিজস্ব প্রতিভার সঙ্গে কবিব্যক্তিত্বের অলৌকিক ব্যঞ্জনায় মিশে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলার কবি, তেমনি সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী এর আগেই রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অনুবাদ করে সুধীজনের প্রীতি অর্জন করেছেন। তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকের সুন্দর সাবলীল অনুবাদটিও সহৃদয় সাহিত্যানুরাগীদের প্রশংসাধন্য হবে, সন্দেহ নেই। অনুবাদ মূলানুগ, অথচ অনুবাদকের অনায়াস-নৈপুণ্যে মূলরচনার সৌরভ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ। 'মুক্তধারা' নাটকের বন্ধনমুক্তির আদর্শ সর্বভারতীয় সংস্কৃতের স্পর্শে নবীনতর সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে, বাংলা মূলরচনায় সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার দেশজ সারল্য সংস্কৃত অনুবাদে রক্ষা করা কঠিন। সেদিক থেকে সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত সংলাপ-প্রয়োগের কৌশল আরো সহায়ক হ'তে পারে।

এ যুগের বঙ্গসংস্কৃতিকে যাঁরা সংস্কৃতভাষার পুণ্যগঙ্গোদকে অভিষিক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধারূপে 'মুক্তধারা'র অনুবাদক অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী আন্তরিক অভিনন্দনযোগ্য। সংস্কৃতে রূপান্তরিত মুক্তধারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারসমূহের সম্পদ বৃদ্ধি করুক—এই প্রার্থনা।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬৪তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য :

(১) অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ১৩৬। ২,৩৫২ জন রোগীকে ভরতি করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৮৬১ জন আরোগ্য লাভ করে। ৭৮৬ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। দৈনিক গড়ে ৯৫টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। গঙ্গার ঘাট ও রাস্তা হইতে আনিয়া ৩৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

(২) বাহিরের রোগীর চিকিৎসা-বিভাগে (শিবালা-শাখাসহ) ৫৭,৭০২ জন নূতন এবং ১,৭৪,৫৯৪ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৬৩৭। এই বিভাগে মোট ৪,৩৬৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় এবং ৩৯,৩৬৭টি ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

(৩) বৃদ্ধ ও আতুর নিবাসে—যাহাদের কোন সংস্থান নাই এইরূপ ১৩ জন পুরুষ ও ২৩ মহিলাকে রাখা হইয়াছিল।

(৪) সাহায্যদান বিভাগ হইতে ১০৫ জন অসহায় ও বৃদ্ধ মহিলাকে মাসিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,১৪৪·২৫ টাকা।

(৫) সাময়িক ও বিশেষ সাহায্য-বিভাগ হইতে বিপন্ন ১০৭ জন ভ্রমণকারীকে খাদ্য বা অর্থ সাহায্য করা হয়, মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,৪৩৫·৯৩ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৩০১·৩৩ টাকা মূল্যের ৭০টি কম্বল ও ধুতি বিতরণ করা হয়।

(৬) প্যাথলজি বিভাগে ৭,৯৮০টি নমুনা পরীক্ষিত হয় এবং এক্স-রে ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে ১,৬২৭ জন রোগীর পরীক্ষা করা হয়।

(৭) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বৃত্ত তহবিলের আয় হইতে রচনা-প্রতিযোগিতা, শিশুদের বই ইত্যাদিতে ২৩১ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৩৯ জন দরিদ্র শিশুকে ৭৬৮ খানি পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

(৮) আলোচ্য বর্ষে ২৫টি শয্যা সমন্বিত চক্ষু-বিভাগ খোলা হইয়াছে।

(৯) সেবাশ্রমের কর্মীদের সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে।

বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক সেবাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার অধিকাংশ কার্যই মিশনের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়; ভক্তবৃন্দও সেবাকার্যে অনেক সহায়তা করেন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং সহৃদয় জনগণের সাহায্যে পবিত্র তীর্থ কাশীধামে এই সেবাশ্রমের মাধ্যমে নরনারায়ণসেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে।

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুগাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই প্রাসাদোপম ভবনটি ও অন্য একটি ভবন খেতড়ির রাজা বাহাদুর স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতি রক্ষাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশনকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে দান করেন। এই ভবনদ্বয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি মাতৃমন্দির (Maternity Home), একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। পাঠাগারে ৫০টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। ৩ হইতে ৭ বৎসরের শিশুদের জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে 'সারদা শিশুবিহার' নামে প্রাক্-প্রাথমিক নার্সারি স্কুল খোলা হইয়াছে। আশ্রমে নিয়মিতভাবে গীতা আলোচনা এবং সাময়িক উৎসব করা হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল :

নভেম্বর, ১৯৬৫ : আধ্যাত্মিক জীবনে খাদ্যের প্রভাব ; চঞ্চল মনকে বশে আনা ; সুখের সন্ধানে ; জীবনে যাহা অবশ্যম্ভাবী।

ডিসেম্বর, '৬৫ : ফ্রয়েড ও বেদান্ত মতে স্বপ্নতত্ত্ব ; যে জগতে আমরা বাস করি ; শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী ; প্রকৃতিস্থ কে ?

জানুআরি, '৬৬ : মৌনাবলম্বনের শক্তি ; বেদান্তের প্রয়োজন ; জগতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ; ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার উপায় ; যাঁহারা সরল তাঁহারাই ধন্য।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে উপনিষৎ আলোচনা হইয়াছিল।

উৎসব সংবাদ

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা মার্চ বুধবার হইতে ৪ঠা মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২রা মার্চ বুধবার বৈকালে মহিলাসভায় নেতৃত্ব করেন স্থানীয় জজ সাহেবের পত্নী শ্রীযুক্তা নন্দরানী দেবী। তিনি ও বিশিষ্ট মহিলাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতি সভার অঙ্গ ছিল।

৩রা মার্চ বৈকালে স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ। তৎপর প্রবীণ উকিল শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, প্রফেসার শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সরকার, শ্রীতুষারকান্তি দেব, শ্রীনিত্যগোপাল দাস প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে।

৪ঠা মার্চ শুক্রবার মঙ্গলারতি, বেদস্তুতি, শ্রীশ্রীগীতাপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন ও রামায়ণ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। বৈকালে প্রায় ৪ হাজার লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা-ভজনাদি দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জনসভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন ও তৎপত্নী শ্রীমতী শান্তি সেন "আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচার" সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

মহকুমাশাসক শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, তমলুক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজদাস চৌধুরী এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী প্রভৃতিও ভাষণ দেন। পরে বেতার-শিল্পী শ্রীপূর্ণ দাস বাউল-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন ডক্টর সেনের সভাপতিত্বে আশ্রমের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের অন্যান্য দিন শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্তী, শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুরশিল্পী ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে "সাবিত্রী-সত্যবান" সবাক্ চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাঁথি : গত ৮ই এপ্রিল হইতে দিবসত্রয়-ব্যাপী কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজাদি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, হরিনাম-সংকীর্তন, ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল; প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভার ব্যবস্থা ছিল। স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী মহানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মানন্দ মহারাজ যুগোপযোগী ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় মহকুমাশাসক শ্রীদীপককুমার রুদ্র, সেকেণ্ড অফিসার শ্রীবিমলচন্দ্র মৈত্র, বি. ডি. ও. শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু, অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার এবং অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ও ধর্মসভায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভান্তে সুগায়ক শ্রীবেচু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ কর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যহ প্রায় ২,০০০ করিয়া জনসমাগম হইত। ১০ই এপ্রিল রবিবার নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত ১৫টি হরিসংকীর্তন সম্প্রদায়ের হরিনাম-সংকীর্তনে আশ্রমপরিবেশ আনন্দ-মুখরিত হইয়াছিল। তিন দিনে মোট প্রায় ৭,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ধুবড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

ধুবড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৩০শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, বাস্তুযাগ, সপ্তশতীহোম, শ্রীশ্রীকালীপূজা, ভজন, যাত্রাভিনয়, ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ও ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী অনুপমানন্দ, স্বামী ইজ্যানন্দ, প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করাতে সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। সর্বসাধারণের অর্থসাহায্যে এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে এবং এজন্য প্রায় ৪২,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বগড়ীবাড়ীর শ্রীমতী সিন্ধুরানী চৌধুরাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তিটি গড়াইয়া দিয়াছেন।

উৎসবের শেষদিন প্রায় ৮,০০০ লোককে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

মিহির সেনের পকপ্রণালী অতিক্রম

কলিকাতার বিখ্যাত সাঁতারু ৩৬ বৎসর-বয়স্ক ব্যারিষ্টার শ্রীমিহির সেন গত ৬ই এপ্রিল বুধবার সকাল ৭টা ২৪ মিনিটের সময় পক প্রণালী অতিক্রম করিয়া প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

ভারত ও সিংহলের মধ্যে পকপ্রণালীর দূরত্ব ২২ মাইল। শ্রীমিহির সেনের এই পথ অতিক্রম করিতে সময় লাগে ২৫ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। তিনি ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ৫।৪০ মিনিটের সময় সিংহলের তালাইমান্নার নিকটবর্তী ওল্ড লাইটহাউসের নিকট হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগের ফলে এখানে স্রোত খুব বেশী থাকায় মিহির সেনকে পকপ্রণালীর দূরত্ব ছাড়াও বেশী দূরত্ব অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পকপ্রণালী অতিক্রম করিতে সমুদ্রের হাঙ্গর, বিষধর সর্প ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সম্মুখীন হন। পূর্ণিমার দিনে এই পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাকে প্রবল ঢেউয়ের সঙ্গে সারাক্ষণই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার সাফল্যের পিছনে ভারতীয় নৌবহরের কর্তৃপক্ষের ও স্থানীয় জেলেদের সহযোগিতা অনেকখানি কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কাজ করিয়াছে তাঁহার অদম্য দৃঢ়তা। যে পথ বারো ঘণ্টায় পার হইবার কথা ছিল, সে পথ পার হইতে লাগিয়াছে প্রায় ২৬ ঘণ্টা। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহাকে কি পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে শ্রীমিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বিশ্বের মধ্যে তিনিই প্রথম সাঁতারু, যাঁহার ভাগ্যে 'ডাব্‌ল্' লাভ অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেল ও পকপ্রণালী অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী পার হওয়ার দ্বৈত কীর্তির অধিকারী বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ শ্রীমিহির সেনের অসামান্য সাফল্যের জন্য ভারতবাসী মাত্রই গর্বিত।

উৎসব-সংবাদ

হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ কর্তৃক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব গত ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রত্যহ পূজাপাঠাদিসহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন ২২ তারিখ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩ তারিখ অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রতুল চন্দ্র চৌধুরী, ২৪ তারিখ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। ২২ ও ২৩ তারিখ সভান্তে রামায়ণ গান করেন শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। ২৪ তারিখ সভান্তে রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম কর্তৃক 'শ্রীশ্রীমা' সবাক্ চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৫ তারিখ 'বামাক্ষ্যাপা' নাটক অভিনীত হয়। ২৬ তারিখ শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা-মন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠান ও পারিতোষিক বিতরণের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার বিষয়ে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তা। সভান্তে ভাগবত পাঠ করেন শ্রীসীতারাম ভাগবতাচার্য। ২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার নরনারায়ণের সেবায় প্রায় বাইশ শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে কালীকীর্তন ও সন্ধ্যায় লীলাকীর্তন হয়। ২৮শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় 'মহা উদ্বোধন' নাটক অভিনীত হয়।

খেপুত (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ফাল্গুন (১৩৭২) মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ঊষা-কীর্তনসহ মঙ্গলারতি, প্রাতে প্রভাতফেরী, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা হোম, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-

বিতরণ, রাত্রে কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরদিন ১১ই ফাল্গুন বুধবার 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল।

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ৪ঠা মার্চ সকালে পূজা-হোম-পাঠাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিকালে এক ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সেনগুপ্ত 'কথামৃত' আলোচনা করেন। পরে চারি সহস্র ভক্তকে চিঁড়া ও ফলমূল প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রে রামায়ণগান হইয়াছিল।

৫ই মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আলোচনা ও 'কথামৃত' পাঠ এবং রাত্রে রামায়ণ-গান হয়। ৬ই মার্চ আয়োজিত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী অন্নদানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী। রাত্রে রামায়ণগান হয়।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ (কলিকাতা ৫০): গত ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ এবং ১৭ই হইতে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-উৎসব আশ্রম-প্রাঙ্গণে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সংঘের বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়, রাধারমণ কীর্তনসমাজের কীর্তন, স্বামী পুণ্যানন্দজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, প্রাচ্যবাণী কর্তৃক সংস্কৃতনাটক, রামরতন সাংখ্যশাস্ত্রীর ভাগবত-কথকতা এবং শিকদার-বাগান সমাজের শ্রীরামকৃষ্ণ-যাত্রাভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন দিনে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী জীবানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা এবং ডঃ রমা চৌধুরী। ইহা ছাড়া বিখ্যাত রামায়ণগায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী তিন দিন রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রতিদিন এই আনন্দানুষ্ঠানে হাজার হাজার নরনারী যোগদান করেন। সমাপ্তিদিবসে একটি শোভাযাত্রা সিঁথি অঞ্চল পরিক্রমা করে এবং পরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সিঁথি অঞ্চল উৎসবের কয়দিন খুব আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

টালিগঞ্জ: গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ইন্দ্রাণী পার্ক, টালিগঞ্জ কর্তৃক স্থানীয় পল্লীবাসিগণের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একত্রিংশ-দধিক শততম আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন পূজাদি ও প্রভাতফেরী লইয়া পল্লী-পরিক্রমার পর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ভক্তিমূলক গান ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় আরাত্রিকের পর অনুষ্ঠিত জন-সভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, প্রধান অতিথি ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। শ্রীগণপতি পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিন সন্ধ্যারতির পর শ্রীতারক দাস মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারতত্ত্ব আলোচনা করেন। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র ও সেবাশ্রম (গান্ধী কলোনী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন।

এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের শুভেচ্ছাবাণী সহ একটি জয়ন্তীগ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বেহালা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র, পর্ণশ্রী : গত ২৭শে ও ২৮শে মার্চ দুইদিন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, কীর্তনসহ পল্লী-পরিক্রমা, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমতী সুমতি মুখোপাধ্যায় 'সীতার পাতালপ্রবেশ' বিষয় অবলম্বনে কীর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসারদা সংঘের সভ্যাগণ সান্ধ্য আরাত্রিকভজন এবং বিশিষ্ট শিল্পিগণ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উৎসবে পর্ণশ্রী অঞ্চলের শত শত নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন।

বাণীদেবীর দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নিউ-আলিপুর শ্রীসারদা আশ্রমের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও সম্পাদিকা বাণীদেবী গত সোমবার ২৫শে এপ্রিল বৈকালে উক্ত আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীর নিকট ১৪ বৎসর বয়সে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। বাল্য হইতে দীর্ঘকাল (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) তিনি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রথমে তিনি ছাত্রীরূপে আসিয়াছিলেন; শিক্ষালাভের পর সেখানেই অন্যতমা শিক্ষিকার ও পরে প্রধান শিক্ষিকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার সহকর্মিণী ও ছাত্রী-গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সরোজকুমার কাঞ্জিলালের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, দুর্গাপুর প্রকল্পের চীফ ইঞ্জিনীয়ার সরোজকুমার কাঞ্জিলাল গত ২৫শে ফেব্রুআরি করোনারি থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সর্বজনপরিচিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভারত ও বঙ্গ সরকারের বহু প্রয়োজনীয় বিভাগে তিনি দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম টেলিফোন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। কলিকাতার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন বিভাগ তাঁহারই কীর্তি। দুর্গাপুর প্রকল্পের জন্য আহূত হইয়া তিনি উহার বিভিন্ন বিভাগ অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন।

বাংলার যুবকদিগকে যাহাতে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত করিয়া বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায়, ইহা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল।

তাঁহার দেহত্যাগে একটি হৃদয়বান একনিষ্ঠ কর্মীর অভাব ঘটিল। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষদ্—৩।১।৮

(সবার অন্তর-বাসী পরমেশ যিনি
একমাত্র শুদ্ধ-মনবুদ্ধি-গম্য তিনি।)
চক্ষু বাক্ আদি অন্য ইন্দ্রিয় সকল
তাঁহারে ধরিতে গিয়া হয় যে বিফল।
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কিম্বা তপস্যায়
তাঁহার স্বরূপ কভু জানা নাহি যায়।
অবয়বহীন সেই পরম-আত্মারে
নিরন্তর একমনে ধ্যান যেবা করে,
আত্মধ্যানে হয় যাঁর বিশুদ্ধ অন্তর—
আত্মা হন তাঁরি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর।

কথাপ্রসঙ্গে

অন্তর্মুখিতা বা আধ্যাত্মিকতা—মানবতাকে বাঁচাইবার উপায়

মানুষের মনের চাহিদার কোন শেষ নাই। পাওয়া যতই যাক না কেন, তৃষ্ণা চিরঅপরিতৃপ্তই থাকিয়া যায়, এবং আরো চাহিয়া চলে।

পথের ভিখারী, যে হয়ত পেট পুরিয়া খাইতেই পায় না, পরিবার কাপড় পায় না, দুবেলা পেট পুরিয়া খাওয়া, দুখানা নূতন কাপড় পাওয়াই তাহার নিকট তখন জীবনের পরম কাম্য। সে যদি তাহা পায়, কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটাইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার পরই মন আবার আরো বেশী কিছু চাহিবে—আহার ও পরিচ্ছদের মান সে আরো একটু উন্নত করিতে চাহিবে। তৃষ্ণার দাহ আবার সুরু হইবে। তাহাও যদি পায়, তবুও তৃষ্ণা মিটিবে না। যে পরিবেশে যখনই যে উন্নীত হইবে, সেই পরিবেশেই সে চাহিবে উহার মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে, আরো উন্নততর ভাবে থাকিতে। ক্রমে হয়ত বাড়ী, গাড়ী, অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা, সম্মান সবই ক্রমে ক্রমে সে প্রভূত পরিমাণে পাইল; কিন্তু তথাপি তাহার চাওয়া কোথাও থামিবে না। লালসার এই চির-অতৃপ্ত রূপ অনেকসময় অতি উৎকট ভাবে সর্বজনসমক্ষে প্রকট হইয়া পড়ে অত্যন্ত ধনী প্রতিষ্ঠাবান সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যেও, এবং মহাভারতে বর্ণিত রাজা যযাতির উক্তিই স্মরণ করাইয়া দেয়—"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তম্"—পৃথিবীতে যত প্রকারের যে পরিমাণ ভোগ্য-বস্তু আছে, তাহা যদি সমস্ত একত্র করা হয়, তাহা একজন মাত্র মানুষের তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষেও পর্যাপ্ত হয় না।

ইহাই হইল তৃষ্ণার রূপ। তাই তৃষ্ণা যতক্ষণ থাকে, মানুষ যত ভোগ্যবস্তু লাভ করুক না কেন কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না, অশান্তির আগুনে মন পুড়িতেই থাকে। শুধু তাহাই নহে, উহা ক্রমে বাড়িয়াই চলে, কারণ ভোগ যত বেশী করা যায় তৃষ্ণা ততই তীব্রতর হইতে থাকে। তৃষ্ণার পিছনে ছুটিয়া মানুষ যাহার জন্য ছোটে সেই শান্তি ও অফুরন্ত আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না। তাই, কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতাকে যমরাজ যখন বিপুল ঐশ্বর্য বিশাল সাম্রাজ্যাদি, এবং তাহা প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিবার মত অতি দীর্ঘ পরমায়ুঃ দিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'আমি যাহা দিলাম, তাহা ছাড়া আরো যদি কিছু ভোগ করিবার ইচ্ছা তোমার মনে জাগে তো বল, তোমাকে তাহা সবই দিব—কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি—এ সব লইয়া যতদিন খুশি—শরদো যাবদিচ্ছসি—বাঁচিয়া থাক', তখন নচিকেতা সবই প্রত্যাখ্যান করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—আমাকে কত সম্পদ আপনি দিবেন যমরাজ? যত বিপুল পরিমাণেই দিন না, মন তাহাতেও তৃপ্ত হইবে না—মানুষ কখনো বিত্তলাভে তৃপ্ত হয় না।'...আর বলিয়াছিলেন, 'জীবন যত দীর্ঘই হউক না কেন, একদিন তাহার শেষ আছে—জীবন স্বল্প; যাহার মাধ্যমে ভোগ করা যায় সেই দেহেন্দ্রিয়ও জীর্ণ, জরাগ্রস্ত হয় একদিন।'

দেহেন্দ্রিয় এক সময় জীর্ণ হয়, ভোগ করিবার শক্তি হারায়, কিন্তু ভোগতৃষ্ণা তখনো প্রবল থাকে ; রাজা যযাতি দীর্ঘ সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া মর্ত্য ও স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুসকল উৎসাহী হইয়া ভোগ করিবার পর এই সত্যটিই তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, তৃষ্ণা 'ন জীর্যতি জীর্যতঃ'। একটি দেহ নষ্ট হইবার পর এই বিষয়-ভোগেচ্ছা, এই চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণা, এই বাসনাই আমাদের টানিয়া লইয়া চলে জীবন হইতে জীবনান্তরে ; একটি দেহ বিনষ্ট হইবার পর তাহার চাই আর একটি দেহ, যাহার মাধ্যমে আবার সে ভোগের জন্য বিষয় আহরণ করিতে পারে। স্থূলদেহ সহজে নষ্ট হয়, কিন্তু মন, যাহা সূক্ষ্মদেহের অঙ্গীভূত, এত সহজে নষ্ট হয় না ; যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকে ততক্ষণ উহাকে বুকে লইয়া সে দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া দীর্ঘায়িত করিয়া চলে জীবনপথ।

দেহান্তরে এই তৃষ্ণার বিকাশ ঘটে কিছুটা বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া, কিছুটা দেখিয়া, কিছুটা শুনিয়া, এবং কিছুটা পূর্বাজিত অভিজ্ঞতাবশে স্বতই। তৃষ্ণাচালিত হইয়া বিষয়লাভের জন্য উহার পিছনে ছোটার প্রবৃত্তি মনে যখন অতি-প্রবল হইয়া উঠে, তখনই উহা মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে। সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লালসার এই অসংযত প্রকাশই সর্ববিধ দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনিষ্টের মূলে রহিয়াছে। মনের এই বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন-প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার একমাত্র উপায়, যে জন্য সে তৃষ্ণাচালিত হইয়া বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাকে সেই আনন্দ অন্য উপায়ে দেওয়া। আমাদের লক্ষ্য বিষয় নয়, লক্ষ্য আনন্দলাভ ; বিষয়ের মাধ্যমে আনন্দ লাভ হয় বলিয়াই বিষয় আমাদের প্রিয়। কিন্তু আনন্দ কি বিষয়ে থাকে ? বিষয় মূর্ত—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, কিন্তু আনন্দ মনেরই একটি অবস্থা মাত্র—অমূর্ত ; পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, উহার কার্যকে পারি (যেমন পারি না মনকে বা অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকে)। যেমন আমরা বিদ্যুৎ দেখিতে পাই না, আলো, গতি প্রভৃতি উহার কার্যগুলিকে দেখি। বহিরিন্দ্রিয় মূর্ত বিষয়কে স্নায়ুস্পন্দনাকারে মস্তিষ্ককেন্দ্রে বাহিত করিলে সেখানে একটি প্রতিক্রিয়া হয়। এ পর্যন্ত স্থূল বস্তুর সহিত তাহার সংযোগ, এ পর্যন্ত ক্রিয়া স্থূল। কিন্তু তাহার পর যে অন্তরিন্দ্রিয়গুলি মস্তিষ্ককেন্দ্র হইতে সেই প্রতিক্রিয়াকে মন পর্যন্ত বাহিত করে এবং মনে তজ্জনিত যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর নহে—তাহা অমূর্ত। কারণ মন ও অন্তরিন্দ্রিয় অচেতন পদার্থবিশেষ হইলেও যেসব অচেতন বস্তু আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদের উপাদান অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত। (এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলির শাস্ত্রীয় নাম 'তন্মাত্র' ; এই তন্মাত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মাটি, জল, আলোক প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের উপাদান সৃষ্টি করে)। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগজনিত যে প্রতিক্রিয়া মনে হয়, তাহাই বিষয়ানুভূতি। এগুলি সূক্ষ্ম হইলেও এগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে আমরা অনুভব করি। কিন্তু এই সব অনুভূতিজনিত যে আনন্দ, তাহা এক—রূপের অনুভূতিজনিত, শব্দের অনুভূতিজনিত, স্পর্শের অনুভূতিজনিত আনন্দের স্বরূপ একই ; মাত্রায় তারতম্য অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই থাকিতে

পারে। এই আনন্দ আমাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে, বিষয়ে নহে; ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে বিষয় বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারূপে মনে পৌছাইয়া সেখানে একটি অবস্থার সৃষ্টিমাত্র করিতে পারে যাহা আনন্দের উৎসমুখটি খুলিয়া দিবার সহায়ক হয়। বহির্বিষয়ের সহিত সংযোগ ছাড়াও মনের এই অবস্থা হইতে পারে। বহিরিন্দ্রিয় হইতে মন পর্যন্ত পথের যে কোন স্থানে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই তাহা সম্ভব। যেমন একটি ছবি দেখিতেছি ও দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি। ছবিটির সহিত চোখের সংযোগের ফলে চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে দেখার কেন্দ্রে যে প্রতিক্রিয়া হয়, ছবির সহিত চোখের সংযোগ এবং তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর স্পন্দনের মাধ্যম ব্যতীতও যদি কোন কারণে মস্তিষ্ককেন্দ্রটিতে তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়, তাহা হইলেও কিন্তু আমাদের মনে ছবি দেখার এবং তজ্জনিত আনন্দের অনুভূতি জাগিবে। অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও ইহা কিন্তু প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। চোখের সামনে কোন বস্তু রাখিলে চোখের রেটিনায় উহার প্রতিবিম্ব পড়ে। উহার প্রতিক্রিয়াটি মস্তিষ্ককেন্দ্রে যে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, ছবিটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইবার পরও কিছুক্ষণের জন্য সে প্রতিক্রিয়াটি স্থায়ী হয়; সেই সময়টুকু আমরা চোখের সামনে ছবি না থাকিলেও ছবি দেখি এবং দেখিয়া আনন্দ পাই। এই সত্যটির জন্যই আমরা চলচ্চিত্রে বস্তুর সাবলীল গতি দেখিতে পাই, এই সত্যটির জন্যই ঘূর্ণমান আলোকবিন্দু মনে আলোকবৃত্তের (বস্তুতঃ কোন আলোকবৃত্ত না থাকিলেও) প্রতীতি জন্মায়। আবার বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়া স্মৃতিজনিত প্রতিক্রিয়ায় মনে আনন্দের উৎসমুখ খোলার মত অবস্থা হইতে পারে; যেমন হয় স্বপ্নে। আবার গভীর নিদ্রায়, সুষুপ্তিতে মনের উপর বহির্বিষয়, মস্তিষ্ককেন্দ্র, অন্তরিন্দ্রিয় কোন কিছুই ক্রিয়াশীল হয় না, কোন কিছুর সহিত সংযোগও থাকে না; অথচ তখন আনন্দ অনুভব করি আমরা। এই আনন্দ সম্পূর্ণরূপে বিষয়নিরপেক্ষ। স্বপ্ন পর্যন্ত স্থূলরূপে না হইলেও সূক্ষ্মাকারে, স্মৃতির আকারে বহির্বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ কিছু থাকে—একথা হয়ত বলা চলে; কিন্তু এখানে তাহাও থাকে না; বিষয়ানুভূতিরাহিত্যই এখানে আনন্দের কারণ।

মনের একটি বিশেষ অবস্থাই যখন আনন্দের উৎসমুখ খুলিবার কারণ, এবং বিষয়ের সহিত সংযোগ ছাড়াও যখন তাহা ঘটা সম্ভব, তখন বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে মনের এই অবস্থা আনিতে পারিলেই আর আমাদের আনন্দের জন্য উন্মত্ত হইয়া ভিখারীর মত জাগতিক বিষয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না। কিন্তু চেষ্টা করিয়া মনের এই অবস্থা আনা কি বাস্তবিক সম্ভব? যাঁহারা বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সব সত্তাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহারা স্বয়ং এই আনন্দলাভ করিয়া 'আত্মারাম', বহির্জগতের কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়াও সদানন্দময় হইয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব। সম্ভব, শুধু এইটুকুই বলেন নাই, মন এবং মন অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর সত্তা, আনন্দময় সত্তাকে (কারণশরীর) সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়া, উহাদের ধর্ম জানিয়া তাঁহারা বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দলাভের পন্থারও নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতিরেকেই তজ্জনিত আনন্দ অপেক্ষাও

অধিকতর আনন্দের উৎসমুখ খুলিবার পথ দেখাইয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালেই জীবনের এত বড় একটি সমস্যা সমাধানের কার্যকরী বাস্তব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা অন্তর্মুখ হইতে পারিয়াছে এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সে ভাব বজায় রাখিয়াছে। যুগে যুগে বহির্মুখিতার নূতন নূতন এবং প্রচণ্ড বেগবান দুর্যোগ আসিয়াও তাহার এই অন্তর্মুখী ভাবকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই (কোন দিন পারিবেও না)। বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দ লাভের সন্ধান পাইয়াছিল বলিয়াই ভারত ভোগ অপেক্ষা ত্যাগকেই উচ্চাসন দিতে পারিয়াছে, ত্যাগ ও সেবাকেই জাতীয় আদর্শ করিতে শিখিয়াছে।

কারণ, ত্যাগই অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে আনন্দ আহরণ করার দ্বার রুদ্ধ করাই হইল জীবনে শ্রেষ্ঠ, অবাধিত, অফুরন্ত আনন্দ লাভের পথ। আমাদের সভ্যতার নিয়ামক সত্যদ্রষ্টাগণ সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াই একথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং সাধারণ মানুষ এপথে কিভাবে চলিলে বিষয়নিরপেক্ষভাবে এই আনন্দ লাভ করিতে পারে, তাহার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। উপায় আর কিছুই নহে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অভ্যাসসহায়ে মনকে বহির্বিষয় হইতে গুটাইয়া আনিয়া, বহির্বিষয়ের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়া উহাকে অন্তর্মুখ করার এবং সেখানে একটিমাত্র নাম বা রূপের চিন্তায় তাহাকে একাগ্র করার, অথবা চিন্তাশূন্য করার চেষ্টা করা। আমরা জানি, নাম অথবা রূপ ছাড়া চিন্তার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন চিন্তার বিষয় হয় কোন কথার আকারে অথবা কোন ছবির আকারে অথবা উভয়ের মিলিত আকারে মনে ভাসিয়া উঠিতেছে ; ইহা ছাড়া চিন্তা হয়ই না। সাধারণ অবস্থায় মন অতি চঞ্চল ভাবে একটি হইতে অপর একটি নাম ও রূপে ছুটিয়া বেড়ায়, অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে যুক্তিসম্মত, বা দেশকালগত কোন সামঞ্জস্যও থাকে না। সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের নজরে পড়ে না—মনকে একটি-মাত্র নাম বা রূপে একাগ্র করিবার বা চিন্তাশূন্য করিবার চেষ্টা করিলেই তাহার এই চঞ্চল রূপটি স্পষ্ট দেখা যায়। একটি বিশেষ নাম-রূপে একাগ্র করিবার সময় মন যতবার অন্যত্র চলিয়া যায়, ততবারই উহাকে ঘুরাইয়া আনিয়া পূর্ব-স্থানে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হয়—'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ।' ইহারই নাম অভ্যাস, এবং একমাত্র এরূপ অভ্যাস সহায়েই মনকে স্থির করা সম্ভব। এভাবে অভ্যাস-সহায়ে মনকে অন্তর্মুখী ও একাগ্র করার চেষ্টা যত সফলতার পথে অগ্রসর হয়, অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্বার ততই অবারিত হইতে থাকে। বাঞ্ছিত প্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে আনন্দের এই দ্বার অবারিত করার সহায়ক যে অবস্থা মনে হয়, মনস্থির হওয়ার ফলে মনের সে অবস্থা আপনা আপনি হইতে থাকে ; অনেক বেশী করিয়াই হইতে থাকে। সত্যদ্রষ্টাগণ এদেশের সর্বসাধারণের জন্য মনস্থির করিবার সহজ সরল যে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, উহাদের মধ্যে একটি হইল ভগবদ্ভক্তি দ্বারা মনকে শান্ত করার প্রচেষ্টা। প্রতিদিন প্রভাত, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা প্রভৃতি সময়ে, বিশেষ করিয়া দৈনন্দিন কার্যারম্ভের পূর্বে প্রভাতে শ্রীভগবানের কোন নামের বা রূপের চিন্তার পুনরাবৃত্তি, বা নিজ নিজ রুচিমত প্রার্থনা ও ভজন প্রভৃতি নিয়মিত-

ভাবে করিয়া চলিলে মন ক্রমে স্থির হইয়া আসে। মনকে একাগ্র করার জন্য ভজনের শক্তি অসীম। শিশুদের মন পর্যন্ত সঙ্গীতে একাগ্র হয়। ছন্দের দোলায় মনকে পুনঃপুনঃ একই ভাবে দোলা দেওয়াই (যাহা একাগ্রতা-সাধনের একটি বিশেষ উপায়) ইহার মূল।

এভাবে চেষ্টার ফলে মন ক্রমে যত অন্তর্মুখী ও একাগ্র হয়, অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্বার ততই অবাধিত হইতে থাকে। দেহ-মনপ্রাণে ততই উহা একটি প্রশান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। একাগ্রতা যত গভীর হইতে থাকে, এই প্রশান্তির প্রলেপও তত গাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে থাকে। আনন্দলাভেচ্ছু মন এই স্থির আনন্দের আস্বাদ যত বেশী পায়, ততই সে উহা আরো বেশী পাইবার জন্য আগ্রহী হয়—আনন্দের জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ততই তাহার কমিতে থাকে। দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে মনকে এভাবে স্থির করিয়া আনার আরো একটি সুফল হইল—মানসিক চঞ্চলতা কমিয়া যাওয়ায় দৈনন্দিন কাজকর্ম আরও সুষ্ঠুভাবে করা যায়। কর্মক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। সংসারে কর্মের মাধ্যমে অমৃতত্ব ও নিত্য আনন্দ লাভের উপায় রূপে গীতায় যাহা বর্ণিত আছে—মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া, মনের সাম্যভাব বজায় রাখিয়া অথচ উৎসাহী হইয়া কার্য করা (অন্যান্য কর্ম-ক্ষেত্রের তো কথাই নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের মত প্রচণ্ড চিত্ত-বিক্ষেপকারী কর্মক্ষেত্রেও মনের এই সাম্য বজায় রাখিয়া কাজ করা), স্বামীজীর কথায়, প্রচণ্ড কর্ম-তৎপরতার মধ্যে চিরপ্রশান্ত থাকা—সেই লক্ষ্যের দিকেই আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর করাইয়া দেয় নিত্য নিয়মিত মন স্থির করার এই অভ্যাস। ইহার সফলতা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে মধুময় করিয়া তোলে তৃষ্ণাজনিত অতৃপ্তি ও অশান্তির দাবানলে বিষয়নিরপেক্ষ স্থির প্রতিক্রিয়াহীন আনন্দসলিল সিঞ্চনে ; দৃপ্ততর তো করেই।

আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎসমুখ অবাধিত করার সহায়ক এইরূপ আরো বহুবিধ নিত্যকর্মের দ্বারা আমাদের সভ্যতা ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত। নিজের মধ্যে তলাইয়া যাইয়া নিজের স্বরূপের সন্ধানের নামই আধ্যাত্মিকতা, ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমাদের সমাজকে, আমাদেব জীবনকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক বলা হয়। মানুষকে 'মানুষ' করার ইহা একটি রাজপথ। ব্যক্তিগত বা জাতি-গত আনন্দ লাভের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া হইতে, অপরের সুখসুবিধা এমনকি সর্বনাশের দিকেও দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া ধন, মান, আধিপত্য প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু আহরণে প্রবৃত্ত হওয়া হইতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষকে নিবৃত্ত করার ইহাই একমাত্র পথ—তাহার জীবনকে আধ্যাত্মিক করার, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া আনন্দের জন্য বহির্জগতের বিষয় আহরণে প্রয়োজনরহিত করার চেষ্টা করা।

আমাদের সভ্যতায় সমাজের সর্বস্তরে অবস্থিত প্রত্যেকটি লোক যাহাতে এই বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদ কিছুটা পায়, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করা রহিয়াছে ; যে সভ্যতায় সর্বসাধারণের জীবনকে এভাবে অন্তর্মুখী করিয়া দ্বেষ-হিংসা-সংঘর্ষের মূল কারণ অত্যধিক এবং অসংযত বিষয়তৃষ্ণাকুল অশান্তিময় স্তর হইতে অনাবিল আনন্দময় সংযত উচ্চতর জীবনস্তরে তুলিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহার নাম আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সভ্যতা ; আমাদের সভ্যতা এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের এ ভিত্তিভূমি ত্যাগ করিয়া বহির্মুখী ভাবের ভিত্তিতে দাঁড়াইবার ভয় অবশ্য ভারতের ভাগ্যবিধাতার কৃপায় বহুপূর্বে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বহির্মুখী সভ্যতার সর্ববিধ প্রলোভন কাটাইবার মত শক্তিমান এখনো হয় নাই ; যাহার ফলে দুর্নীতি ও অন্যায় ক্রমশই আমাদের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র পথ হইল বহির্জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টার সঙ্গে সর্বসাধারণের অন্তর্জীবনের মানও উন্নত করার চেষ্টা করা এবং এদেশে তাহা করিবার সহজতম উপায় হইল ভগবানের প্রতি মন একাগ্র করিবার বা সাধারণভাবে মন চিন্তা-শূন্য করিবার নিত্য অভ্যাস সহায়ে মনকে বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদলাভের দিকে অগ্রসর করাইবার ব্যবস্থাগুলির পুনঃপ্রচলন করা। যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের জীবনাদর্শে ইহা দেখানো এবং সর্বপ্রকারে ইহার সমর্থন এবং উৎসাহদানই জনগণকে এবিষয়ে আকৃষ্ট করিবার উপায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোককেই নিজনিজ পন্থাবলম্বনে এবং যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাসী নহেন তাঁহাদিগকে সাধারণ-ভাবে একাগ্রতার সাধনে প্রয়াসী করার মত সুযোগ ও উৎসাহপ্রদান শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে অবিলম্বে করা প্রয়োজন। দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা তাহাতে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয় না– যদি ব্যবস্থাগ্রহণের সময় কোথাও পক্ষপাতিত্ব দেখানো না হয়। মনঃসংযমের ব্যবস্থা সকল ধর্মেই আছে, মানুষ সাধারণতঃ সেগুলিকে অভ্যাস করিতে ক্রমশঃ ভুলিয়া যায় ; সেগুলিকে শুধু জীবনে রূপায়িত করাই হইল কাজ। আমরা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া এবিষয়ে উদাসীন থাকিলে জাতির উন্নতিপথের বাধাপসারণ বিলম্বিতই হইবে।

মানুষের আদর্শ হিসাবে আমরা আজ যাহা চাহিতেছি—ধর্মদ্বেষহীনতা, সাম্য, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিলোপসাধন, পারস্পরিক প্রীতি— তাহা সবই পাইবার ইহাই হইল সহজপথ। ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে অন্তর্জীবন-গঠনের বাস্তব ব্যবস্থা ছাড়া কোন 'বাদ' দিয়াই তাহা সম্ভব নহে, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে তো নহেই। শুধু ভারতবর্ষ কেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্যেও নহে ; বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তিভূমি হইতে সরাইয়া আনিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে পাশ্চাত্যসভ্যতারও বিনাশ আসন্ন হইবে। আজ জগতের বিষম অবস্থায় ইহার সম্ভাবনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি—আপাতদৃষ্টিতে অতি উন্নত, অতি সুসভ্য মানুষেরও আধিপত্য ও সম্পদ লাভেচ্ছু মনের অপরিমেয় অসংযত ভোগ-তৃষ্ণা জাতীয়তা ও মতবাদের রূপ ধরিয়া এবং উহাদের সংহতির শক্তি লইয়া হিংস্র পশুর মত মানবতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি আমরা সত্যের দিকে ফিরিয়া তাকাইব না, এই বহির্মুখী সভ্যতার দিকেই বা শূন্যপানে নিরপেক্ষ দৃষ্টি মেলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

Bagh Bazar
57 Ramkanta Bose's St.
(১৯ শে মে, ১৮৯৭)

My dear Akhandananda,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি কলিকাতায় থাকার দরুন সময়মত জবাব দিতে পারি নাই। যাহা হউক তোমরা বেশ করিয়া কার্য করিবে। টাকার পুনরায় আবশ্যক হইলে ১০।১২ দিন আগে লিখিবে। তোমরা যদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা না করিতে পার তাহা হইলে ১০ টাকা ঐ fund হইতে আপাততঃ লইয়া নিজ ব্যয়ের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত fund-এ দিবে ; যদ্যপি বেশী লোকের আবশ্যক না হয় তাহা হইলে সকলে গুলতান করিবার আবশ্যক কি আছে ? যে মত বিবেচনা হয় করিবে। ইতি

Brahmananda

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব-
পাদপদ্মভরসা

৫ই জুন, ১৮৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ২রা জুনের এক পত্র পাইলাম। আমরা বসুমতী কাগজে রিপোর্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছি—যদি তোমরাই বসুমতীতে একেবারে পাঠাও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মঠে যেন প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া তোমাদের কার্যবিবরণ-সম্বলিত পত্র আসে। মিররে আমরা ক্রমশঃ ঐ কার্য-বিবরণ প্রকাশ করিব। তোমরা ঐখানকার ভদ্রলোকদিগকে বলিয়া ইংরাজী কাগজে কার্য-বিবরণ প্রকাশ করিবে। যদি…কোন পত্রিকায় কার্য-বিবরণ প্রকাশ হয়, তবে সেই পত্রিকা মঠে পাঠাইবে। টাকা পাঠাইয়াছি ; টাকাপ্রাপ্তির সংবাদের জন্য চিন্তিত আছি, সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর করিবে। তোমরা আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস
ব্রহ্মানন্দ

ভগবৎপ্রসঙ্গ*

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬২)

ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা গাড়ীঘোড়া, ভাল বাড়ী ইত্যাদি লাভের জন্য জন্মাইনি। সাধনভজনের দ্বারা ভগবানকেই লাভ করতে হবে। ভগবান একজনই, কিন্তু বিভিন্ন তাঁর নাম ও রূপ। এই নিয়ে ঝগড়া করার কিছু নাই। দক্ষিণদেশে বিষ্ণুর ভক্ত শিবের মন্দিরে যাবে না, আবার শিবের ভক্ত বিষ্ণুর মন্দিরে যাবে না। আমাদের ক্ষুদ্র মন নিয়ে অনন্তকে কি করে বুঝব?

ভগবান অতি দুর্লভ জিনিস। অপূর্ব বস্তু। তিনি টাকাকড়ি বা পদমর্যাদা দেখেন না: শুধু প্রাণের কথা শোনেন। তাঁর কাছে ছোট ছেলের মত আবেদন নিবেদন জানাবে। তাঁর দয়াই আসল। সাধনভজন একটুও করলে তিনি এগিয়ে আসেন। নিজে যতটুকু পার চেষ্টা করে যাও। পূর্বদিকে যত এগোবে পশ্চিম ততই পিছনে পড়বে। সংসারের আসক্তি ততই ধীরে ধীরে কমে আসবে। উইপোকা দেখেছ না? দেখতে কত ছোট কিন্তু চেষ্টার ফলে কত বড় 'ঢিপি' তৈরী করে ফেলে। তাই প্রয়োজন চেষ্টা ও আন্তরিকতা। জোয়ার এলে আর দাঁড় টানতে হয় না। হাওয়া পেলে পাল তুললেই হল।

ঠাকুর দয়া করে মানুষের শরীর ধরে এসেছেন। তিনি পরমগুরু। তাঁর মধ্যেই সব ভাব রয়েছে। তাঁর স্থূলশরীর চলে গেলেও তিনি সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে এখনও রয়েছেন।

(বেলুড়মঠ, বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬২)

ভগবানই একমাত্র সারবস্তু। বাকী সব ছায়া মাত্র। ভগবান আছেন, এইটি ষোলআনা বিশ্বাস করতে হয়। এযুগে ঠাকুর বৈজ্ঞানিকের মত নিজের অনুভূতি দিয়ে দেখে তবে বলে গেলেন।

মা তাঁকে দেবী বলেই জানতেন। তাই তাঁর শরীর গেলে মা কেঁদে উঠলেন; বললেন: মা কালী গো, কোথায় গেলে গো?

আবার ঠাকুরও তাঁকে দেবী বলে জানতেন। একদিন মা তাঁর পদসেবা করতে করতে জিজ্ঞেস করছেন: তুমি আমাকে কি মনে কর?

অমনি ঠাকুর বলে উঠলেন: যে মা মন্দিরে ভবতারিণীরূপে পূজো পাচ্ছেন, সেই মা-ই এখন নহবতে রয়েছেন (তাঁর গর্ভধারিণী মা) আবার তিনিই এখন আমার পায়ে হাতবুলিয়ে দিচ্ছেন।

কাজেই তিনই এক। ঠাকুর পুরুষশরীর নিয়ে এলেও তাঁর মাতৃভাব।

খুব চেষ্টা করে যাও। প্রথমে চোখ বুজলেই তো অন্ধকার। তা হোক্‌গে যাক। এইভাবে চেষ্টা করতে করতেই হবে।

(বেলুড় মঠ, বুধবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬২)

ঠাকুর জীবরূপ ধারণ করে কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয় দেখিয়ে গেলেন। যে নামেই ডাক, জানবে ভগবান এক। প্রাণ ভরে ডাকতে ডাকতেই মনের মলিনতা সব চলে যাবে।

ছোটছেলে যখন যন্ত্রণা পেয়ে চিৎকার করে ডাকে মা তখন ছুটে আসেন। এক

* প্রসঙ্গের অনুলিখন।

মিনিটও দেরী করেন না। কাজেই ধৈর্য হারিও না। সময় হলে তিনি আসবেনই আসবেন। অসময়ে এলে কদর হবে না। এমন প্রতিজ্ঞা থাকা চাই যে, তাঁরই দয়ায় আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, কিছুতেই ছাড়ব না। তিনি ভেতরেই আছেন। সর্বত্র আছেন।

ভক্তি তোমাদের ভেতরেই আছে। তা নইলে তোমরা এখানে আসবে কেন? সময় পেলেই তাঁর নাম করে যাবে। দেখবে সংসার মধুময় হয়ে উঠবে। সংসার কর ক্ষতি নাই কিন্তু সাংসারিকতা ত্যাগ করতে হবে। জলে নৌকো থাকে কিন্তু নৌকোর ভেতরে জল ঢুকলেই বিপদ। সকলের আশ্রমে বা কনভেন্ট-এ যোগ দেবার প্রয়োজন নাই। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গার মত ভক্তিকে আশ্রয় করে সংসার করতে হয়। তাঁকে পেতেই হবে নইলে শান্তি নাই। টাকাকড়ি ইত্যাদি পেলে সাংসারিক সুখ হয় কিন্তু তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত আসল শান্তি হবে না।

(বেলুড় মঠ, বৃহস্পতিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬২)

শ্রীচৈতন্য নামের মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। নামরূপ বীজ বটগাছের বীজের মত। দীক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য সব হয়ে যাবে না। তবে হবেই। মন্ত্র শুধু repeat করলেই (আওড়ালেই) হবে না। চাই অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা।

তিনি সর্বত্র আছেন, যেন লুকিয়ে। আড়াল থেকে সব দেখছেন। তিনি এক শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। ঠাকুর বলেছেন, আন্তরিক হলে একদিন হবেই। কত কত জন্ম নিতে হয়েছে। কত কত বাসনা ছিল। সে সব কিছুটা পূর্ণ না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। কত সংখ্যা জপ করলাম, কত প্রার্থনা স্তবস্তুতি করলাম—এতে মন দেবার প্রয়োজন নাই। মন প্রাণ ঢেলে খুব ডেকে যাও।

সেই কাঠুরিয়ার গল্প পড়েছ ত? ক্রমশ: এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও।

প্রশ্ন: মহারাজ, সেবার ভাবে কাজ করা কেমন?

উত্তর: সেবাবুদ্ধিতে সকল কাজ করা। স্বামীজী বলেছেন, Work is worship. প্রতিটি কাজকে পূজা হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি বলেছেন। কোন কাজই ছোট নয়। সর্বভূতে তিনি রয়েছেন এইটি ভেবে তাঁরই সেবা করছি মনে করতে হবে। যেমন মন্দিরে ঠাকুরসেবা। সব সময়ে একটা ভাব নিয়ে চলতে হবে—যেন ঠাকুরই বিভিন্ন মূর্তিতে আমাদের সেবা নেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—এর নামই Practical Advaita.

তুমি তো সাধু হবার জন্য এসেছ। শুধু 'কথামৃত' পড়লে হবে না। ···স্বামীজীর বইগুলি ভাল করে পড়বে। Through স্বামীজী ঠাকুরকে বোঝার চেষ্টা করবে।

আর একটি কথা মনে রাখবে। সঙ্ঘের সেবাই ঠাকুরের সেবা। কাজেই সব সময়ে বিচার করবে, আমি সঙ্ঘের সেবা করতে এসেছি, না সঙ্ঘের সেবা নিতে এসেছি।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬২)

আজ Christmas Eve. বিশেষ শুভদিন। মন্ত্রে বিশ্বাস করে সাধন করলে অবিদ্যানাশ হয়। আনন্দলাভ হয়। ভগবানকে প্রসন্ন করতে হলে নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে ডেকে যেতে হবে।

নিজেকে দীন হীন কখনো ভাববে না। যা হয়েছে, হয়ে গেছে। সেজন্য ভেব না। ঠাকুরের কাছে তোমরা আবদার করবে। জোর করবে ছোট ছেলের মত, বলবে কেন দেখা দেবে না? তিনি যে আমাদের অত্যন্ত আপনার জন। পরম আত্মীয়।

একশর মধ্যে নিরানব্বইটা কেউ ভাল করলে সাধারণ মানুষ ভুলে যায় কিন্তু একটা মন্দ করলে মনে রাখে। আর ভগবান? তিনি নিরানব্বইটা দোষের কথা ভুলে যান কিন্তু একটি মাত্র ভালর কথা মনে রাখেন। এই হল মানুষের সঙ্গে ভগবানের তফাৎ। বুঝলে ত? ঠাকুর বলতেন, আমরা যখন যতটুকু ডেকেছি তিনি শুনে রেখেছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনিটিও শুনতে পান।

ঠাকুরকে স্মরণ করা, চিন্তা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সাক্ষাৎ ভগবান মানুষের রূপ ধরে এসেছেন। মানুষ যা নিয়ে মেতে আছে, তিনি সেই দিক দিয়েই গেলেন না। ...তার মুখ দিয়ে মা কালীই কথা বলেছেন। তাই তাঁর কথা পড়লে মনে খুব জোর পাবে। মনে হবে আমাকে কেউ ডোবাতে পারবে না। তিনি সকলের জন্য কত কেঁদেছিলেন!

আমাদের দেরী যদি হয়—তাতে ভগবানের দোষ নয়, তাঁর নামের দোষ নয়। আমাদের মনে অনেক কামনা-বাসনা আছে বলেই ঠিক ঠিক হয় না। তাই দেরী হয়। তিনি লুকিয়ে রয়েছেন ভেতরে বাইরে সর্বত্র।

(বেলুড় মঠ, শুক্রবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬২)

তাঁর ওপরে ভক্তি হলে ব্যাকুলতা আসে। জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন জলে ডোবা লোক একটু বাতাসের জন্য হাঁপিয়ে ওঠে, সাধকের তখন তেমনি অবস্থা হয়। তখন ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়।

ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। নূতন অবতার হয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি সূক্ষ্ম দেহে থাকবেন, স্বামীজী বলেছেন।

ভাব নিয়ে করতে পারলে সব কাজই তাঁর পূজা হয়। সব কাজের মধ্যে তাঁর স্মরণ মনন রাখবে। পদ্মপত্র জলে থাকে কিন্তু জলে ভিজে না। তেমনি সংসারে অনাসক্ত ভাবে কি করে থাকা যায় ঠাকুর ও মা তাঁদের জীবনে, কাজে-কর্মে আমাদের তা দেখিয়ে গেলেন। অজ্ঞান আমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে—তাই এই দুরবস্থা।

ভগবান আমাদের সব চেয়ে আপনার জন। তিনি প্রেমময়। কিন্তু তাহলে সংসারে এত দুঃখকষ্ট কেন? তার নানা কারণ। আমাদের আগের আগের বাসনা ও কার্য অনুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ হয়। তাঁর দয়া হলে জ্ঞান ভক্তি সবই লাভ হয়। কিন্তু Secret (রহস্য) হ'ল ব্যাকুলতা। তাঁর দিকে মন গেলে তিনি প্রসন্ন হন।

স্বামীজী বলেছেন, গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে না; কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই থাকে। মানুষ অন্যায় করে কিন্তু আবার ভক্তিবিশ্বাসের বলে জ্ঞান লাভ করে। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) বলতেন, কেমন জান? কাপড়ে সাবান লাগানোর মত। প্রথমে বোঝা যায় না অত ময়লা কেমন করে যাবে। কিন্তু কাচতে কাচতে সব ময়লা আলাদা হয়ে যায়। তখন কেমন পরিষ্কার দেখায়। তখন আবার উল্টো। বোঝাই যায় না যে কাপড়ে কোন কালে ময়লা ছিল।

(বেলুড় মঠ, শনিবার, ১২ই জানুআরি, ১৯৬৩)

বর্তমান যুগে শারীরিক কঠোরতার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আর বাইরের কঠোরতা করলেই তাঁকে পাওয়া যায় না। শেকল ধরে জলের নিচে যাওয়ার মত তাঁর পবিত্র নাম জপ করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। ভগবানের সব শক্তি ঐ নামেই রয়েছে। চাই নামে বিশ্বাস আর একাগ্রতা। বিভীষণ একজনের কাপড়ের খুঁটে রামনাম লিখে বলে দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও, ডুবে যাবার ভয় নাই।

কিন্তু পেলেনা বলে হতাশ হয়ে যাবে না। মনের বাসনা দূর না হলে কিন্তু তাঁর দর্শন বা কৃপা সহজে পাওয়া যায় না। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) বলতেন, ভগবান তো আর সাপ নন, মন্ত্র পড়লেই চলে আসবেন! তিনি অতি আপনজন। দয়াঘন মূর্তি। ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। ভালবাসা দিয়েই তাঁকে বাঁধতে হবে।

তিনি ভেতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন। নেবুর রসের মধ্যে যেমন নেবু ফেলে দেয়—তেমনি। কাজেই তাঁর চিন্তা দ্বারা নূতন ভাবে এবার জীবন গঠন করার চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, শ, ষ, স। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। সহ্য করা সংসারজীবনেও একান্ত প্রয়োজন।

সৎকাজ, সৎচিন্তা ও প্রার্থনা—এর দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয়। আগুন প্রথমে জ্বালান খুবই শক্ত। বৈদিক যুগে কাঠে কাঠে ঘসে আগুন বের করা হয়েছিল। এই ভক্তি-বিশ্বাসের আগুনকে নিভতে দেওয়া চলবে না। ঠাকুরতো কত ভরসা দিয়ে গেলেন। মানুষ কত দুর্বল, কত অন্যায় করে কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভগবানের কৃপায় সে ভগবান লাভ করতে পারে।

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।"

"অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে 'তত্ত্বমসি'। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।"

"দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়লে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভারতকে অবনতির এক চরম অবস্থা থেকে টেনে তুলে আনার জন্যে, মহা জড়তার আবরণ সরিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মার শক্তিকে, দেবত্বকে প্রকট করে দেবার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। শুধু ভারতের নয়, সারা জগতের মানুষের জন্যেই তাঁরা এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা যথাযথ রূপে গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ সে কাজ সমাধা করে গেছেন—জাতির ধমনীতে ধমনীতে আত্ম-বিশ্বাসের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে, তার জড়তার ভিত নাড়িয়ে দিয়ে তাকে আত্ম-বিকাশের পথ ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন; ফলে জাতি সর্ববিষয়ে আত্মার এই মহিমাকে প্রকাশ করে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে জাতির নিজস্ব বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশের সহায়করূপে এসেছেন বহু মহামানব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে ভারতের যে চিরন্তন বাণী জাতির অন্তস্তল আলোড়িত করে তুলেছিল, মানুষের সেই দেহাতীত অমিতবীর্য অমর আত্মার মহিমাকেই প্রকট করেছেন তাঁরা। নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সমকালেই ভারতে পরপর জন্মগ্রহণ করেছেন কয়েকজন মহামানব।

নরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি, কলিকাতায়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এর দু'বছর আগে এবং গান্ধীজীর জন্ম এর ছ'বছর পরে ১৮৬৯-এ। এঁদের পিছু পিছু শ্রীঅরবিন্দ এলেন ১৮৭২-এ। কালে-ভদ্রে এক-আধজন মহামানব সর্বত্রই জন্মে থাকেন। কিন্তু তৎকালীন নির্জীব সমাজকে প্রাণচঞ্চল করবার জন্যে দরকার ছিল এতগুলি প্রতিভা-সম্পন্ন লোকের একের পর এক আসা। পৃথিবীর ইতিহাসে একই দেশে এতগুলি মহারথীর এইভাবে উপর্যুপরি আবির্ভাব কদাচিৎ ঘটে। যখন ঘটে তখন বুঝতে হবে সেই দেশের ভবিষ্যৎ বিশাল সম্ভাব্যতায় সমুজ্জ্বল। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই একদিন ধর্মে এবং কর্মে মহান হয়ে উঠবে।

বিবেকানন্দের চেহারায় এবং চালচলনে একটা রাজকীয় মহিমা বিচ্ছুরিত হোতো। তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমান মহাবীর্য। কণ্ঠে জ্ঞান ও কর্মের জয়ধ্বনি নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন তিনি। যেমন পারতেন সাঁতার কাটতে, নৌকা বাইতে, ঘোড়ায় চড়তে তেমনি পারতেন সুকণ্ঠের সঙ্গীতে সবাইকে মুগ্ধ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন সেরা ছাত্র। সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে তাঁর দস্তুরমতো দখল ছিল। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথ খুব যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা আছে তাও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এটা তাঁর মনে হয়েছিল, ঋষিগণ প্রকৃতই সত্যান্বেষী ছিলেন এবং সত্যকে জানবার জন্যে কোন ত্যাগেই তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন একজন সত্যদ্রষ্টা পুরুষকে দেখবার জন্যে নরেন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বহু-বাঞ্ছিত মনের মানুষটিকে খুঁজে পেলেন। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে-বর্ণনা তিনি পেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণে সেই উপনিষদকে জীবন্ত দেখে তিনি বিস্ময়ে

শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখানে একটা কথার উল্লেখ থাকা ভালো। শ্রীরামকৃষ্ণে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে নরেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিন লেগেছিল। এ-সম্পর্কে স্বামীজী তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে একবার বলেছিলেন, "I fought my master six long years, with the result that I know every inch of the way, every inch of the way." বুদ্ধির অহংকার নিয়ে যে-যুবক একদা সংশয়াকুল চিত্তে গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করতেন, সেই নরেন্দ্রনাথই উত্তরকালে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতায় জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না, তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য! তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাসদাসোঽহং, তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবতী হোক, তিনি কি নামের দাস?"

পূর্ণ আত্মসমর্পণ আর পরিপূর্ণ ভাবে জানা একই কথা। জ্ঞান ও প্রেম এক বৃন্তেরই দুটি ফল!

বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-জীবনের নাম; নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণই বিবেকানন্দ করে তৈরী করেছিলেন। তৈরী করেছিলেন একটা বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই উদ্দেশ্যটি ছিল সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই সমন্বয়ের বাণীকে বিশ্বময় ঘোষণা করা! বস্তুতঃ সকল ধর্মের রাস্তাতেই ভগবানলাভ হয়—এই উদার বাণীর পতাকাতলে সবাইকে মেলানোর জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীতে এসেছিলেন। যত মত তত পথ—এই সত্য ঘোষণা করবার অসীম শক্তি এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিচিত্র সাধনার পথে একই পরম উপলব্ধির শিখরে পৌঁছেছিলেন বলে।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে যে-সত্য তিনি লাভ করলেন তাকে বিশ্বময় প্রচার করবার কতই না প্রয়োজন ছিল! বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরত্ব আজ নিশ্চিহ্ন-প্রায়, physical annihilation of space আর কল্পনা নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলি আজ একে অন্যের কতই না কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আজ যদি মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমরা যদি একে অন্যকে সহানুভূতির সঙ্গে জানবার চেষ্টা না করি তবে তো আমাদের এই নৈকট্য একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি করবে। কিন্তু মানুষে মানুষে মৈত্রী কি শুধু স্বাধীনতার ভিত্তিতেই সম্ভব নয়? একজন মানুষকে যখন তার নিজস্ব রুচি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা আমরা দিই তখনই শুধু তার মন পেতে পারি। প্রত্যেকটি ধর্মবিশ্বাসেরই সমান অধিকার আছে সগৌরবে বেঁচে থাকবার এবং প্রতিবেশী যাতে শ্রদ্ধাবান তাকে শ্রদ্ধা করা প্রতিবেশীর অবশ্য-কর্তব্য—এই সত্যকে যুগের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই কি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নয়?

তাঁর যুগবাণীর জয়ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে নরেন্দ্রনাথকে বেছে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্রও ভুল করেননি। শিষ্যের কণ্ঠে তো গুরুরই বাণীর প্রতিধ্বনি! সেই

স্বাধীনতার স্তব-গান! বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে বারম্বার ধ্বনিত হয়েছে: 'Freedom, oh Freedom!' is the cry of life. 'Freedom, oh Freedom!' is the song of the Soul. গুরুও তো জীবদ্দশায় বারম্বার বলেছিলেন: কারও ভাব নষ্ট করতে নেই; কেননা যে কোন একটা ভাব ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়; যে যার ভাব ধ'রে তাঁকে ডেকে যা। হিন্দুশাস্ত্রে, বিশেষতঃ গীতায়, স্বভাবের উপরে, স্বধর্মের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা অনুপম শুচিতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। আমরা যখন এই স্বাতন্ত্র্যকে বলি দিয়ে অন্যকে অনুকরণ করতে যাই তখন সেটা আত্মহত্যারই সামিল হয়। স্বভাব এবং স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করে আমরা যখন নিজেদের মতো করে অন্যদের বানাতে যাই তখনও আমরা তাদের বিষম ক্ষতি করি। তাই ঠাকুর বারম্বার বললেন: আর কারও ভাবের নিন্দা করিস নি বা অপরের ভাবটা নিজের ব'লে ধরতে বা নিতে যাসনি। পৃথিবীতে যিনি এসেছিলেন মৈত্রীর পতাকাতলে বিচিত্র-প্রকৃতির, বিচিত্র-রুচির, বিচিত্র-বিশ্বাসের নর-নারীকে মেলানোর জন্যে তিনি নিঃসংশয়ে স্বাধীনতাতেই সেই মৈত্রীর দৃঢ়তম ভিত্তি দেখেছিলেন। একথা নিমেষের জন্যেও যেন না ভুলি, বিবেকানন্দের বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিধ্বনি! বিবেকানন্দের নিজস্ব ভাষায়: "All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strength-giving, pure, and holy has been his inspiration, his words, and he himself." "আমি যদি কোন দুর্বলতা পরিবেশন করে থাকি, সে আমারই। আর আমি যা দিয়েছি তার মধ্যে যা-কিছু বলপ্রদ, প্রাণপ্রদ, শুভ্র এবং শুচি সে-সমস্তের মূলে তাঁরই প্রেরণা, সে সমস্ত তাঁরই কথা, সে সমস্ত তিনিই স্বয়ং।"

এই বিজ্ঞানের যুগে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলিকে একত্রে মেলানোর জন্যে 'যত মত তত পথ' এই বাণীর যেমন একান্ত প্রয়োজন ছিল তেমনি প্রয়োজন ছিল অনুন্নত, অবহেলিত, পদ-দলিত দুর্ভাগা জনসাধারণকে ওঠানোর। বিবেকানন্দের জীবনীতে রোমাঁ রলাঁ লিখেছেন, "Every human epoch has been set its own particular work. Our task is, or ought to be, to raise the masses, so long shamefully betrayed, exploited, and degraded by the very men who should have been their guides and sustainers." "মানবের প্রতিটি যুগেরই করণীয় নিজস্ব একটি বিশেষ কাজ আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে বা হওয়া উচিত, যাদের আমরা এত কাল নির্লজ্জভাবে শোষণ করেছি, যাদের নীচুতে আমরা নামিয়ে এনেছি, যাদের সঙ্গে আচরণে আমরা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছি, সেই জনসাধারণকে উপরে ওঠানো; আমাদের কর্তব্য ছিল তাদের পথপ্রদর্শক হওয়া, তাদের রক্ষা করা।"

বিবেকানন্দ যুগের এই কাজে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ যখন আর্যাবর্ত ভ্রমণ করে দাক্ষিণাত্যের ওপর দিয়ে চলছিলেন তখন ভারতবর্ষের কঙ্কালসার মূর্তির নগ্নতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে বেদনায় অভিভূত করে দিলো। ক্ষুধাতুর অর্ধ-উলঙ্গ লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর ম্লান মুখচ্ছবি তাঁর স্বপ্নের মধ্যেও আনাগোনা করতে লাগলো। মনের মধ্যে দিবারাত্রি উঠছে কেবল তাদেরই চিন্তার তরঙ্গ। অবশেষে

যখন কুমারিকা অন্তরীপে স্বামীজী পৌঁছালেন তখন জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দেবার পথ খুঁজে পেলেন যারা সকলের নীচে, সকলের পিছে সেই সর্বহারাদের ধূলিধূসরিত নগ্নপদপ্রান্তে।

এরপর স্বামীজীর আমেরিকা গমন। চিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর কম্বুকণ্ঠের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী ধ্বনিত হলো। সেই বাণী পাশ্চাত্য কান পেতে শুনলো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক। আমেরিকায় স্বামীজী সেই অভিযানের চরম সাফল্যের মুহূর্তেও তাঁর স্বদেশের বুভুক্ষু দরিদ্রনারায়ণদের কথা ভুলতে পারেননি। ধনকুবেরদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বিলাসের সহস্র উপকরণের মধ্যে তিনি ঘুমাতে পারছেন না; তাঁর স্বদেশের ক্ষুধার্ত জনসাধারণের অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। আমেরিকা থেকে ঐ সময়ে লেখা স্বামীজীর চিঠির পর চিঠিতে জনসাধারণের জন্যে তাঁর অসীম সহানুভূতির প্রকাশ রয়েছে।

উপনিষদে আমরা পড়েছি—পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব।

যুগের কর্ণে স্বামীজী নূতন বাণী শোনালেন, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' "For the next fifty years this alone shall be our keynote—this, our great Mother India. Let all other vain gods disappear for that time from our minds. This is the only god that is awake, our own race—'everywhere his hands, everywhere his feet, everywhere his ears, he covers every thing'. All other gods are sleeping."

কিন্তু অজ্ঞানের ঘন-মেঘে আচ্ছন্ন জড়প্রায় জীবন্মৃত জনসাধারণকে মনুষ্যত্বের প্রদীপ্ত মহিমার মধ্যে কেমন করে প্রাণচঞ্চল করে তুলবেন তিনি? ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং থেকে লেখা চিঠিতে এই প্রশ্নের তিনি জবাব দিয়েছেন। ঐ চিঠিতে আছে: "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যাব প্রচার করিয়া। ... কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম।"

ভারতবর্ষের আশাহত জড়পিণ্ডবৎ জনসাধারণকে আত্মবিশ্বাসে ও প্রাণ-চাঞ্চল্যে শক্তিমান করে তুলবার জন্যে স্বামীজী তাই বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা আপনার গুরুদেব সম্পর্কে লিখেছেন, "strength, strength, strength was the one quality he called for in woman and in man.' "শক্তি, শক্তি, শক্তি। নর-নারীর মধ্যে এই শক্তিকেই তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।" স্বামীজীর কণ্ঠে শক্তিরই আবাহনগীতি। সমস্ত উপনিষদে তো এই শক্তিরই জয়ধ্বনি। স্বামীজী, তাই, নিবেদিতাকে একদা বলেছিলেন So I preach only the Upanishads. If you look you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads it is only that one idea—strength.

স্বামীজীর Vedanta and Indian Life বক্তৃতায় আছে: People get disgusted many times at my preaching Advaitism. I do not mean to preach Advaitism or Dvaitism or any ism in the world. The only ism that we require now is the wonderful idea of the Soul—Its eternal might, Its eternal strength, Its eternal purity and its eternal perfection."

"আমার মুখে অদ্বৈতবাদ শুনে লোকে অনেক সময় বিরক্ত হয়। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত-বাদ বা পৃথিবীর অন্য কোন বাদ আমি প্রচার করতে চাই না; একমাত্র যে 'বাদ'-এ আমাদের এখন প্রয়োজন আছে, সেটি হচ্ছে আত্মাসম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা—আত্মার অনন্ত শক্তি, আত্মার অন্তহীন নির্মলতা, আত্মার নিত্য পূর্ণতা।"

স্বামীজী আবার বলছেন, "Let me tell you, strength is what we want. And the first step in getting strength is to uphold the Upanishads, and believe—I am the Soul". "আমি তোমাদের বলছি, আমাদের এখন প্রয়োজন শক্তি, আর এই শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান হচ্ছে উপনিষদকে ধারণা করা এবং বিশ্বাস করা যে 'আমি হচ্ছি আসলে আত্মা'।" সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অপরাজেয় সেই আত্মা, যাকে তরবারি ছেদন করতে পারে না, আগুন পোড়াতে পারে না, বাতাস শুকাতে পারে না।

আসলে বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তি-মন্ত্রেরই উপাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন দুর্বলতাই সকল পাপের, সকল অমঙ্গলের মূল কারণ। কম্বুকণ্ঠের ওজস্বিনী ভাষায় কতবার তিনি জলদ-মন্দ্রে ঘোষণা করেছেন, "Know that all sins and all evils can be summed up in that one word, weakness". আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর—এই প্রার্থনাই নিরন্তর তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোতো। নিবেদিতা নিজের গুরুদেব সম্পর্কে The Master as I saw Him গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন: How often did the habit of the monk seem to slip away from him and the armour of the warrior stand revealed. 'কতবার দেখেছি তাঁর অঙ্গ থেকে সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন খসে পড়েছে এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যোদ্ধার বর্ম!'

নিবেদিতার এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য! বিবেকানন্দ নিঃসংশয়ে তৈরী হয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের কঠিন ধাতুতে! জীবন তাঁর কাছে ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পদে পদে বাধা। বাধার শেষ নেই, সংগ্রামেরও শেষ নেই। পরাজয়েরও কি শেষ আছে? যেখানে একটা সংগ্রাম শেষ করে তরবারি কোষবদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছি সেখানে কোথা থেকে আহ্বান আসছে নূতনতর, কঠিনতর এবং বৃহত্তর সংগ্রাম সুরু করবার। আরামের লোভে, দুঃখের ভয়ে যদি সংগ্রামকে এড়িয়ে চলি বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরায় কুড়াতে হবে সকলের ঘৃণা, পড়ে থাকতে হবে সকলের পশ্চাতে, সকলের পদতলে।

তাইতো তরুণ ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ যে-ডাক দিয়েছেন সেই ডাকের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে অতন্দ্র প্রহরীর তূর্যনাদ। এই বর্ম-পরা ক্ষাত্রবীর্যে দুর্জয় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে আজ আমরা জানাবো, তাঁর আগ্নেয়-বাণীর বিপুল তাৎপর্যকে আমরা সম্যক-ভাবে উপলব্ধি করবো। কারণ আজ আমাদের

সব চেয়ে প্রয়োজন শক্তিসাধনার। শরীরে, মনে, আত্মায় আমাদিগকে সর্বাগ্রে বলিষ্ঠ হতে হবে।

স্বামীজী বললেন, জাতি হিসাবে আমরা বাক্‌সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। কেননা শরীরে মনে আমরা দুর্বল। সর্বাগ্রে দেহে মনে আমাদের যুবকদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তখন শক্তির পিছু পিছু ধর্ম আসবে। First of all, our young men must be strong. Religion will come afterwards. নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—এই বাণী স্বামীজীর কণ্ঠে কতবার উৎসারিত হয়েছে!

কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ থেকে যায় অর্থাৎ নিজের উপরে যদি বিশ্বাসের বিন্দু-বিসর্গ না থাকে অর্থাৎ আমি কোন কর্মেরই নই—এই ধারণা যদি কারও মনের মধ্যে শিকড় গাড়ে তবে তো তাকে দিয়ে পৃথিবীতে কিছুই করানো যাবে না। আত্ম-অবিশ্বাসে তার বাহু নিশ্চল নির্বীর্য হয়ে থাকবে। তাই স্বামীজী বারম্বার বললেন: Believe, therefore, in yourselves. The secret of Advaita is—Beleive in yourselves first, and then believe in anything else. আগে নিজেদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো, তার পর অপর কিছুতে বিশ্বাস কোরো।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা মূল্য আছে। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি পৃথিবীকে এমন-কিছু দেবার জন্যে যা আর কেউ দিতে পারে না। এই রকমের একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তবেই না মানুষ নিজেকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করতে পারে! তাই যে-মানুষ নিজেকে অপরিমেয় মূল্য দিয়ে থাকে আর যে-মানুষ নিজেকে কোন মূল্যই দেয় না—এ দুয়ের অপরাধ পাশাপাশি রাখলে হীনমন্যের অপরাধের কাছে দুর্বিনীতের অহঙ্কারের অপরাধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। খ্যাতনামা ইংরেজ সাহিত্যিক চেষ্টারটন (G. K. Chesterton) কবি ব্রাউনিং-এর কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: The crimes of the devil who thinks himself of immeasurable value are as nothing to the crimes of the devil who thinks himself of no value.

উপরে স্বামীজীর যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তাদের মুকুরে একটি বিপুল সত্যকে আমরা প্রতিবিম্বিত দেখতে পাই। এই সত্যটি হলো অধঃপাতিত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান শক্তি-অর্জনের মধ্য দিয়ে। উপনিষদের আশ্রয়-গ্রহণ একটা হীনবীর্য, নির্জীব জাতিকে প্রাণ-চাঞ্চল্যে জীবন্ত করবার জন্যে। উপনিষদ বলেছে, দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করার মূঢ়তাই সমস্ত দুর্বলতার মূলে। আসল মানুষটাতো আত্মা। সেই কথাই ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়:

যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ড-পল-গুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

'মুক্তধারা' নাটকে শিবতরাইয়ের রাজদ্রোহী ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজশক্তির দম্ভকে ভাঙবার জন্যে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। মারের ভয় থেকে তাদের মনকে মুক্ত করবার জন্যে ধনঞ্জয় তাদের হাতে তুলে দিয়েছে আত্মিক শক্তির অনুপম অস্ত্র। উত্তরকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের নিরস্ত্র জনসাধারণ আত্মার দুঃখ-বরণের সীমাহীন শক্তিকে আশ্রয় করেই বৃটিশের মারের সাগর পাড়ি দিয়েছিল। পুলিশের লাঠির ঘায়ে সত্যাগ্রহীদের মাথার খুলি চৌচির হয়ে ভেঙে যাচ্ছে—এইতো রাজদ্রোহের অনিবার্য পরিণাম

এবং সেই প্রচণ্ড মারের মুখে লাগছে না বলা কত শক্ত! যাতে শিবতরাই-এর বিদ্রোহী প্রজারা মাথা তুলে বলতে পারে লাগছে না তার জন্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী গণেশ সর্দারকে বলেছে, "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।"

অন্যায়ের কাছে বশ্যতা স্বীকারই অন্যায়ের স্পর্ধাকে অটুট রেখেছে। বশ্যতা-স্বীকারের মূলে ভীরুতা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে সে শক্তি রাখে বিদ্রোহীকে মেরে ফেলবার। 'রক্তকরবী'র রাজা এই মারের ভয় দেখিয়েই বিদ্রোহিণী নন্দিনীকে বলেছে, "আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি।" প্রাণ হারাতে আমরা স্বভাবতই ভয় করি। আঘাতের যন্ত্রণাকে আমরা ভয়ে এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু ভয়ের মূলে তো দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা। আসল মানুষটা যে আলোর শিখা এবং দেহটা যে আমার একটা বাহন মাত্র, এই সত্য সম্পর্কে জনসাধারণ অচেতন হয়ে আছে। যে-মুহূর্তে তারা আপনাদিগকে জানবে অনন্ত শক্তির আধার ব'লে তাদের মধ্যে জাগবে সত্যের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে যে-কোন দুঃখের অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বার মহাবীর্য।

সমস্ত দুর্বলতা, ভীরুতা, ক্লীবতা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্যে বিবেকানন্দ দিগন্তপ্রসারী জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন দেশ-জোড়া মূঢ়তার তমসার বিরুদ্ধে। বেদান্তকে করেছিলেন তার হাতিয়ার। বেদান্ত মানুষের সম্মুখে তার সত্যপরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছে। আসল মানুষটি অনন্ত শক্তির আধার আত্মা—এই পরম ঘোষণা বেদান্তের কণ্ঠে!

কিন্তু বেদান্তের আত্মতত্ত্ব তো গুহায় নিহিত রয়েছে! উপনিষদ্ তো সন্ন্যাসীদের মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে আছে। বনের বেদান্তের বাণীকে যদি সর্বসাধারণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়, আত্মা যদি আপামর-জনসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগবে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জাগরণের ফলে তারা একটা মহৎ আদর্শের জন্যে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হবে না। বিবেকানন্দ তাই বললেন, আত্মবিশ্বাসে ভারতবর্ষকে বলীয়ান করবার জন্যে বেদান্তকে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নামিয়ে আনো হিমালয়ের অরণ্যের ছায়া থেকে। "It must come down to the daily, everyday life of the people; it shall be worked out in the palace of kings, in the cave of the recluse, it shall be worked out in the *cottage* of the *poor*, by the beggar in the street, every where any where it can be worked out." উপনিষদের আত্মতত্ত্ব নিয়ে কুটীর থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র আলোচনা চলেছে, অদ্বৈততত্ত্বের বহুল প্রচারের ফলে আত্মকেন্দ্রিকতার মৃত্যু-জাল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসছে এবং সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুঞ্জয় এক একটি পুরুষ-সিংহ হয়ে উঠেছে—এ মহান স্বপ্ন বিবেকানন্দের সমস্ত অন্তরকে জুড়ে ছিল। বিবেকানন্দ যাঁকে মার্কিন সন্ন্যাসী বলতেন সেই কবি ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানেরও বর্ণনায় সেরা সহরের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, where speculations on the soul are encouraged.

রবীন্দ্রনাথ জাতিকে পান করিয়েছেন উপনিষদেরই এই সঞ্জীবনী রস তাকে

সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত করবার জন্যে। নৈবেদ্যের কবিতাগুলি মূলতঃ উপনিষদের প্রেরণায় রচিত এবং তাদের অনেকগুলিতে মাভৈঃ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। একটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করলাম যার মধ্যে উপনিষদে বিঘোষিত বীর্যের আদর্শের জয়ধ্বনি।

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে।

আর গান্ধীজী তো পরিষ্কার করেই বলেছেনঃ "power resides in the people এবং আমি গত একুশ বৎসর ধ'রে চেষ্টা করে আসছি এই সহজ সত্যটুকু জনসাধারণকে বুঝাবার জন্যে যে তারাই শক্তির আধার, পার্লামেন্ট নয়। গান্ধীজীর আহ্বানে যখন জনসাধারণ Civil Disobedience আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরম দুঃখকে বরণ করে নিলো এবং হাজার হাজার মানুষের সেই দুঃখ-বরণের ফলে বৃটিশ-শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তখন আত্মা সত্য—এই তত্ত্বই কি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো না? বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন, আত্মার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাসী ভারতের জনসাধারণ আপনাদিগকে দুর্বল ও অধম মনে করার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে বাধার পর বাধাকে জয় করতে করতে সাফল্য থেকে সাফল্যের শিখরে চলেছে। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের হাতে বিশ্ববিজয়ের পতাকা। আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি কলকাতায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে আছেঃ India must conquer the world, and nothing less than that is my ideal.

কিন্তু একমাত্র স্বাধীন বলিষ্ঠ ভারতবর্ষের কথাই পৃথিবী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে। আর আত্মার শক্তির অদ্ভুত প্রকাশই তো শ্রীরামকৃষ্ণের শুচি-শুভ্র জীবনে। তাঁর জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, it is the most marvellous manifestation of soul-power that you can read of, much less to expect. বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে উপনিষদের আত্মার শক্তিরই জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই ধ্বনিই শুনতে পাই। গান্ধীজীর অহিংস গণবিপ্লবের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো, সকলের মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান এবং আত্মার অদ্ভুত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতি সাধারণ মানুষও দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

কিন্তু অপূর্ণ থেকে যাবে এই আলোচনা যদি স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক উদ্বোধিত নব্য ভারতের শক্তিসাধনা প্রসঙ্গে এই সঙ্গে স্মরণ না করি স্বদেশের সেই প্রাতঃস্মরণীয় রণগুরু, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয় মূর্তি সুভাষচন্দ্রকে যিনি শক্তির জয়ধ্বনি করলেন, নতুন ভারতের মর্মে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহাভারতের কৃষ্ণকে যাঁর কণ্ঠে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(১) শব্দ

প্রকৃতির যে বিশেষ ঘটনা আমাদের কানে অনুভূতি আনে তাই শব্দ। একটু বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায় যে শব্দের সঙ্গে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে জড়িত; একটি হ'ল শব্দের উৎস, দ্বিতীয়টি হ'ল শব্দের প্রসারণ, তৃতীয়টি হ'ল আমাদের কান—যা দিয়ে শব্দকে অনুভব করা হয়। একভাবে দেখতে গেলে আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কান হ'ল সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। শত শব্দের মধ্যে কান একটি বিশেষ শব্দকে বেছে নিতে পারে। অসংখ্য যন্ত্রের ঝনঝনার মধ্যে প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্বর আমাদের কানে আলাদাভাবে ধরা পড়ে। শব্দের উৎসের বৈশিষ্ট্য এবং দূরত্ব সম্পর্কে ধারণাও কান সহজেই আমাদের এনে দেয়। শব্দের এই গুণগুলি আমাদের কাছে এমনিতে সহজ ও সাধারণ বলেই মনে হয়, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের অশেষ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও শব্দকে ধরার জন্য কানের মত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যন্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কানের এই গুণাগুণ বুঝতে হ'লে আমাদের শরীরতত্ত্ব এবং বিভিন্ন অনুভূতির গোড়ার কথা জানা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত তা আমাদের পুরোপুরি জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শব্দের উৎস এবং প্রসারণ সংক্রান্ত সব কথাই জানা গেছে।

দেখা গেছে শব্দ উৎস থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সবসময়ে একটি মাধ্যম ব্যবহার করে। সাধারণ অবস্থায় বায়ুই এই মাধ্যমের কাজ করে। খুব সহজ একটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, যদি শব্দের উৎস ও গ্রাহকের মধ্যবর্তী জায়গায় কোন বস্তু না থাকে তাহলে শব্দ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। একটি কাঁচের জারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা রেখে যদি বাজানো যায় তাহলে জারের বাইরে ঘণ্টাটির শব্দ শোনা যায়; কিন্তু জারটিকে পাম্প ব্যবহার করে বায়ুশূন্য করা হ'লে আর বাইরে শব্দ শোনা যায় না। কাজেই ঘণ্টাটি যে শব্দ তৈরী করে তা জারের বায়ুকে আশ্রয় করেই দূরবর্তী জায়গায় পৌঁছায়। পদার্থ যে কোন অবস্থায়ই শব্দকে প্রসারিত করতে পারে। বায়বীয়, তরল বা কঠিন যে কোন পদার্থই শব্দের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে শব্দকে প্রসারিত করার কাজে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষমতায় তারতম্য আছে। কঠিন পদার্থই শব্দকে খুব সহজে প্রসারিত করতে পারে। তরল পদার্থে প্রসারণের সময় শব্দের জোর খুব কমে যায়। আর বায়বীয় পদার্থে প্রসারণের ক্ষমতা নির্ভর করে তার ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও চাপের উপরে।

শব্দ উৎস থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে কিছু সময় নেয়। বিদ্যুৎ চমকাবার সময়ে এটা খুব সহজেই ধরা পড়ে। বিদ্যুৎ চমকালে আলো ও শব্দ একই সময়ে তৈরী হয় কিন্তু আমরা আলো দেখবার অনেক পরে শব্দ শুনতে পাই। কত সময়ের পরে শব্দ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাবে তা শব্দের উৎসের দূরত্ব ও মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে। শব্দ কোন একটি বিশেষ গতি নিয়ে প্রসারিত হয়; এই গতিবেগ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের এবং তা নির্ভর করে মাধ্যমের তাপমাত্রা, চাপ এবং আরোও কয়েকটি গুণের উপরে। এথেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, যখন শব্দসৃষ্টি হয় তখন শব্দের উৎস মাধ্যমে

কোন বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তন নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কানে বায়ুর এই পরিবর্তিত অবস্থাই শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয় তা নিয়ে অনুসন্ধান করলে মাধ্যমে শব্দ-প্রসারণের সময়ে যে পরিবর্তন হয় তা বোঝা যেতে পারে। আমরা কথা বললে, কোন বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করলে, কোন ধাতব পদার্থকে হঠাৎ মাটিতে ফেললে, হাততালি দিলে, জোরে বায়ু বইলে, দুটি জিনিসে ঘর্ষণ করলে—এমনি অসংখ্য রকমের ঘটনায় শব্দ উৎপন্ন হয়। এই অসংখ্য ঘটনাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখন শব্দের উৎসটি কাঁপতে থাকে তখনই শব্দ সৃষ্ট হয়। এটা সকলেরই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, যখন ধাতব পাত্রে হঠাৎ আঘাত লেগে শব্দ সৃষ্ট হয় তখন পাত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে রাখলে শব্দ বন্ধ হ'য়ে যায়। তারের বাদ্যযন্ত্রে যখন শব্দ তৈরী হয় তখন তারটির কম্পন তো চোখেই ধরা পড়ে বা তারটিতে হাত দিয়েও অনুভব করা যায়। কোন জিনিস যদি খুব তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকে তাহলেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ধরনের শব্দের যে অনুভূতি আমাদের হয়, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেগুলি শব্দের উৎসের কম্পনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। এই বিশেষত্বকে তিনটি গুণ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। একটি কম্পনের অঙ্ক, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে উৎসটি কতবার কাঁপে। দ্বিতীয়টি হ'ল কম্পনের বিস্তার, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা থেকে উৎসটি কাঁপনের সময়ে দুদিকে কতটা এগিয়ে যায়—তৃতীয়টি হ'ল কম্পনরূপ বা ঠিক কি ভাবে কাঁপছে। কম্পনাঙ্কের তারতম্য আমাদের মোটা বা সরু গলার অনুভূতি আনে। যদি কোন শব্দের কম্পনাঙ্ক খুব বেশী হয় তাহলে সেই শব্দ আমাদের কাছে সরু বলে মনে হয়, আবার কম্পনাঙ্ক যদি কম হয় তাহলে মোটা বলে মনে হয়। কম্পনের বিস্তারের উপরে নির্ভর করে শব্দটি জোরালো কি আস্তে হচ্ছে সেই অনুভূতি। বিস্তার যদি বেশী হয় তাহলে শব্দটি জোরালো মনে হয় এবং যদি কম হয় তাহলে মনে হয় শব্দটি আস্তে হচ্ছে। কম্পনরূপের উপর নির্ভর করে কোন শব্দের নিজস্বতা। একই কম্পনাঙ্কের এবং একই বিস্তারের যদি দুটি শব্দের কম্পনরূপ আলাদা হয় তাহলে শব্দ দুটি বিভিন্ন বলে মনে হয়। এই কারণেই বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের একই রকম জোরাল একই সুর আলাদা বলে মনে হয়। যখন "সা" সেতারে এবং বেহালায় বাজানো হয় তখন কম্পনাঙ্ক একই থাকে কিন্তু সেতারের সা ঠিক বেহালার সা-র মত শোনায় না।

শব্দের উৎসের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উৎসের বিভিন্ন ধরনের কম্পন থেকেই শব্দের বিচিত্রতা আসে। আমরা যখন শব্দ শুনি তখন বায়ুই এই কম্পন আমাদের কানে পৌঁছে দেয়। উৎসটিকে ঘিরে থাকে বায়ু এবং কম্পনের সময়ে বায়ুর অণুগুলিতে ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কার ফলে বায়ুর অণুগুলিও কাঁপতে আরম্ভ করে এবং বায়ুর ঘনত্ব পরিবর্তিত হয়। ঘনত্বের পরিবর্তন বায়ুতে তরঙ্গের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেমন কোন পুকুরে ঢিল ছুড়লে পুকুরের জলের সব অণুগুলি ওঠা-নামা আরম্ভ করে এবং তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। জলের তরঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জল যেন তরঙ্গের কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, আসলে এটা আমাদের দৃষ্টিভ্রম। জল ছড়িয়ে পড়ে না, শুধুমাত্র অণুগুলির ওঠানামাই ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ছোটবেলার ঢিল ছুড়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে ভাসান নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকেই এই উক্তির

সত্যতা বোঝা যায়। জলের তরঙ্গের মতই শব্দের উৎস যখন বায়ুতে শব্দতরঙ্গ তৈরী করে তখন বায়ুর অণুগুলিতে উৎস থেকে কাঁপন সঞ্চারিত হয় এবং অণু থেকে অণুতে এই কাঁপন ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কানে অণুগুলির কাঁপনের ধাক্কাই শব্দানুভূতির সৃষ্টি করে।

দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর কম্পমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিই হ'ল শব্দ। যদি কোন বস্তু গতিশীল হয় তাহলে বস্তুটির গতিজনিত শক্তি থাকে। অন্যান্য সব শক্তির মতই এই গতিজনিত শক্তি থেকে আমরা কাজ পেতে পারি। বায়ুচালিত যন্ত্রে গতিশীল বায়ু ব্যবহার করে যন্ত্র চালানো হয়। যন্ত্রের চাকা বায়ুর ধাক্কায় ঘুরতে আরম্ভ করে এবং এই ঘূর্ণমান চাকাটি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গতিশীল জল-ধারার শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ দুটি ক্ষেত্রে বায়ু বা জলধারার গতিবেগ সবসময়ে একই দিকে থাকে। কিন্তু গতির দিক যদি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, যেমন হয় কম্পমান জিনিসের গতিতে, তাহলেও বস্তুটির এমনি শক্তি থাকে। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে কম্পমান বস্তুর শক্তি প্রমাণ করা যায় না—কিন্তু যদি ভাবা যায় যে কোন বস্তুকে কম্পমান করতে হ'লে শক্তি ব্যয় করতে হয় এবং মনে রাখা যায় যে শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুব, তাহলেই বোঝা যায় কম্পমান অবস্থায় বস্তুটিতে শক্তি থাকবে। অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় যে বস্তুর গতিজনিত শক্তি গতিবেগের বর্গের সমানুপাতিক। কাজেই গতিবেগের দিক পরিবর্তন করলে শক্তি একই থাকে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কম্পমান বস্তুর শক্তি সাধারণভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে কেননা কম্পমান বস্তুর গতিবেগের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় কিন্তু কম্পমান বস্তুর গড়ে একটি শক্তি থাকবে। একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'র‍্যালে ডিস্ক', ব্যবহার করে অধ্যাপক র‍্যালে কম্পমান বস্তুর শক্তিও অন্যান্য শক্তির মতই বিশেষভাবে প্রমাণ করেন। র‍্যালে ডিস্কের উপরে যখন শব্দ করা হয় তখন ডিস্কটি ঘুরতে থাকে যেমন বায়ুচালিত যন্ত্রের চাকা হাওয়ায় ঘোরে। বর্তমানে আরো অনেক নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলিতে কম্পমান বস্তু বা বায়ুতে শব্দের শক্তিকে সোজাসুজি বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিশব্দ (Ultrasonic) ব্যবহারকারী যন্ত্রগুলি। যদিও বায়ুতে কম্পন হ'লেই শব্দ উৎপন্ন হয় কিন্তু আমাদের কানের ক্ষমতা সীমিত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র কম্পনাঙ্ক প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ১৫ ০০০ হাজারের মধ্যে হ'লেই আমাদের শব্দের অনুভূতি আসে। কম্পনাঙ্ক এর কম বা বেশী হ'লে আমরা সে কম্পনকে অনুভব করতে পারি না। যদি বায়ুর কম্পন এমনি হয় যে কম্পনাঙ্ক পনের হাজারের বেশী তাহলে এই কম্পনকে অতিশব্দ বলা হয় কেননা এই কম্পন আমাদের শুনতে পাওয়া শব্দের মতই, কিন্তু কম্পনাঙ্ক সে শব্দের চেয়ে বেশী। এমনি অতিশব্দ ব্যবহার করে আজকাল কাচ বা অন্যান্য ভঙ্গুর জিনিস কাটা হচ্ছে ঠিক যেমন বিভিন্ন ধাতুর জিনিস ধারালো যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শব্দ হ'ল শক্তির এক ধরনের প্রকাশ। এই শক্তি বস্তুকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। একভাবে বলা যেতে পারে কম্পমান বস্তুর শক্তিই হ'ল শব্দ এবং এই শক্তি আমাদের কানে এসে পৌছালে আমরা শব্দকে অনুভব করি। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা ও নাসিকা সোজাসুজি বস্তুকে অনুভব করে। আর কান অনুভব করে এক ধরনের বস্তুআশ্রয়ী শক্তিকে। অপর দুটি ইন্দ্রিয় অনুভব করে বস্তুনিরপেক্ষ শক্তি আলো ও তাপকে।

রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

আনুষ্ঠানিক বার ব্রত পার্বণ সব দেশেই সব জাতেই চিরদিন আছে; পুরানো ধারাটি থাকে আবার বদল হয়। নতুন ধারা আসে, পুরোনোকে বদলায়, নতুন রূপ দেয়, তবু একটি ধারা থেকেই যায়।

সব দেশের মত রাজস্থানেও নানা ধারার নানা শাখাপ্রশাখায় মানুষের উৎসব পার্বণ ছিল। এখনো আছে যদিও রাজতন্ত্র উঠে যাবার পর মেলায় জৌলুষ উৎসব আর তেমন নেই।

এই সব মেলা পার্বণ উৎসবের কিছুটা বার ব্রত পার্বণ পর্যায়ে; কিছু শুধু ব্রত, কিছু শুধু পার্বণ উৎসব, কিছু তার শুধু পুজা পার্বণের অঙ্গ মন্দির-দেবালয়ে; আবার তার কতকগুলি মেলা পার্বণ ব্রত একেবারে সর্বভারতীয়। যেমন বছরের প্রথম থেকেই ধরি জন্মাষ্টমী। এটি একেবারে সর্বভারতীয় পূজা পার্বণ ব্রত পালন ব্যাপারের অঙ্গ। এতে মেলা সেই, উৎসবও সেই, জনসাধারণের একেবারে মন্দির-দেবালয়ের ব্রত পার্বণ অনুষ্ঠান। পূজা উপবাস হল প্রধান অঙ্গ। এমনি হল পরবর্তী একটি সমস্ত ভারতের পার্বণ উৎসব—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সভ্য নগরবাসী গ্রামীণ আদিবাসী সকলের উৎসব —এ হল দেওয়ালী।

দীপাবলী। দীপান্বিতা কার্তিকী অমাবস্যা। এটি একেবারে উৎসব পার্বণ মেলা কালীপূজা লক্ষ্মীপূজা ব্রত—সব মিশানো পার্বণ।

এই দেওয়ালীতে সাধারণ ঘরে ঘরে দীপমালা দান ছাড়াও লক্ষ্মীপূজা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গজলক্ষ্মীপূজা, পরিজনদের মিষ্টান্ন খাওয়ানো পাঠানো, বিজয়াদশমীর মত আমাদের; নতুন কাপড় দেওয়া তত্ত্ব করা আপনজনদের; বাড়ী পরিষ্কার করা, রং করা, চুনকাম করাও হল দেওয়ালীর একটা বিশেষ কাজ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর দেওয়ালীর আগের ত্রয়োদশীতে ধনতেরস্ (ধনত্রয়োদশী) বাসনপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে কেনা হয়, রাজস্থানে বম্বে-গুজরাটে বিশেষ করে কিছু না হলে একটি চামচও কেনা চাই। ধনতেরসের পরদিন হয় ভূতচতুর্দশী সেদিন হল আমাদের দেশের 'চোদ্দ প্রদীপ'-দান, 'চোদ্দ শাক'-ভক্ষণ; উত্তরপশ্চিম ভারতে হল ছোট 'দেওয়ালী'; তার পরদিন ওদেশে এদেশে মহালক্ষ্মী মহাকালী পূজার অমাবস্যা; সেদিন আমাদের হল কালীপূজা তো বটেই, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে অলক্ষ্মী-বিদায়। তারপর দিনটি হল রাজস্থানের 'দ্যূত' প্রতিপদ (জুয়া-খেলা অবাধে) এবং গোবর্ধনের মেলা উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণ মেলার উৎসব আবার সঙ্গে রাজ্যের যত গোধন বলীবর্দ আছে সকলের অর্চনা—শিং রঙিয়ে দেওয়া লাল নীল রঙে, ক্ষুর ধুইয়ে দেওয়া, খাবার দেওয়া বিশেষ করে।

এর পরবর্তী সর্বভারতীয় উৎসব ও মেলা হল হোলী। আমাদের দেশে দোলবিহার, ফাগুয়া বা হোলী পাঞ্জাবে উত্তরপ্রদেশে রাজস্থানে মাদ্রাজে, গুজরাট বম্বে মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা—প্রায় সব দেশেই হোলী বা দোল একই রকমের রঙের আনন্দের উৎসব;

আবার মন্দিরেও দেবতারও হোলী বা ফাল্গুনী পূর্ণিমার বসন্তোৎসব অভ্র-আবীরে রঙীন।

বছরের শেষ উৎসব ও পার্বণ ব্রত—এও সারা ভারতের ব্রত ও পার্বণ; মেলা ঠিক নয়—এ হল শ্রীশ্রীরামনবমী।

এইবার পাঁচটি বড় পার্বণ ও উৎসব আমাদের হিন্দু সকলেরই প্রায় এক এবং একই রকমের। পূজা পাঠ, ব্রত উপবাস, খাওয়ানো, তত্ত্ব করা, তত্ত্ব পাঠানো, আর হোলীতে উন্মত্ত রং খেলা এসব সব প্রদেশেই সকলে করেন। মেয়েরা করেন স্নান দান উপবাস ব্রতপালন, পূজা-অর্চনা। পুরুষরাও ব্রত করেন, কম অবশ্য। আর সকলে করে উৎসবের হৈ হৈ আনন্দ প্রমোদ, যেমন হোলীর দিন, দেওয়ালীর দিন। মোটামুটি শাস্ত্র-আচার মেনে বা না মেনে এই কয়েকটি পূজাপার্বণে আমরা সমস্ত ভারতবাসী একেবারে এক জাতি ও এক ভাবময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চার বর্ণেরই উৎসব এক। মনে হয় 'চার আশ্রমী' বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধরাও এ উৎসবে মিশে যান, নিতান্ত সন্ন্যাসী দণ্ডী না হলে।

এখন বলি রাজস্থানের ছোটখাটো এবং বড় বড় উৎসব-পার্বণের কিছু কথা, যা সেকালে—মানে ৬০।৭০ বছর আগের কালে ছিল, এখনো কিছু আছে, কিন্তু প্রায় নেই; রাজা-মহারাজের রাজত্ব উচ্ছেদের পর থেকে প্রায় উঠে গেছে।

'কাল'কে এই একপুরুষের নিমেষের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। 'কাল' 'মহাকালে'র গতিপথ কারুর জানা নেই। তবু যেন কোন খানে মানুষের মনে 'পুরোনো'র উপর হারানোর উপর একটু মোহময় মমতা থেকে যায়। তাই থেকে জন্ম নেয় ইতিহাস ও সেকালের কথা এবং পুরোনো কথা। হস্তিনাপুর বা দিল্লীর পুরোনো ধ্বংসাবশেষ, কোণারকের মন্দির-দেউল, কিংবা অজন্তা-ইলোরার মূর্তি-চিত্রাবলীর মত এই সব প্রথায় ও ঐতিহ্যে এক মোহ ও মহিমময় রূপ আছে।

রাজস্থানের সব প্রদেশের মধ্যে জয়পুর ও উদয়পুর বা মেবার দেশের উৎসবগুলোই বেশী প্রচলিত। যোধপুর মাড়োয়ার জশলমীর বিকানীর এগুলি প্রসিদ্ধ জায়গা হলেও সেসব জায়গায়ও বড় উৎসবে প্রায় ভেদ নেই, ছোটোখাটো আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধ থাকলেও।

জয়পুরে বছরের প্রথম উৎসব-মেলা হল বৈশাখ মাসে নৃসিংহ-চতুর্দশীতে 'নরসিংহের মেলা'।

নৃসিংহ মেলাটাই হল হিরণ্যকশিপুবধ নৃসিংহ অবতারের। প্রতি মেলারই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে; সওয়ারী বেরুলো মানে শোভাযাত্রা করে রাজকীয় চতুরঙ্গবাহিনী হাতী ঘোড়া (উট) রথ পদাতিক সৈন্য সমারোহে সাজিয়ে (কখনো কুচকাওয়াজ করতে করতে) বেরুলো। বিশেষ বিশেষ মেলায় তার বিশেষ অঙ্গ হল কোনোটিতে দেবীদর্শন, রাজদর্শন ও যুদ্ধযাত্রায় অভিনয় নানারকম।

নৃসিংহ মেলায় কিন্তু ঐ শোভাযাত্রাটা হত না। এটি যেন একটা 'যাত্রা'র মত। সহরের মাঝখানে এক চওড়া পথের ওপর একপাশে একটি প্রকাণ্ড বাঁধানো জায়গায় একটি মঞ্চ করে আসর হত। সাদা চাদর পাতা বিরাট আসর। তার একপাশে একটি কাগজের তৈরী মোটা মোটা স্তম্ভ বা থাম। তার কাছাকাছি ঝকমকে একটি চেয়ার পাতা। সেটি হল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনের প্রতীক আসন। সেই সিংহাসনে রাজপুত রাজাদের মত চৌগোপ্পা গালপাট্টা বাঁধা

জরীদার জাঁকজমকালো পোষাক ও গহনা পরা মাথায় পাগড়ী মুকুট শোভিত মহারাজা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু সমাসীন থাকতেন।

তাঁর পাশে প্রহ্লাদরূপী একটি ক্ষুদ্র রোগা টিঙ্‌টিঙে বালক দাঁড়িয়ে। তার কাছাকাছি তার গুরুমশাইরা—প্রসিদ্ধ ষণ্ড ও অমর্ক বসে। কিছু সেপাইসান্ত্রী ও চোপদার 'নকীব' রাজসভায় উপযোগী ভাবে দাঁড়াত।

আর রাস্তার এদিকে ওদিকে সর্বত্র আলো ফুল বাঁশী পুতুল খেলনার বাজার রঙে উজ্জ্বল ঝলমল, শব্দে মুখর হয়ে থাকত।

চারদিকের বাড়ীর ছাত প্রাঙ্গণ পথের ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য এবং সে-দেশীয় প্রথায় মেয়েদের মাঙ্গলিক গানে মুখর।

সেই মঞ্চ ও মণ্ডপ দর্শকে ভরা। তার মাঝে আমরা, বহু ছোট বড বালকবালিকা সমবেত হতাম।

সভাটি জমজমাট দর্শক ও অভিনেতাদের নিয়ে। আর চতুর্দিকের ছাতে সিঁড়িপথে রকে বাজারে তিলধারণের জায়গা নেই বল্লেই ঠিক হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকও এসে সহরের মেলায় জড় হয়েছে। ঘাগরা লুগড়ী (ওড়না) ভারি ভারি গহনা পরা ঘোর ফিকে লাল সবুজ নীল রঙের বসনে সজ্জিত মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে তারস্বরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীত গানে মেলা মুখর করে রাখত।

হেনকালে সন্ধ্যার ঘোর ঘোর সময়ে নকীবের ভেঁপু বা বাঁশী বেজে উঠত ভোঁ ভোঁ করে—যাত্রা বা মেলার আরম্ভ হওয়ার নির্দেশ। আর হিরণ্যকশিপুর ক্ষুদ্র নকল রাজসভাটি তৎপর হয়ে উঠত।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানা প্রশ্নোত্তরের পর ক্রন্দনরত ভীত বালক প্রহ্লাদকে স-গর্জনে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোথায় তোর হরি? কোথায় সেই কৃষ্ণ? দেখাতে পারিস? কোথায় থাকে সে?' (তাঁর ভাইয়ের বধকারী শত্রু!)

প্রহ্লাদ জবাব দিচ্ছেন, 'তিনি সর্বত্র আছেন।' যদিও গলার স্বর শোনা যায় না—বালক অভিনেতার। কিন্তু প্রতি বছর দেখা এবং আবাল্য শোনা গল্প ছোট বড় কারুর বুঝতে বাধা হয় না।

হিরণ্যকশিপু আবার গর্জন করেন, 'এখানে আছে সে? এই থামের মধ্যে?'

প্রহ্লাদ বলেন, 'আছেন।'

এবারে নাটকীয় ভাবে হিরণ্যকশিপু তার তরোয়াল কোশমুক্ত করে থামের ওপর আঘাত করলেন।

কাগজের থাম ছিঁড়ে পড়ল।

আর দর্শক-এর শিশুসংঘ সভয়ে আচম্বিতে দেখল থামের ভিতর থেকে সোনালী ও রূপালী কেশরওয়ালা একটি সিংহ গর্জন করতে করতে বেরিয়ে দুই বাহু আস্ফালন করতে করতে হুঙ্কার দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে ধরে নিয়ে কোলের ওপর ফেলে তাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল তাঁরই সিংহাসনে বসে। যদিও এদিকে সিংহের কেশরের জামার নিচের দিকটাতে চুড়ীদার পাজামা-পরা দুটি মানুষের পা দেখা যাচ্ছিল। তবু একে সন্ধ্যা, তাতে সিংহের ভয়াবহ গর্জন ও আকার হুঙ্কার দেখে শুনে সমবেত আমরা ছোটরা তখন ত্রস্ত। তারপর সুরু হত প্রহ্লাদের স্তব-স্তুতি। এবং জনতার জয় জয় রব হৈ হৈতে মেলাভঙ্গ।

এই হল বছরের প্রথম মেলা। এতে 'লওয়াজমা' 'সওয়ারী' (শোভাযাত্রা) রাজদর্শন ব্যাপারটা থাকত না। মেলার পথ তখন অন্ধকার, বিদ্যুৎহীন সেকালে। মিটমিটে আলোয় লোকে পুতুল, খাবার ও অন্যজিনিস কিনছে। পথে অবশ্য গ্যাসের আলো জ্বলত।

বৈশাখ মাসে এর পরে মেলার উৎসব না থাকলেও দেবালয়ে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী মদনমোহনের ছোট বড় সব দেবালয়ে সারামাসব্যাপী উৎসব ফুল-সাজের।

গোবিন্দজীর 'ফুল বাংলা', অর্থাৎ 'পুষ্পগৃহ' বা 'কুঞ্জালয়' রচনা, সারাটি মন্দির ফুলেফুলে সাজানো সেদিন। ফুলশিঙার হল (ফুলশৃঙ্গার) শুধু বিগ্রহকে ফুলসাজে সাজানো। বেদীবেদী থেকে দেওয়ালের গা, সিংহাসনের সমস্ত অপূর্ব সুন্দর ফুলের কারুকাজ করা হয়, প্রায় সাদা ফুলে ডাকের চকচকে রঙীন কাগজ দিয়ে লাল নীল সবুজ সাদার ফুলকাজ। কখনো কখনো কোনো শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠ শেঠ ধনীরাও এই 'ফুলশিঙার' ফুল বাংলা উৎসব করেন দেবতার। মন্দিরকর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে সাধারণতঃ একদিনই হয়। মহারাজার তরফ থেকেও একদিন হয়। সেদিন সমস্ত মন্দিরের বাইরেও ফুলসাজ হত। একবার কোন শেঠ শুধু গোলাপফুলের 'শৃঙ্গার-বেশ' দেন দেবতার; সে এক অপূর্ব শোভা দেখেছিলাম। কবে বাল্যকালে, তবু মনে আঁকা আছে।

বৈশাখমাস ভোর দেবতাদের 'ঝারা' 'শীতল' বৈশাখী উৎসবও থাকে। তার সঙ্গে আর একটি উৎসব থাকে অক্ষয় তৃতীয়ায়। রাজস্থানে বলে 'আখাতীজ'। অক্ষয় দান পুণ্যের ব্রত নিয়ম এটি; জলদান, ব্রাহ্মণদের অন্নদান, ধনদান—নানাব্রতময় এটি। এইদিনে রাজকীয় কোষাগারের কিছু 'মোহর'কে রূপান্তরিত করা হত আরো চাপ দিয়ে চেপ্টে পাতলা করে। সেই মোহর দিয়ে সেদিন রাজারানীদের 'নজর' করার প্রথাও ছিল। ঐ তিথিতে বিশেষ একটি পুণ্যতিথির দরবার বসত।

এরপর জ্যৈষ্ঠ মাস। এ মাসে মেলা নেই, পার্বণ উৎসব কিন্তু মন্দিরে দেবালয়ে আছে—'জলযাত্রা'। অর্থাৎ স্নানযাত্রারই মত দেবতার স্নানাঙ্গ উৎসব। কিন্তু এদেশে বা জগন্নাথধামে ও অন্যত্র স্নানযাত্রা একদিন মাত্র হয়, আর অন্য রকমের অঙ্গরাগময় স্নানের উৎসব।

এ হয় বৈশাখ সংক্রান্তি থেকে একাদশী, দুটি পূর্ণিমা নিয়ে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি অবধি। একটু অন্য ধরনের এ স্নান—শীতল উৎসব। গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন সকলেরই মন্দিরের মাঝখানে ছোট ছোট ফোয়ারার মুখ আছে। মেঝের নীচে জলাধার, সেই আটদশটি ফোয়ারার মুখ খুলে দেওয়া হয়। বেলা বারোটা-একটা থেকে তিন-চারটে অবধি সেই ফোয়ারার জলে বিগ্রহ সিক্ত ও শীতল হন। সামনের দর্শকদের সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, সামনের প্রাঙ্গণ জলে থৈ থৈ করে। পুরোহিত-পূজারীরাও সিক্ত হস্তে মালা চন্দন তুলসী বিতরণ করেন। তারপর ফোয়ারার মুখ বন্ধ করে দেবতার সিক্তবাস বদলে আরতি—গোধূলি-আরতি হয়। প্রায় সারাদিনের 'জলযাত্রা' ঐ পাঁচ দিন হয়। কখনো রাজকীয় বিশেষ বিশেষ দিনে আবার বাইরের প্রাঙ্গণের বাগানের ফোয়ারাগুলিও খোলা হয়। উত্তর-ভারতের দুর্ধর্ষ গরমের দিন। মানুষ জীবজন্তু ময়ূর পায়রা পাখীদেরও যেন জলে ভেজায় আনন্দের পর্ব পার্বণ হয় সেদিন। দেবতার ফোয়ারায় জলে ভিতরে ভিজে বসে থাকে। বাইরেও তেমনি লোক জড় হয়।

আষাঢ় মাসের রথযাত্রা উৎসব কিন্তু গোবিন্দজীর দেশে নেই। গোবিন্দজী গোপীনাথজী বাংলাদেশে জগন্নাথের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তাই রথযাত্রা এদিকে বাংলার সর্বত্র আছে। যদিও মন্দিরের গোবিন্দজী মন্দিরেই থাকেন নানানামে, কিন্তু জগন্নাথরূপে মূর্তিতে

তাঁকে রথযাত্রা করতেই হয় এদেশে। এই রথযাত্রাটি কিন্তু মনে হয় দক্ষিণের ও উৎকলের থেকে নেওয়া।

শ্রাবণে এসে পড়ে ঝুলন উৎসব। কোনো মন্দিরে পাঁচ দিন, কোথাও দশ দিন, কোথাও পনের দিন ধরে শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর ঝুলন উৎসব। দোলনা করে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহের দোলায় ঝুলনের উৎসব হয়। অবশ্য বিশ্বম্ভর-তনু 'বিগ্রহ' সিংহাসনপীঠেই সমাসীন থাকেন শ্রীরাধা-সহ। চারদিকের বেদীটি একটি রূপার ঝুলন আকারের ঘেরা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। উপরে থাকে দোলনার ডাণ্ডীটি। চার দিকে চারটি রূপার দণ্ড। সেইটিই নেড়ে দেন পুরোহিত-পূজারীরা—ঠিক মনে হয় বিগ্রহ ঝুলনে বসে দুলছেন। নড়ে শুধু বেষ্টনীটি।

এ তো গেল মন্দিরের উৎসবপ্রথা। দেশে কিন্তু শ্রাবণ-ভাদ্র সারামাস ঘরে ঘরে বনে বাগানে ছাতে দোলনা টাঙানো—আর তাতে দোলার ধুম পড়ে যায়। গাছে গাছে পথের ধারে দোলনা টাঙানো—'পাটকড়ি' নিয়ে আবাল-বৃদ্ধবনিতার দল জমে। বুড়া-বুড়ীদেরও দোলায় শখ কম নয় সেদেশে। যত গান চলে—ঝুলনসঙ্গীত, কাজরীসঙ্গীত, মেঘের আহ্বান, তত সারাদিন 'দোলা' চলে। 'দোলনা' আর খালি থাকে না। যেখানে শক্ত গাছে ডাল সেখানেই ঝুলা।

এ ছাড়া এই শ্রাবণী ঝুলন পূর্ণিমার আর একটি নাম আছে রাখী পূর্ণিমা।

এই রাখী পূর্ণিমারও খুব মহৎ ও গভীর একটি ঐতিহ্য আছে। সমস্ত রাজস্থানে 'রাখী' যেন একটি বন্ধুত্বের প্রীতির শরণাগতির নির্ভরতার প্রতীকোৎসব-পূর্ণিমা, রাজোয়াড়ার সমস্ত শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে। এই রাখীবন্ধন পূর্ণিমার একটি নিজস্ব মহিমময় গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতময় ভাব আছে। রক্ষাবন্ধন থেকে 'রাখী'বন্ধন কথাটি হয়েছে। রাজস্থানে গল্প আছে দুর্বাসা মুনির সময়ে এর প্রচলন হয়। তাতে জাতিধর্ম নরনারী নির্বিশেষে বন্ধুত্বের বন্ধন, ধর্মবন্ধন, কল্যাণ-বন্ধন, শরণাগতির বন্ধনের সুগভীর সুবিস্তৃত নিষ্ঠাময় আশ্চর্য পবিত্র মহিমময় ক্ষেত্র থাকে। অজানা অন্তঃপুরিকা অচেনা নরনারী একনিমেষে একটি সুতোর রাঙা রাখী পাঠিয়ে চিরকালের ভাইবোনের সম্পর্কের বন্ধন গ্রহণ ও বরণ করে নিতে পারেন। হয়ত চিরকালই দেখা চেনা পরিচয় হল না। ঐ পাতানো ভাইবোন সম্পর্কের দুটি মানুষে কিন্তু একটি সুগভীর স্নেহ, শ্রদ্ধাময় সম্পর্ক ও বিশ্বস্ত প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

এ রাখীবন্ধন বহুকালের প্রথা। একই ভাবে আছে, কিন্তু এ বন্ধন যে কত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বন্ধন, সব সম্প্রদায় ধর্ম জাতি নির্বিশেষে, তারও ইতিহাস ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

চিতোরের মহারানা সঙ্গ—সংগ্রামসিংহের বিধবা মহারানী রাজমাতা কর্ণাবতী (করুণাবতী) এক সময়ে মাণ্ডু আর গুর্জর প্রদেশের সুলতান বাহাদুর দ্বারা চিতোর আক্রান্ত হলে হুমায়ন বাদশাকে মণিমুক্তাখচিত একটি রাখী পাঠান – 'রাখী-ভাই'রূপে বরণ করে। হুমায়ুন তখন বাঙলাদেশে বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।

এই রাজপুত রাখীবন্ধনের এমনি মহিমান্বিত খ্যাতি ও প্রভাব ছিল, মুসলমান সম্রাটের কাছেও, যে তিনি তখনি বাংলার দিক থেকে ফিরে এলেন ; আর অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করে বললেন ব্রাহ্মণ দূত ও অন্য সাঙ্গোপাঙ্গোদের, 'এই রাজপুত-ভগিনীর রক্ষার জন্য আমার সব ঐশ্বর্য রথম্ভর দুর্গ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি।'

ফিরে তিনি এলেনও বটে, গুর্জর সুলতান বাহাদুরশাকে পরাজিতও করলেন; কিন্তু মহারানী রাজমাতা কর্ণাবতী তখন আর বেঁচে ছিলেন না। তেরো হাজার অন্তঃপুরবাসিনী পরিজন সপত্নী সখী সহচারিণীদের নিয়ে 'জহরব্রত' করে অগ্নি প্রবেশ করেছিলেন। বিজয়ী শত্রুর কবলে পড়ে লাঞ্ছনা অপমান মর্যাদাহানির আতঙ্কে সেকালের রাজপুত ঘরানার প্রথামত মৃত্যুই কাম্য মনে করেছিলেন।

সম্রাট হুমায়ুন না-দেখা 'শরণাগত রাখী-ভগিনী' রানা-মহিষীর সপরিজনে জহরব্রত পালনে মৃত্যুবরণে খুবই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। কিন্তু রানা সঙ্গের পুত্র মহারানা বিক্রমজিৎকে রাজ্য উদ্ধারে পূর্ণ সহায়তা করেন এবং রাজ্য-উদ্ধারও হয়। আর গুর্জর সুলতান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

'রাখী'বন্ধনের রাখীসম্পর্কের মহিমার এ একটি আশ্চর্য দিক। পুরুষের পৌরুষকে বাড়ায়, চরিত্রের দৃঢ়তা বাড়ায়, ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে, নরনারী নির্বিশেষে। অনেক সময়ে বিপন্ন নারী অথবা কোনো বিবাহে স্বয়ম্বরা হতে ইচ্ছুক মেয়েও এই 'রাখী' পাঠাতেন প্রিয়জনের উদ্দেশে ব্রাহ্মণের হাতে।

আবার এ বন্ধুত্বের নিদর্শন ও প্রীতি যেমন সমান সমান ও অসমান সম্পর্কে, বর্ণবিভেদেও, তেমনি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদেরও বিশেষ চিহ্ন এটি।

এই রাখীবন্ধনকে এখনো আমাদের ৺বিজয়ার প্রণাম আশীর্বাদ আলিঙ্গনের মত একটি জাতীয় উৎসবের আনন্দময় সম্পর্ক বলে ধরা হয়।

রাখীর গল্প অনেক আছে ছোট বড় সব ঘরেই।

তার মাঝে বলবার মত গল্প—"রাজস্থান"-লেখক তখনকার 'এজেণ্ট'-প্রধান রাজপুতানার 'রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'লেখক শ্রদ্ধেয় টড্ সাহেবের লেখায় পাই।

টড্ বলেন, অনেক রাজপুত মহিলার সঙ্গে তাঁর'রাখী ভাই' সম্পর্ক হয়েছিল। রাজপুত প্রথামত তিনি সেই ভগিনীদের মণিমুক্তা-গাঁথা রাখীগুলি আনন্দিত হয়ে গ্রহণও করতেন। আর ওদেশের প্রথামত তিনটি কিংবা পাচটি 'মোহর' বোনদের উপহার পাঠাতেন। রানা ভীমসিংহের এক বোন তাঁর 'রাখী'বোন ছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন প্রতি বছরই তিনি রাখীপূর্ণিমাতে সাহেবকে রাখী পাঠাতেন। এমন তিনচারটি বহুমূল্য রাখী সাহেবের কাছে ছিল। সেগুলি বিলাতে নিয়ে যান। আপনার জন করে নেওয়া সম্ভ্রমে অভিভূত হয়ে এই সম্পর্ক পাতানোর সম্মান ও ঐতিহ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

টড্ বলেন, এই বোনদের চোখে দেখার সুযোগ তাঁর জীবনে হয়নি (হুমায়ুন কর্ণাবতীর মতই), যদিও কখনো কখনো ঐ ভগিনীরা আলাপ আলোচনা করতে বেরুতে, সাক্ষাৎ করতেও চেয়েছেন।

কিন্তু টড্ রাজস্থানের নিয়ম-প্রথাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। নিয়ম অতিক্রম করাটা ঠিক মনে করতেন না। তাই চিরদিনই না-চেনা না-দেখা ভাইবোনের সম্পর্কের মাধুর্যটুকুই বিদেশী-রচিত ইতিহাসেও লেখা রইল। আরেক জায়গায় বলেন, বুঁদীর রানী তখন নাবালক রাজার জননী; বুঁদীরাজ মৃত্যুকালে সন্তান আর রাজ্যের ভার টড্‌কে দিয়ে যান। এই রাজমাতাও কুলপুরোহিতের হাতে তাঁকে 'রাখী' পাঠান; সেই অবধি তাঁদের মধ্যে রাজকার্যে অন্য পরামর্শে পর্দার আড়াল থেকে নানানকম আলাপ কথাবর্তা

হত। কত সময় রানীমাতা চিঠিপত্রও দিতেন প্রয়োজনমত। কিন্তু চাক্ষুষ অপরিচিতই থেকে যান। (টড্ বলেন, তাঁদের কথাবার্তা চিঠিপত্র বেশ শিক্ষিত সমাজের মতই তাঁর মনে হয়েছে। অবান্তর হলেও এটি উল্লেখযোগ্য)। এই রাখীবন্ধন-সম্পর্ককে মোগল সম্রাট আকবর থেকে সকলেই সম্মান করতেন। এমন কি ঔরঙজেবের উদয়পুরের মহারানা রাজসিংহের রানীকে এই সম্পর্কে লেখা চিঠি পাওয়া যায় রাজস্থানের ইতিহাসে। (ক্রমশঃ)

অশেষ করুণা

শ্রীশান্তশীল দাশ

অশেষ করুণা তোমার ঠাকুর,
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে ;
যতবার আমি প'ড়ে প'ড়ে যাই,
ততবার তুমি তোল যে ধ'রে।
যখনি ঘনায় গভীর আঁধার,
পথ ভুলে যাই, করি হাহাকার ;
পথের নিশানা তুলে ধরো তুমি,
সব কালো মেঘ যায় যে সরে ;
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে।
কেউ আছে আর কেউ-বা না থাক,
তুমি আছ যেন একথা কভু
ভুলে নাহি যাই, যত ব্যথা পাই,
যতই আঘাত আসুক প্রভু।
তোমার পরশে সকল বেদনা
ধুয়ে মুছে হবে অমলিন সোনা,
তোমার মূরতি চির সুন্দর
আমায় হৃদয় থাকুক ভ'রে ;
বারে বারে তুমি বাঁচাও মোরে।

বন্যানিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক শ্রীচিরঞ্জীব সরকার

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নগর, জনপদ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি নদীতীরবর্তী স্থানেই প্রথম গড়ে ওঠে। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ জল মনুষ্যজীবনে এক অপরিহার্য বস্তু এবং নদীতীরবর্তী স্থানে জল সুলভ। দ্বিতীয়তঃ, চলাচলের ও যানবাহনের পক্ষে নদী একটি প্রকৃষ্ট পথ। নদী উহার জলপ্রবাহের সাথে যে পলি বহন করে আনে নদীর নিম্নভাগে (downstream) নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বন্যার সময় তা জমা প'ড়ে ঐ অঞ্চলসমূহকে উর্বর করে তোলে। কিন্তু বন্যা প্রবল আকার ধারণ করলে নগর, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদির প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। বহু মনুষ্য এবং গৃহপালিত গবাদি পশুর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ব্যাপক বন্যার ফলে বহু কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। অবশ্য কোন অর্থমূল্যেই মনুষ্যজীবনের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বন্যার প্রকোপ হতে আত্মরক্ষার জন্য মানবসমাজ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করেছে। এই প্রসঙ্গে সেই বিভিন্ন উপায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

বন্যা ও তার কারণঃ বন্যার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যখন ফেনায়িত জলধারা নদীর ভিতর দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে দুই কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী নগর, জনপদ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি প্লাবিত করে তখন তাকে বন্যা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক ভাষায়, কোন প্রবল বর্ষণের পরে নদীতে যে জলধারা প্রবাহিত হয় তাকে বন্যার জলধারা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, কতখানি জল প্রবাহিত হলে বন্যা বলা চলে তার সঠিক সীমা কিছু নেই।

বন্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি এবং সংবাদপত্রে পাঠ করেছি। অনেকের আবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে বন্যায় প্রায় প্রতিবৎসরই বহুলোকের এবং গৃহপালিত গবাদি পশুর প্রাণ বিনষ্ট হোত। এ ছাড়া বহু কোটি টাকা মূল্যের শস্য এবং ধনসম্পত্তি নষ্ট হোত। নদীযোজনাসমূহের তৈয়ারির পরে বন্যা এবং তার ধ্বংসলীলা অনেকাংশে কমে গেছে, যদিও এখনও মাঝে মাঝে বন্যার খবর পাওয়া যায়। শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং অন্যান্য দেশেও বন্যার প্রবল ধ্বংসলীলার খবর পাওয়া যেত। অথচ মজার কথা এই যে, কোন নদীর বন্যার দ্বারা ধ্বংসলীলা যতক্ষণ না সাধিত হয়েছে, ততক্ষণ সেই নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণের কথা কেউ ভাবেনি।

এখন দেখা যাক বন্যার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কি কি কারণে বন্যার প্রবলতা কম ও বৃদ্ধি হয়। এখানে শুধু বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে। এছাড়া বন্যা আরও অনেক কারণে হতে পারে। যথা, প্রবল সাইক্লোন অথবা ভূমিকম্পের জন্য সমুদ্রে প্রবল জলস্ফীতি এবং তৎকারণে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এবং নদীতে বন্যা, ইত্যাদি। বৃষ্টি থেকে যে বন্যার উৎপত্তি তার আলোচনাকালে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দের আলোচনা প্রয়োজন। সেগুলি নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হোল।

বৃষ্টিধারা যখন আকাশ থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে নেমে আসে তখন তা নিম্নলিখিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃষ্টিধারার অবতরণকালে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হবার পরেও একটা অংশ বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়। একে বলে 'ইভাপোরেশন্' (evaporation)। আর একটা অংশ উদ্ভিজ্জাদিতে আটকে যায় এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করতে পারে না। এই অংশটিকে বলা হয় 'ইণ্টারসেপ্‌শন্' (interception)। একটি অংশ হ্রদ ও অন্যান্য আবদ্ধ জলাশয়কে পূর্ণ করে; একে বলা হয় 'ডিপ্রেশন্ স্টোরেজ' (depression storage)। এই অংশগুলি বাদে বৃষ্টিধারার যে জল মৃত্তিকাপৃষ্ঠ স্পর্শ করে তার একটি প্রধান অংশ মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে। এই অংশটিকে বলা হয় 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্' (infiltration)। প্রত্যেক মৃত্তিকার ভিতরে কিছু না কিছু জলকণা (moisture) থাকে। এবং প্রত্যেক মৃত্তিকারই মাধ্যাকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে সর্ব উচ্চ কিছুটা পরিমাণ জলকণা দীর্ঘকাল ধরে রাখবার ক্ষমতা থাকে। এই জলকণার পরিমাণকে ঐ মৃত্তিকার 'ফিল্ড ক্যাপাসিটি' (field capacity) বলে। মৃত্তিকার মধ্যে কোন এক অবস্থায় যে পরিমাণ জলকণা থাকে তা ঐ মৃত্তিকার 'ফিল্ড ক্যাপাসিটি' অপেক্ষা যতখানি কম তাকে ঐ মৃত্তিকার ঐ অবস্থার 'ফিল্ড্ ময়শ্চার ডেফিসিয়েন্সি' (field moisture defficiency) বলা হয়। আবার, মৃত্তিকার ভিতর খনন করে কিছুদূর গেলে দেখা যাবে যে একটা সীমার নীচে মৃত্তিকাকণিকার ভিতরকার ফাঁকগুলি জলকণা দ্বারা পূর্ণ থাকে (saturated)। ঐ জলকণাপূর্ণ মৃত্তিকার সর্ব উচ্চ সীমা বা পৃষ্ঠকে (level) 'ওয়াটার টেবল্' (water-table) বলে। মৃত্তিকার ভিতরের এই সঞ্চিত জলরাশি থেকেই কূপ, নলকূপ প্রভৃতিতে জল পাওয়া যায়। আবার মৃত্তিকা-ভ্যন্তরস্থ এই সঞ্চিত জলরাশি হতেই জল নদীতেও প্রবাহিত হয় এবং সেই জলপ্রবাহকে নদীর 'বেস্ ফ্লো' (base-flow) বলে। বহু নদীতে (বিশেষ করে যে সব নদীতে সম্বৎসর প্রবাহ থাকে) এই মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জলপ্রবাহই গ্রীষ্মকালে এবং অন্য শুষ্ক আবহাওয়ার সময় জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে।

বৃষ্টির জলের যে অংশ মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে তা প্রথমে মৃত্তিকার 'ফিল্ড্ ময়শ্চার ডেফিসিয়েন্সি' পূর্ণ করে এবং তৎপরে তা 'গ্রাউণ্ড ওয়াটার টেবলে' গিয়ে মিলিত হয়, এবং মৃত্তিকার ভিতরের সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সর্বোচ্চ যে হারে বৃষ্টির জল মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে তাকে ঐ জমির 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' (infiltration capacity) বলে। বৃষ্টিধারার হার যখন জমির 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' অপেক্ষা বেশী হয়, তখন বৃষ্টিধারার বাকী পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে সঞ্চিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত জলধারার নাম 'ওভারল্যাণ্ড্ ফ্লো' (overland flow)। 'ওভারল্যাণ্ড্ ফ্লো' যখন নদীর ভিতরে এসে পড়ে প্রবাহিত হয় তখন তাকে নদীর প্রবাহ বা 'ডিস্‌চার্জ' (discharge) বলে। এই প্রবাহ-এর পরিমাণ মাপবার একক (unit) হোল 'কিউসেক্' (cusec.), অর্থাৎ নদীর কোন এক জায়গায় (cross-section) ভিতর দিয়ে যত ঘনফুট জল প্রতি সেকেণ্ডে প্রবাহিত হয় (cubic foot per second)। যন্ত্রদ্বারা এই জলপ্রবাহের পরিমাপ বিভিন্ন উপায়ে করা হয়।

বৃষ্টিপাতের পরে নদীতে যে জলপ্রবাহ আসে তার পরিমাণ নিম্নলিখিত পরিমাপগুলির

উপর নির্ভর করে, যথা, বৃষ্টিপাতের হার, উচ্চ অববাহিকার (catchment-basin) ক্ষেত্রফল, মৃত্তিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি' ইত্যাদি। এর মধ্যে উচ্চ অববাহিকার মৃত্তিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি'র উপর নদীর জলপ্রবাহ বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন, একই উচ্চ অববাহিকার উপরে একই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের হার বিভিন্ন পরিমাণ জলপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে কিছুদিন যদি কোন বৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক থাকে এবং উহার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি' খুব বেশী হয়। অতএব, জলপ্রবাহের পরিমাণ অনেক কমে যায়। 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি' জমির উপরিভাগের ঢাল (slope), উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ, উচ্চ অববাহিকার 'ওরিয়েণ্টেশন্‌' (orientation), বৃষ্টিপাতের সময় জমির শুষ্কতা বা আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। পূর্বেকার বারিপাতের জন্য মৃত্তিকা যদি জলকণাপূর্ণ থাকে (saturated) এবং উচ্চ অববাহিকার জমির ঢাল বেশী ও উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ কম হয়, তবে উহার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্‌ ক্যাপাসিটি' খুবই কম হবে। ঐ সময় খুব উচ্চ হারে বারিপাত হলে নদীর জলপ্রবাহ প্রবল আকার ধারণ করে এবং ঐ জলপ্রবাহকে বন্যা আখ্যা দেওয়া হয়।

বন্যানিয়ন্ত্রণ: (১) বাঁধনির্মাণ ও নদীগর্ভ-খনন সহায়ে:

বন্যানিয়ন্ত্রণের উপায় বা পদ্ধতিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:

(১) নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণ, যাতে নদীর জলরাশি দুই কূল প্লাবিত করতে না পারে। এতে নদীর ভিতর প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ কমান হয় না।

(২) নদীর অভ্যন্তরস্থ জলরাশির প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস না করে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা (level of water-surface) হ্রাস করান, যাতে জলরাশি দুই কূলের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে।

(৩) সেই সকল প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা নদী-অভ্যন্তরস্থ জলরাশির পরিমাণ অথবা জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। এই প্রক্রিয়াগুলি মোটামুটি দুই প্রকারের। যথা, নদীর উপরে আড়াআড়িভাবে (across the river) বাঁধনির্মাণ; এবং নদীর উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তন।

উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির ভিতর প্রথমটি অর্থাৎ নদীর দুই তীরে সমান্তরাল বাঁধনির্মাণ বহুকাল পূর্ব হতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে নদীতীরস্থ জনপদ, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতিকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বহুকাল পরে একটি বিশেষ ত্রুটি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে সমতলভূমিতে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে,নদীর দুই তীরে বাঁধ যখন ছিল না, তখন নদীর জল যে সমস্ত পলি বহন করত তার অধিকাংশই বন্যার জলের সাথে গিয়ে নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহের উপর পড়ে সেই সকল জমিকে উর্বর করে তুলত। এবং বন্যার জল সরে যাবার কালে (during receeding flood) নদীপার্শ্বস্থ জমির উপরিভাগের পলিমুক্ত জল নদীর ভিতর প্রবেশ করে নদীর গর্ভপৃষ্ঠের (river-bed) উপরে বন্যার সময়ে সঞ্চিত পলিরাশি ধুয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু নদীতীরে বাঁধ দেবার ফলে বন্যার জলরাশি নদীতীরস্থ অঞ্চলের উপর প্রসারিত হতে না পারায় জলরাশি দ্বারা বাহিত প্রায় সমস্ত পলিই নদীর গর্ভপৃষ্ঠের উপরে পতিত হয়ে গর্ভপৃষ্ঠকে উঁচু করে তোলে। ফলে, পর পর বৎসরের বন্যার জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায় এবং

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে উচ্চতর বাঁধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঁধের উচ্চতা বাড়াবার একটা সীমা আছে। তাছাড়া তীরবর্তী জমিপৃষ্ঠের উচ্চতা পূর্বে যেমন ছিল তাই থেকে গেছে। অতএব এখন কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যে বন্যা হবে তা আগের থেকে অনেকগুণ বেশী ক্ষতিকর হবে। বিশেষ করে বাঁধনির্মাণের পরে ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের মনে একটা নির্ভাবনার ভাব এসে যায় এবং তারা তখন আর বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত নয়। এবং এখন বন্যার জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবার ফলে জীবনহানির এবং ক্ষতির পরিমাণ বেশী হবার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমস্ত পলি নদীর গর্ভপৃষ্ঠে পতিত হবার দরুন গর্ভপৃষ্ঠ ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে এমন হতে পারে যে উহা পার্শ্ববর্তী (নদীতীরবর্তী) জমিপৃষ্ঠ হতে উঁচু। তখন ঐ সমস্ত জমি থেকে বর্ষার জল নিষ্কাশন খুব কষ্টসাধ্য এবং একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। একবার এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে এ সমস্যার সমাধান অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নদীর গর্ভপৃষ্ঠ খনন করে গভীর করলে নদীতে জলপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাস করা যেতে পারে, যাতে বন্যার জলরাশি দুই কূলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রক্রিয়াদ্বারা নদীতীরবর্তী অল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্থানে বন্যানিয়ন্ত্রণই সম্ভব, কারণ নদীর পুরো দৈর্ঘ্যকে এইভাবে খনন করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ এবং একরূপ অসম্ভবই বলা চলে। আবার অনেক সময়, নদী যদি বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়, এবং সেই বাঁকা পথ যদি অশ্বক্ষুরের (horse-shoe bend) আকার ধারণ করে, তবে জলের প্রবাহ পথে ঘর্ষণজনিত বাধা (frictional resistance) বেশী হওয়ায় জলপ্রবাহের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়। বন্যার সময় জলপৃষ্ঠের উচ্চতা নদীতীরের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী হলে বন্যা হয়। এমতাবস্থায় খানিকটা স্থান খনন করে নদীর গতিপথ সোজা করে দিলে বেশীর ভাগ জল এই সোজা পথে প্রবাহিত হবে এবং বক্রপথের তীরবর্তী জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

আবার, অনেক সময় নদীতীরবর্তী কোন স্থানকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে হলে ঐ স্থানের নদীর প্রবাহপথের উচ্চভাগ (upstream) থেকে একটি পৃথক কৃত্রিম খাল (diversion-channel) খনন করে নিম্নভাগের (downstream) প্রবাহপথে কোথাও যোগ করা যেতে পারে, যাতে নদীর জলপ্রবাহ দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানের পার্শ্ববর্তী নদীপথে জলপ্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আগেই বলা হয়েছে যে উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি বন্যার জলরাশির বা জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ হ্রাস না করে নদীতীরবর্তী কোন এক স্বল্পদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং বিশেষ অঞ্চলকেই মাত্র বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু এইসকল প্রক্রিয়া দ্বারা নদীর নিম্নভাগের সমস্ত উপত্যকাতে ব্যাপকভাবে বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এখন তৃতীয় বিভাগের দুইটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি হোল নদীর উচ্চভাগের কোন এক স্থানে নদীর উপর আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যানিয়ন্ত্রণের পক্ষে কার্যকরী একটি কৃত্রিম জলাধার প্রস্তুত করা। এই কৃত্রিম জলাধারের আয়তন এবং গভীরতা এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে বন্যার জলের একটি প্রধান অংশকে

এই জলাধারে আটকে ফেলা যায়। প্রথমে দেখা যাক এই কৃত্রিম জলাধার কিভাবে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। যে বাঁধ এই জলাধার প্রস্তুত করে সেই বাঁধের খানিকটা অংশ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে ঐ অংশের উপর এবং ভিতর দিয়ে জলপ্রবাহের পথ থাকে। বাঁধের এই অংশকে 'স্পিল্ওয়ে' (spillway) বলে। প্রথমেই হিসাব করে দেখা হয় জলপ্রবাহের হার কি পরিমাণ হলে বাঁধের নিম্নভাগের (downstream) নদীপ্রবাহ-পথে জলরাশি নদীখালের ভিতরে দুই তীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ, বন্যা না ঘটায়। বন্যার সময় 'স্পিল্ওয়ের' ভিতর দিয়ে সর্বোচ্চ এই পরিমাণ জলই প্রবাহিত হতে দেওয়া হয় ; আর জলাধারের জলসংরক্ষণের ক্ষমতা এমন হওয়া আবশ্যক যাতে বন্যার বাকী পরিমাণ জল জলাধারের ভিতর আটকে ফেলা যায়, অন্তত: সাময়িকভাবে। এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে জলাধার, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করতে হয় ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে বন্যার জলপ্রবাহের হার কি পরিমাণ হতে পারে তা নির্দিষ্ট করে। কতদূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্যার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হবে তা নির্ভর করে নদীপ্রকল্পের আর্থিক সঙ্গতির উপর এবং বন্যা নিরোধ করে যে পরিমাণ সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করা হবে তার মূল্যের উপর। এই ভবিষ্যৎ ১০০ বৎসর, ২০০ বৎসর অথবা হাজার বৎসরও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে একশত, দুইশত বা সহস্র বৎসরে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ বন্যার জলপ্রবাহের হার হবে তা দেখা হয়। ইহাকে বলা হয় শত বা সহস্র বৎসরে একবার বন্যা (once in hundred or thousand year flood)। এই সংজ্ঞা থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, এই বৎসর যদি এইরূপ বন্যা একবার হয় তবে আর একবার ঐ পরিমাণ বন্যা একমাত্র একশত বৎসর পরেই হওয়া সম্ভব! কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক ধারণা এই যে প্রতি বৎসরই ঐ পরিমাণ বন্যা একশততে একবার হবার সম্ভাবনা (one percent chance every year)। এইজন্য এইরূপ বন্যাকে একশততে একবার সম্ভাব্য বন্যা (one percent chance flood) আখ্যা দেওয়া হয়। সেইরূপ এক হাজার বৎসরের সর্বোচ্চ পরিমাণ বন্যাকে এক হাজারে একবার সম্ভাব্য বন্যা (point one percent chance flood) বলা হয়। পূর্বে পূর্বে নদীর উচ্চ অববাহিকায় কি কি সময়ে কিরূপ এবং কি কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং ঐ সকল বৃষ্টিপাত হতে নদীতে কি পরিমাণ জলপ্রবাহের হার উৎপন্ন হয়েছে, এই সকল তথ্য হতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ বন্যা হইতে পারে তাহা স্থির করা হয়। নদী-প্রকল্পের জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির আয়তন (size) কোন এক বিশেষ বন্যার উপরে ভিত্তি করেই স্থির করা হয়। যদি ভবিষ্যতে কখনও ইহা অপেক্ষা বেশী বন্যা আসে, তবে সেই বন্যার জলপ্রবাহের সর্বোচ্চ হার জলাধারের ভিতর প্রবেশ করবার পূর্বেই জলাধার পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সেই জলাধার বন্যানিয়ন্ত্রণের দিক থেকে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে। তখন, যাতে জলাধারের জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বাঁধের পক্ষে বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম না করে সেজন্য, বাঁধ থেকে জলনিষ্কাশনের হার ঐ বন্যার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের হারের সমান হবে, এবং জলাধার তৈয়ারী না করা হলে ঐ বন্যাতে নদীর নিম্নভাগে যে ক্ষতি সাধিত হত, জলাধার সত্ত্বেও একই পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে।

অতএব ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, কোন বন্যানিয়ন্ত্রক নদীপ্রকল্প কোন এক বিশেষ বন্যার (design flood, যথা, one percent বা point one percent chance flood) জন্যই তৈয়ারী করা সম্ভব। এই বন্যানিয়ন্ত্রক প্রকল্প তৈয়ারী হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিশেষ বন্যা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ বন্যার জলপ্রবাহের হার নদীতে আসা সম্ভব এবং তখন বন্যানিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ঐ প্রকল্প সম্পূর্ণ অকেজো। এখানে এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে জনসাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, কোন বন্যা-নিয়ন্ত্রক নদীপ্রকল্প তৈয়ারী হবার পরে ঐ নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে ভবিষ্যতে আর বন্যার ভয় নেই। এবং এই ধারণার উপর ভিত্তি করে লোকে ধীরে ধীরে নদীর নিম্নভাগের পূর্বেকার বন্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনপদ, শিল্পাঞ্চল প্রভৃতি গড়ে তোলে এবং নির্ভাবনায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল যে এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নদীর নিম্নভাগের উপত্যকার বন্যাঅধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকে ইংরেজীতে flood plain encroachment বলে। এইরূপ বসবাসের পূর্বে বন্যানিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়ের মতামত-গ্রহণ প্রয়োজন।

আবার অনেকসময়ে জলাধারনিয়ন্ত্রণ কালেও নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে বন্যার উদ্ভব সম্ভব। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক নদীর উচ্চ অববাহিকায় এবং নদীর নিম্নভাগের উপত্যকাতে প্রবল বারিপাত হচ্ছে। এই বারিপাতের ফলে জলাধারে প্রবল এক বন্যা আসবার সম্ভাবনা দেখে জলাধারের জল খুব দ্রুত নিষ্কাশন করা হোল, যাতে বন্যার একটি প্রধান অংশ জলাধারের খালি-করা জায়গায় আটকে ফেলা যায়। কিন্তু জলাধারের জল খুব দ্রুত নিষ্কাশনের ফলে নদীর নিম্নভাগে জলপ্রবাহের হার বারিপাতজনিত জলপ্রবাহের হারের সহিত মিলিত হয়ে প্রবল বন্যা ঘটাতে পারে। এইজন্য জলাধারনিয়ন্ত্রণ (reservoir-operation) সুচিন্তিত উপায়ে করা প্রয়োজন।

বন্যানিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জলাধারা প্রস্তুত হলে তা দিয়ে আরও কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যেমন, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচের জন্য জলসরবরাহ, মৎস্য-চাষ ইত্যাদি। এই সকল নদীপ্রকল্পকে বহুউদ্দেশ্যসাধক নদীপ্রকল্প (multipurpose river-valley project) বলা হয়। অবশ্য বন্যানিয়ন্ত্রণের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে জলাধার, বাঁধ ইত্যাদির আয়তন (size) বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং তাতে বেশী অর্থের প্রয়োজন।

অনেকসময় উচ্চ অববাহিকায় নদীর এবং উহার শাখা-প্রশাখার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ দ্বারা জলাধার নির্মাণ (soil conservation dams and reservoirs) করে বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং নদীর নিম্নভাগের জলপ্রবাহকে পলিমুক্ত করা হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রকল্পের সমালোচকেরা বলেন যে, কয়েক বৎসর পরে জলাধারগুলিতে পলি জমা পড়ে উহাদের আয়তন অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তখন ঐগুলি উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের দিক থেকে অকেজো হয়ে পড়ে; তাছাড়া এতে একটি বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। বিভিন্ন জলাধার থেকে জলনিষ্কাশন সুপরিকল্পিত উপায়ে না করা হলে ঐ সকল নিষ্কাশিত জল নদীর নিম্নভাগে (downstream) কোথাও একত্র মিলিত হয়ে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য এ সকল প্রকল্পে জলাধার থেকে জলনিষ্কাশন খুবই সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে করা উচিত, এবং বিভিন্ন জলা-

ধারের ও বাঁধের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

(২) উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তন সহায়ে:

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটির কম-বেশীর উপর বন্যার জলপ্রবাহের হারের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের (জমিপৃষ্ঠের) প্রকৃতির পরিবর্তন করে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান কার্য সাধিত হয়, যথা: (১) জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা, (২) বৃষ্টিপাতজনিত জমিপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত জলধারার (overland flow) গতিবেগে বাধা সৃষ্টি করে এই জলপ্রবাহের নদীপথে প্রবেশের সময় বৃদ্ধি করা, যাতে নদীপথে প্রবাহিত জলপ্রবাহের হারের (discharge) পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং (৩) উচ্চঅববাহিকার জমিপৃষ্ঠ থেকে বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকা ধুয়ে যাওয়া (soil-erosion) রোধ করা। এই কার্যগুলি সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সাধিত হয়। যথা, (১) জমির 'কন্‌টুর লাইন' (contour line) বরাবর স্বল্প উচ্চ এবং স্বল্পআয়তনযুক্ত (about 6 to 9″ in height and 5 to 6 ft. in base width) বাঁধ নির্মাণ, (২) 'কন্‌টুর লাইন' বরাবর জমি চাষ করা (contour farming), এবং (৩) উচ্চ অববাহিকায় উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা (aforestation)। কোন জমির উপরিভাগে সমউচ্চতাবিশিষ্ট জায়গার উপর দিয়ে যদি কাল্পনিক রেখা টানা হয় তবে সেই রেখাকে 'কন্‌টুর লাইন' বলা হয়। অতএব 'কন্‌টুর লাইন' বরাবর সকল ভূমিপৃষ্ঠের উচ্চতা সমান। এখন দেখা যাক এই তিনটি উপায়ে উপরি-উক্ত কার্যাবলী কিভাবে সাধিত হয়। প্রথমে দেখা যাক কন্‌টুর বাঁধ কিভাবে কাজ করে। পূর্বে বলা হয়েছে যে বৃষ্টিপাতের হার যখন জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি অপেক্ষা বেশী হয় তখন অতিরিক্ত বৃষ্টির জল জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে। কন্‌টুর বাঁধ নির্মাণের ফলে স্বল্পগভীর ছোট ছোট বহু জলাশয় নদীর উচ্চ অববাহিকার উপরে সৃষ্ট হয় বৃষ্টিপাতের সময়। এই জলাশয়গুলি বৃষ্টির জল অনেকসময় ধরে উচ্চ অববাহিকার জমির উপর ধরে রাখে, এবং তার ফলে উচ্চ অববাহিকার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি' বৃদ্ধি হয়, 'ইভাপোরেশন্' বেড়ে যায় এবং ফলে 'ওভারল্যাণ্ড ফ্লো' অনেক কমে যায়। এছাড়াও জলাশয়গুলিতে জল অনেকসময় ধরে আটকে থাকায় 'ওভারল্যাণ্ড ফ্লো'র হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাতে নদীর জলপ্রবাহের হার বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার 'ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্' বৃদ্ধি পাবার দরুন ভূগর্ভে সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং 'ওয়াটার টেবিল'এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে একদিকে যেমন বন্যার জলপ্রবাহের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে প্রবল বন্যার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নদীতে গ্রীষ্মকালে এবং অন্যান্য শুষ্ক আবহাওয়ার সময় জলপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। 'কন্‌টুর বাঁধ' দ্বারা আরও একটি প্রধান উপকার সাধিত হয়। বৃষ্টিপাতের সময় উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের মৃত্তিকা ধুয়ে যাবার ফলে বর্ষাকালে নদীতে জলের সহিত প্রচুর পরিমাণে পলি প্রবাহিত হয়। বৃষ্টির কণিকাগুলি যখন জমির উপরিভাগের মৃত্তিকার উপর বেগে পতিত হয় তখন মৃত্তিকাকণিকাগুলি পরস্পর আলগা হয়ে যায় এবং পরে ওভারল্যাণ্ড ফ্লোর সহিত প্রবাহিত

হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। এইভাবে প্রতিবৎসর নদীর উচ্চ অববাহিকা থেকে লক্ষ লক্ষ টন উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে যায় এবং সমুদ্রে বা নদীর মোহানায় গিয়ে জমায়েত হয়। অবশ্য অনেক সময় বন্যার সাথে নদীর নিম্নভাগের নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহেও পলি জমা পড়ে সেই অঞ্চলসমূহকে উর্বর করে তোলে। কিন্তু নদীর জলপ্রবাহের সহিত বাহিত এই পলিই নানাবিধ নদীসমস্যার একটি প্রধান কারণ। আবার এই পলি বন্যা-নিয়ন্ত্রক জলাধারে জমা পড়ে উহার আয়তন এবং গভীরতা কমিয়ে দেয় এবং জলাধারগুলির কার্যকারিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নদীর উচ্চ অববাহিকায় কন্টুর বাঁধ দিয়ে স্বল্পগভীর জলাশয়গুলি সৃষ্টির ফলে বৃষ্টিকণিকাগুলি আর মৃত্তিকা স্পর্শ করতে না পারায় মৃত্তিকাকণিকা-গুলি আলগা হয় না। এবং এই জলাশয়গুলির উপরিভাগ থেকে ওভারল্যাণ্ড ফ্লো হবার ফলে উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগ থেকে মৃত্তিকার ক্ষয় বন্ধ হয়।

কন্টুর ফারমিং (contour farming)-এর অর্থ হোল কন্টুর রেখা বরাবর জমি চাষ করা। ইহার জন্য কৃষকদিগের ভিতরে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন যাতে তারা জমির ঢালের দিকে চাষ না করে কন্টুর রেখা বরাবর চাষ করে। জমির ঢাল বরাবর চাষ করলে ঢাল বরাবর ছোট ছোট অসংখ্য নালার সৃষ্টি হয়। এতে ওভারল্যাণ্ড ফ্লো অত্যন্ত বেশী হয় এবং জমির উপরিভাগের মৃত্তিকাও ঐ জলের সহিত বহুল পরিমাণে বাহিত হয়। পক্ষান্তরে কন্টুর রেখা বরাবর চাষ করলে 'কন্টুর্ বাঁধ'-এর অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

তৃতীয় উপায় হোল নদীর উচ্চ অববাহিকার জমিতে উদ্ভিজ্জাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা; ইহাতেও পূর্বোক্তরূপ ফল পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জের শিকড়গুলি মৃত্তিকার ভিতরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এই সকল শিকড় থেকে আবার অতি সূক্ষ্ম শিকড়সকল চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই শিকড়গুলি উহাদের চারিদিকে জলকণা ধরে রাখে। ইহাতে জমির ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও উদ্ভিজ্জাদি ওভাল্যাণ্ডফ্লো-কে বাধা প্রদান করে উহার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন্ বৃদ্ধি এবং নদীর জলপ্রবাহের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার শিকড়গুলি মৃত্তিকা কণিকাগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকায় উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের মৃত্তিকা-ক্ষয় বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের যে কয়টি পদ্ধতি বিবৃত হোল তার সব কয়টিই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতির প্রয়োগে সব দিক দিয়ে সুফল পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে সেই সমস্যার প্রকৃতির উপর। সেইজন্য কোন বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি গ্রহণের পূর্বে সমস্যার প্রকৃতির বিশদ পর্যালোচনা একান্তই প্রয়োজন। অবশ্য এই পর্যালোচনা প্রকল্পের আর্থিক সঙ্গতির উপর লক্ষ্য রেখেই করতে হবে। কিন্তু সর্বশেষে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি, অর্থাৎ উচ্চ অববাহিকার জমির উপরিভাগের প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন সর্বক্ষেত্রেই সুফল দেবে এবং সকল নদীর উচ্চ অববাহিকাতেই, অর্থাৎ দেশের সর্বত্র এই সকল প্রকল্প সুপরিকল্পিত উপায়ে গ্রহণ করা বিধেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১৮৬৩—১৮৯৬)

শ্রীঅজিত সেন

যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে তখনই ভগবান অবতীর্ণ হন। উনবিংশ শতাব্দীতে এমনি এক প্রয়োজনে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। পুত:সলিলা গঙ্গার পূর্বতীরস্থ দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীর কুঠীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে ডাকতেন নবযুগপ্রবর্তনে যাঁরা তাঁকে সহায়তা করবেন, তাঁর সেই লীলাসহচরদের, আত্মজ-প্রতিম যুবকবৃন্দকে—'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে!' যুবকভক্তদের আসা সুরু হল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ হতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন' প্রভৃতি এসে পড়লেন।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহী শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত। প্রায়-বিলুপ্ত ইতিবৃত্তের সূত্র অনুসরণে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভবনাথ-স্মৃতিসঞ্চয়নে এই সংকলন নিছক অনুলিখন মাত্র।

বরাহনগরে অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। গায়ের রং অতি উজ্জ্বল অর্থাৎ গৌরবর্ণ। মুখ গোল ও ঈষৎ চাপা এবং মুখে কালো (কুঞ্চিত) দাড়ি। এক কথায় সুপুরুষ চেহারা ছিল। এই প্রিয়দর্শন যুবক অতীব ভক্তিমান ছিলেন। অতি অমায়িক প্রকৃতির ও ভক্তভাবের এই যুবকের ঈশ্বরের নামে চোখ জলে ভরে যেত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন।

ভবনাথের পিতার নাম রামদাস চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। এঁদের দুটিমাত্র সন্তান হয়েছিল। একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা। পুত্র ভবনাথ বড় এবং কন্যা ক্ষীরোদবালা ছোট।

ভবনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন, সমাজের সর্বস্তরে তখন পরিবর্তনের প্রচণ্ড জোয়ার চলেছে। ইয়ং বেঙ্গলদের অনুকরণে ও স্বেচ্ছাচারিতার নগ্নপ্রভাবে বরাহনগরের নৈতিক কাঠামো (অন্যান্য বহু স্থানের মতই) ভেঙ্গে পড়তে সুরু করেছে। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর শ্রীযুক্ত শশিপদবাবুর নেতৃত্বে দক্ষিণ বরাহনগরের যুবকেরা বিভিন্ন দেশহিতকর সৎকার্যে এগিয়ে এলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বরাহনগরে ২৭শে অক্টোবর তারিখে "স্টুডেন্টস্ ক্লাব" স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ জনশিক্ষা ও আত্মোন্নতি বিধানের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, নৈতিক সুশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ভবনাথ ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কালীকৃষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ দাঁ, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র দে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, দাশরথি সান্যাল প্রভৃতি দক্ষিণ বরাহনগরবাসী যুবকগণ এই সকল সমাজসেবা-মূলক কর্মে পুরোধার আসন গ্রহণ করেন।

ভবনাথ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। ভবনাথও নরেন্দ্রনাথের মত যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং নিরাকারের ধ্যান করতে ভালবাসতেন। তবে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভবনাথের ছিল অকৃত্রিম আনুগত্য। ভবনাথ নরেন্দ্রনাথকে এত গভীর ভালোবাসতেন যে সুবিধা পেলেই নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগরে অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন-এ নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে খাওয়াতেন। তখন কলকাতা থেকে সোজা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না; ফলে কলকাতা থেকে বরাহনগর পর্যন্ত গাড়িতে এসে তারপর হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যেতে হত। অন্যথায় খরচ অনেক বেশী পড়তো। যাই হোক বরাহনগরে নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যথা সাতকড়ি লাহিড়ী, দাশরথি সান্যাল, (এঁরা উভয়েই নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন) ভুবন মোহন দাস, হরিদাস বড়াল, বিপিন সাহা, মহেন্দ্রনাথ পাল, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

"জুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর॥
নবীন বয়স তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে॥
আত্মবন্ধু প্রতিবেশী করে উপহাস।
শুনিয়া প্রভুর পদে তাঁহার বিশ্বাস॥"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি]

তবে—

"প্রভুভক্ত ভবনাথ সদ্‌বুদ্ধি গুণে।
পরের ব্যঙ্গোক্তি কানে আদতে না শুনে।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভবনাথ প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন ও মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে রাত কাটাতেন। তাঁর বাবা মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে নানা ভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। বরঞ্চ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। এই সময়ে ভবনাথ আমিষআহার এবং তাম্বুলাদি বর্জন করেন। একথা জানতে পেরে রামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁকে বলেছিলেন—"সে কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই হ'ল আসল ত্যাগ।"

ভবনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বহুবার 'নরেন্দ্র, রাখাল' প্রভৃতির সঙ্গেই তাঁর নামোল্লেখ করতেন, এঁদের সকলকেই নিত্যসিদ্ধ বলতেন। বলরামকে বলেছিলেন: এদের খাইও তাহলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে। এরা (নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, পূর্ণ প্রভৃতি) সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভালো হবে।

ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ) দুজনে ভারি মিল। হরিহর আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রনাথের কাছে বাসা করতে বললেন। ওঁরা দুজনেই অরূপের ঘর। ভবনাথের প্রকৃতিভাব আর নরেন্দ্রনাথের পুরুষভাব।

ভবনাথ ছিলেন জন্মসাধক। যুগাবতার নিজেই বলেছেন—"নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ

এরা সব নিত্যসিদ্ধ, এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।" রামকৃষ্ণদেবের এই গৃহী-শিষ্যের অন্তর্বাসনা ছিল সন্ন্যাস। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কে কবে নিরিখ করতে পেরেছে? ভবনাথকে তাই সংসার করতে হ'ল।

তাঁর বিবাহপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের কাছে বলেছেন (৭ই মার্চ, ১৮৮৫)—

"ভবনাথ বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা লয়ে দুজনে থাকে। তারপর আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন ভবনাথ রেগে রোক করে বললে—কি! আমরাও আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?"

বরাহনগর কুটীঘাট রোডের ওপরে কালীকৃষ্ণের বাড়ী থেকে কিছু দূরে জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেনের কাছ বরাবর অবিনাশ দাঁ মহাশয়ের বাড়ী। ইনি ভবনাথের অত্যন্ত পরিচিত জন ছিলেন। তখন কলকাতায় সবে ক্যামেরার চল সুরু হয়েছে। অবিনাশের একটি ক্যামেরা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিজের ছবি কাকেও তুলতে দিতেন না। ভবনাথ অবিনাশকে ডেকে এনেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তোলার জন্যে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে রাধাকান্ত-মন্দিরের সম্মুখস্থ রোয়াকে এই ছবি তোলা হয়। (১৮৮৩—'৮৪ খৃষ্টাব্দ) এই ছবিটিই ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে।

একদিন দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের ফটো দেখে নিয়ে যেতে চান; ঠাকুর তাঁকে সেই ফটোটি না দিয়ে বলেন যে, অবিনাশ সেদিন ফটো তুলে নিয়েছে, তার কাছে পাওয়া যাবে; ভবনাথকে বললে সে অবিনাশকে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে দেবে।

প্রায় কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মল্লিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা কিরণশশী দেবীর সঙ্গে ভবনাথের বিবাহ হয়। অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে তিনি বরাহনগরের একটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তবে তাঁর এই চাকরি খুব বেশী দিন থাকেনি। এর কিছুদিন পরেই ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়; ফলে প্রকৃতপক্ষে ভবনাথকে সংসারের ঝামেলায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়। তবে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভবনাথের স্ত্রী কিরণশশী দেবী এযাত্রায় আরোগ্য লাভ করেন। বিবাহিত হলেও ভবনাথের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। কিন্তু এই সময় থেকেই চাকরি ইত্যাদি চেষ্টার জন্য ভবনাথের পক্ষে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে নিয়মিত যাতায়াত ব্যাহত হতে থাকে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ভবনাথ, হাজরা, শ্রীম প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পাণিহাটী মহোৎসবে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে, আরও একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভবনাথপ্রমুখ বরাহনগরবাসী যুবকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"র, (১৮৭৬) পাঠাগার ও "দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী" (১৮৮২) সম্ভবতঃ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একত্র হয়ে "বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী" নামে পরিচালিত হতে সুরু করে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে এই পাঠাগারের নিজস্বগৃহের উদ্বোধন হয়েছে। ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ এই "আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা"র (বর্তমান "বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরী" নামে পরিচিত) একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

পরমহংসদেবের গলরোগের বৃদ্ধি হলে ভক্তগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা উপযুক্ত চিকিৎসাদির জন্য অবশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর (২৭শে অগ্রহায়ণ) পরমহংসদেবকে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নিয়ে এলেন। এই উদ্যানবাটীতে (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬) কথাপ্রসঙ্গে ভবনাথ মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন: বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নতুন স্কুল হবে শুনলাম; আমারও তো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে—চেষ্টা করলে হয় না? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভবনাথের অনিয়মিত আসাযাওয়া নিয়ে বহুবার ভক্তদের কাছে অনুযোগও করেছেন। আবার সস্নেহ অন্তরে ভবনাথের জন্য গভীরভাবে চিন্তিতও হয়েছিলেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়েছেন। [শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) "ওকে খুব সাহস দে।"]

ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির লগ্ন এসে পড়ল। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট পরমহংসদেব মহাসমাধিতে লীন হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ যুবকভক্তগণকে একত্র করে একটি মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন। ইহার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন—একটি স্থান অন্ততঃ চাই। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় সুরেশচন্দ্র মিত্র (পরমহংসদেব ইঁহাকে সুরেন্দ্র বলতেন) মাসিক কিছু টাকা দিতে রাজি হলেন। ভবনাথকে একটি বাড়ী যোগাড় করতে বলা হলে তিনি মুন্সীদের ভূতের বাড়ীখানা মাসিক ১১৲ টাকা হিসাবে ভাড়া করে দিলেন। ভবনাথ ও হুটকো গোপাল দুজনে মিলে বাড়ীখানা পরিষ্কার করে ফেললেন। দু-চার মাসের মধ্যেই সব হ'ল। এভাবে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির কিছুকাল পরে ভবনাথ বরাহনগর অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনের বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে ভবানীপুরে গিরিশ ডাক্তার রোডে বাড়ী কিনেছিলেন। এই সময়ে ভবনাথের একমাত্র কন্যা প্রতিভাদেবীর জন্ম হয়। তারপর তিনি সরকারী বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পদ নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন; সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বরাহনগর মঠে ভবনাথের যাতায়াত কমে গিয়েছিল।

বরাহনগর মঠ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বৎসর কাল চলেছিল। এর পরে বরাহনগরের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ আলমবাজারে একটি দোতলা বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত করলেন।

আলমবাজার থেকে লোচন ঘোষের ঘাটে যাবার রাস্তার দক্ষিণ পাশে এই বাড়ী অবস্থিত। রাস্তার উত্তরে চট্টোপাধ্যায়দের মোটা থামওয়ালা বাড়ী। সদর দরজা পূর্বদিকের গলির ভিতর। আলমবাজার মঠে ভবনাথ সুযোগ পেলেই মধ্যে মধ্যে আসতেন ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের সঙ্গে আনন্দ ও উৎসবাদি করতেন। স্বামীজী ভবনাথকে যে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত (১৮৯৪) স্বামীজীর (১৪১ নং) পত্রে—"ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কিনা? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা দিও।" ভবনাথের সংগঠন-ক্ষমতা স্বামীজীর অজ্ঞাত ছিল না—(পত্র নং ১০২)..."হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর.." ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণা-

নন্দকে লিখিত (পত্র নং ২৪১), "ভবনাথ, কালী-কৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত (পত্র নং ১৪৯) পত্রেও স্বামীজীর বন্ধুপ্রীতির আন্তরিক উত্তাপ মেলে—"কালীকৃষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, সাতু, হরি চাটুজ্যে সকলকে তোমরা ভালোবাসো কিনা —সব লিখবে।"

ভবনাথ সুগায়ক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তিনি একাধিক গানও গেয়েছিলেন। সেই সব গানের কয়েকটির প্রথম পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল।

(ক) ধন্য ধন্য আজি দীন, আনন্দময়ী! (১১.৩.১৮৮৩.)

(খ) দয়াময় তোমা হেন কে হিতকারী—(বলরামবাটীতে ৭.৪.১৮৮৩.)

(গ) গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না (২৯.৯.১৮৮৪.)

কিছু সাহিত্যসেবাও তিনি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত "নীতি-কুসুম" ও "আদর্শ নরনারী" গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলিকাতা ত্যাগের পর নকীপুর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি নানা জায়গা ঘুরে রোগাক্রান্ত দেহে (কালাজ্বর) ভবনাথ কলকাতায় ফিরে বাদুড়বাগানে রামকৃষ্ণ দাস লেনে ভাড়া বাড়ীতে এসে উঠলেন। এই সময়ে কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। ভবনাথকে জোর করে মধুপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে ফিরে এসে মাত্র একমাস রামকৃষ্ণ দাস লেনে অবস্থান করার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই একনিষ্ঠ কর্মযোগীর অকাল তিরোভাব ঘটে।

এই মহাসাধকের শেষকৃত্য কাশীপুর শ্মশানে (অধুনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান) বহু সাধক-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়।*

জাগো!

শ্রীপ্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের পৃথিবী কার অভিশাপে
হোলো আজি মরুময়,
আকাশে বাতাসে শুধু হাহাকার-
ভরা নিশ্বাস বয়!
মানুষের মাঝে 'মানুষ' সুপ্ত
স্বার্থ-তিমিরে চেতনা লুপ্ত
মানবের প্রাণ দেয় যে বিশ্বে
দানবের পরিচয়!

সকল হৃদয়ে আসীন হে দেব,
লুকায়ে থেকো না আর,
পূর্ণ বিভায় ওঠো, জেগে ওঠো
অন্তরে সবাকার!
মিথ্যা ও ছলে আবিল কর্মে
লোভ-দ্বেষ-ভরা জীবনমর্মে
ধ্বংস করিয়া ফোটাও সেথায়
সত্য স্বরূপ তার!

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়), শ্রীরামকৃষ্ণ (সুবোধচন্দ্র দে) প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ঈশ্বর

শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

ভগবান পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ঈশ্বর কথাটি বুঝাতে তিনটি সূত্র লিখেছেন :—

(১) 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ'।

(২) 'তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্'। আর,

(৩) 'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনান-বচ্ছেদাৎ'।

(১) ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই পুরুষ-বিশেষকে ঈশ্বর বলে। **ক্লেশ** কি? পতঞ্জলি বলেন— অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ রকম মনোধর্মই **পঞ্চ ক্লেশ** এগুলো সবই মিথ্যাজ্ঞান। যেটা যা নয়, সেটাকে তাই ব'লে বুঝা অর্থাৎ অনিত্য, অশুচি, দুঃখ, ও অনাত্মপদার্থের উপর নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা জ্ঞানের নাম **অবিদ্যা**। **অস্মিতা** হচ্ছে দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তিকে, জীববুদ্ধি ও স্বরূপচৈতন্যকে একই ব'লে বোধ; অর্থাৎ মনবুদ্ধি প্রভৃতিতে 'আমি' প্রতীতিই **অস্মিতা**। যে সুখ একবার ভোগ করা গেছে, তার কথা মনে হ'লেই আবার সেটা ভোগ করার যে কামনা বা ইচ্ছা তারই নাম **রাগ**; আর যে দুঃখ একবার ভোগ করা গেছে, তার উপর যে বিরাগ বা অপ্রবৃত্তি তারই নাম **দ্বেষ**। জীব-মাত্রেরই দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে একটা 'আমি' সম্পর্ক পাতানো আছে। জীব এই পাতানো সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না। তেমনি ধনাদি বিষয়ের সঙ্গেও একটা 'আমার' সম্পর্ক পাতানো আছে—এ থেকেও বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না; তাই জীবের মৃত্যুভীতি। পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত এই মৃত্যুভয়রূপ সংস্কারই **অভিনিবেশ**।

তারপর **কর্ম**। কর্ম দ্বিবিধ—কুশল ও অকুশল।

এই দ্বিবিধ কর্মের যে ফল তাকে **বিপাক** বলে।

আশয় কি? না, কর্মানুরূপ যে বাসনা (অনুকূল বা প্রতিকূল সংস্কার) তাকে **আশয়** বলে। এগুলি সবই চিত্তধর্ম; কিন্তু পুরুষ ফলভোক্তা ব'লে তারই ধর্ম ব'লে অভিহিত হয়।

যিনি উল্লিখিত ক্লেশাদি সব কিছুতেই নির্লিপ্ত,—এর কোনটাই যাঁকে ছুঁতে পারে না, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। পুরুষ-বিশেষ বলেছেন এই জন্য যে, কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ আছেন যাঁরা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহরূপ ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন ক'রে কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বর সেরূপ নন। তাঁর বন্ধন কখনো ছিল না—কখনো হবে না। তিনি নিত্যমুক্ত, নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ ঈশ্বর-স্বরূপ। সেজন্য তাঁকে ক্লেশাদি থেকে মুক্তপুরুষ না ব'লে পুরুষ-বিশেষ বলা হয়েছে। তিনি সদাই ঈশ্বর—সদাই মুক্ত। তাঁর ঐশ্বর্যের সম বা অধিক ঐশ্বর্য আর কারু নাই। ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা তাঁতে আছে ব'লে তিনি ঈশ্বর।

(২) তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি জীবাত্মার মত চিত্তের সঙ্গে মিলে মিশে বাসনা-নামক সংস্কারের বশীভূত হন না। তিনি এক অসাধারণ অচিন্ত্য শক্তি-যুক্ত ও দেহাদি-রহিত আত্মা বা পরমপুরুষ। নিরতিশয় জ্ঞান (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা) আছে

ব'লে তিনি ঈশ্বর। তিনি বিশেষত্বপূর্ণ ব'লে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ নন—কেবল শাস্ত্র থেকেই তার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হ'তে পারে। নিজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না থাকলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা রূপ প্রয়োজন তাঁর আছে। সকলকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করবো,—প্রাণিগণের প্রতি এরূপ অনুগ্রহই সে প্রয়োজন।

[তাই তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (গীতা ৪।৮)।]

(৩) ঈশ্বর সর্বপ্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেষ্টা; কারণ তিনিই সকলের আদি। কালশক্তি তাঁতে অস্তমিত। পূর্ব পূর্ব গুরুগণ সকলেই কালাধীন—উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিমিতায়ুঃ। ঈশ্বর কপিলাদি গুরুসকলেরও গুরু; তাঁর সম্বন্ধে কাল অনুমাপক হয় না। তিনি সকল কালেই আছেন। যেমন বর্তমান সৃষ্টির আদিতে স্বীয় নিত্যমুক্ত স্বভাব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, অপরাপর সর্গেও সেরূপ জানা যায়।

*

মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি মায়াধীশ; মায়াকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াদি কার্য করেন। যখন মায়া তাঁতে লীন অবস্থায় থাকে তখন তিনি ব্রহ্ম। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে থেকে জীবকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত করছেন (গীতা ১৮।৬১)।

*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন :

ঈশ্বরই কর্তা—জীবের 'আমি কর্তা' বোধ অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। হাঁড়ির নীচে আগুন আছে। তাই হাঁড়ির ভিতরে জলের মধ্যে আলু বেগুন চাল ডাল লাফাতে থাকে। জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। পুতুলনাচের পুতুল বাজিকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলেই চুপ। ঈশ্বরদর্শন না হওয়া পর্যন্ত আমিই সদসৎ সব কাজ করছি এ ভুল থাকে। এ তাঁরই মায়া—সংসার এই মায়ার খেলা! বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে—সৎপথ ধরলে, তাঁকে লাভ করা যায়। তখন বোঝা যায়, তিনিই কর্তা, আর আমি অকর্তা; তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; তিনি করান, তাই করি। চাঁদামামা সকলেরি মামা।

ঈশ্বর ও কর্মফল—তিনিই সব করাচ্ছেন, তিনিই কর্তা; মানুষ যন্ত্রস্বরূপ,—নিমিত্তমাত্র। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে। তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে!

যে ঈশ্বর দর্শন করেছে সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। যার সাধা গলা তার সুরেতে সা, রে, গা, মা-ই এসে পড়ে। সিদ্ধ লোকের বেতালে পা পড়ে না।

কিন্তু পাপের শাস্তি দেবেন কি না দেবেন সে হিসেবে তোমার দরকার কি? সে তিনি বুঝবেন। বাগানে কত গাছ, কত পাতা, সে হিসেবে তোমার দরকার কি? তুমি আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।

এ সংসারে ঈশ্বরসাধন জন্য তুমি মানবজন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয় তাই চেষ্টা করো। বিচার ক'রে তোমার কি হবে? আধ পো মদে তুমি মাতাল হ'তে পারো, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তা জেনে তোমার কি হবে?

ঈশ্বরই গুরু—গুরু এক সচ্চিদানন্দ (ঈশ্বর)। তিনিই গুরুরূপে এসে শিক্ষা দেন। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া,

তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ-গুরু বই আর গতি নাই।

সদ্‌গুরু লাভ হ'লে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তারাই কাঁচা গুরু। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেন সেখো; হাত ধরে নিয়ে যান। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেহ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে হবে না; তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়—তবে তো বিশ্বাস হবে! বিশ্বাস হ'লেই সব হ'য়ে গেল। একলব্য মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণ-শিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে পূজা করতো—তাতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'লো।

ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—

সংসারের সব কিছুই অনিত্য। শরীর এই আছে, এই না'ই। তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। নিষ্কাম হ'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়। নিষ্কাম হ'লে ভাল —তবে নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন। তা ব'লে দয়ার কাজ কি কিছু করবে না? তা নয়, সামনে দুঃখকষ্ট দেখলে সামর্থ্য থাকলে নিশ্চয় দেওয়া উচিত। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান, আরও বড়।

তবে নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরলাভের একটা উপায়। কিন্তু ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কামভাবে করছি কিন্তু হয়ত যশের ইচ্ছা গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা এসে গেছে। আবার বেশী কর্ম জড়ালে কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না। বেশী কর্মের ভিতর যদি সে পড়ে ব্যাকুল হয়ে সে প্রার্থনা করে—হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও, আমার মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু'—এ বোধ না থাকলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না।

তাঁকে লাভ হ'লে বোধ হয় তিনিই কর্তা, আমি অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজে জড়িয়ে মরি? কর্ম আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করতে করতে এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।

ঈশ্বর ও শুদ্ধ আত্মা—

(হাজরার প্রতি) তুমি শুদ্ধ আত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধ আত্মা নিষ্ক্রিয়, 'তিন অবস্থা'র সাক্ষী স্বরূপ। যখন ভাবি তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে 'ঈশ্বর' বলি।

ষোড়শীপূজা

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

সারদা ও রামকৃষ্ণ মিলে গঙ্গাতটে
গৈরিকের মুক্তরাগ লাগে লীলা-নাটে।
রাতে রামকৃষ্ণ সদা ভাবমগ্ন হন
ভাবের জগতে মন থাকে অনুক্ষণ।
সমাধিতে রামকৃষ্ণ লীন হন সদা
দেখি বড ভয় পান জননী সারদা।
এই মহাভাব ভাঙা হয় অতি ভার
কিছুতেই নাহি খুলে সমাধির দ্বার।
মনভ্রান্তা মাতা ডাকে কাঁদিয়া হৃদয়ে—
কি করিলে সংজ্ঞা হয় দাও তাহা কয়ে।
ঠাকুর সে কথা পরে জানিলা যখন
ধীরে ধীরে তাঁরে তিনি নিজমুখে কন
কোন্ ভাবে কোন্ নাম শুনাইলে তবে
দেহে তাঁর পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হবে।
ভাবে সমাধিতে আর ঈশ্বরকথায়
ঈশ্বর-আবেশে প্রতি রাত কেটে যায়।
এইভাবে একসাথে করি রাত্রিবাস
অপূর্ব সে দিব্যলীলা চলে আটমাস।
এরই মাঝে এল ফলহারিণী-শ্যামার
পূজারাতি, অমানিশা নিবিড় আঁধার।

ঠাকুর সেদিন ডাকি হৃদয়েরে কন—
মোর ঘরে কর শ্যামাপূজা-আয়োজন।
দীনু পূজারীরে সাথে লইয়া হৃদয়
যথাসাধ্য পূজা-আয়োজনে রত হয়।
যথাকালে আসি রামকৃষ্ণের আহ্বানে
জননী সারদা বসে দেবীর আসনে।
পূজক-আসনে বসে জগতের গুরু,
বিধিমতে দেবীপূজা হয়ে যায় সুরু।
দেবীপদে রামকৃষ্ণ যা করে অর্পণ
ভাবমগ্না সারদা তা করেন গ্রহণ।
পূজার মাঝারে হয়ে সমাধিতে লয়
পূজ্য ও পূজক মিশে এক আত্মা হয়।
পূজা-শেষে প্রভু মা-র চরণকমলে
সাধনার সব ফল দিলা অর্ঘ্য-ছলে।
দ্বাদশ বৎসর ধরি কত না সাধন,
কত ত্যাগ, কি তপস্যা, কত আরাধন!
তাহার সকল ফল জপমালা সনে
সঁপি মূর্তিমতী মহাশক্তির চরণে
দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী সাধন-যজ্ঞেতে
পূর্ণাহুতি দান করিলেন এই মতে।

সমালোচনা

বিবেকচূড়ামণিঃ—অনুবাদক : স্বামী বেদান্তানন্দ, প্রকাশক : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩৮০ ; মূল্য ৪৲।

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে শঙ্করাচার্যকৃত 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' গ্রন্থখানি চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। সাধক ও মুমুক্ষুগণের কণ্ঠহারস্বরূপ 'বিবেকচূড়া-মণিঃ' গ্রন্থের সার্থকতা শুধু নামে নয়, জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করাইবার ক্ষমতা ইহার অসীম। নামরূপাত্মক সংসারের মিথ্যাত্ব, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সত্তার অনস্তিত্ব এবং জীবের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদন অতি দুরূহ। কিন্তু শব্দের মনোহারিত্ব, ভাষার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির সুগমতা ও উপস্থাপনের কৌশলে দুরূহ বিষয়ও প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট দুর্বোধ্য থাকে না। এই প্রকরণ-গ্রন্থে আচার্য শঙ্করের লেখনী-মুখে নির্ঝরের মতো অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছে। যুগাচার্য স্বামীজী 'বিবেকচূড়ামণিঃ' গ্রন্থটিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় অনেকস্থলে ইহার উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মূল সংস্কৃত শ্লোক, তাহার নীচে অন্বয় ও বাংলা শব্দার্থ, তৎপরে সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এই ব্যাখ্যা বিষয়-বস্তু অনুপ্রবেশে বিশেষ সাহায্য করিবে। বাংলা ভাষায় বিবেকচূড়ামণির এইরূপ একটি সংস্করণের বিশেষ অভাব ছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় সে অভাব দূর হইল সন্দেহ নাই। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত এই 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া বিবেকের আলোক প্রজ্বালিত করুক—এই প্রার্থনা।

কঠোপনিষদ্—অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য। প্রকাশক : বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, পোঃ বজবজ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৬৪ ; মূল্য ৭৲।

উপনিষদের বাণী মহা জাগরণের বাণী। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'উপ-নিষদের বাণী দ্বারা সারা জগৎকে সজীব, সবল ও প্রাণবন্ত করা যায়।' স্বামীজী কঠোপনিষদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিত্ব-পূর্ণ ভাষা, উচ্চভাব, নচিকেতার মতো দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী ইত্যাদির সমাবেশবশতঃ এই উপনিষদ্খানি উপনিষৎসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'। জ্ঞানলাভের পথে শ্রদ্ধা অপরিহার্য, কঠোপনিষদের অনুধ্যানে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা জাগরিত হয় বলিয়া ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক।

আলোচ্য গ্রন্থে মূল উপনিষদ্, মন্ত্রের অন্বয়, বাংলা অর্থ, ও শঙ্করভাষ্য সানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। 'ভাষ্যবিবৃতি'তে মূল উপনিষদ্ ও শঙ্করভাষ্যের যে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট। নিঃসন্দেহে বলা যায় কঠোপনিষদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে এই 'ভাষ্যবিবৃতি' বিশেষ সহায়ক।

আশ্রম (১৩৭২)—প্রকাশক : স্বামী পুণ্যানন্দ, কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা ; পৃষ্ঠা ৭৬।

এবারের রহড়া বালকাশ্রমের সচিত্র বার্ষিক পত্রিকাখানি নানা দিক হইতে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সংখ্যাটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'শৈশবে মাধবানন্দ' চিত্রখানি এবং 'হে মহাজীবন' রচনাটি—প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি সার্থকভাবে পরিবেশিত। শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রতিটি লেখাই সুলিখিত; 'আশ্রম-সংবাদে' বিভিন্ন বিভাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একতারা (১৩৭২)—সম্পাদক শ্রীপ্রতুল চন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, মুকুন্দপল্লী, বীরভূম। পৃষ্ঠা ৬২।

'একতারা' পত্রিকাটি শিক্ষাপীঠের নব পর্যায়ে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণের রচনাবলীতে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। 'আমাদের মাষ্টার মশাই' প্রবন্ধটি শিক্ষাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা আজীবন শিক্ষাব্রতী মুকুন্দবিহারী সাহার জীবনপরিক্রমা ও সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'একদিনের স্বাধীনতা' একটি মনোজ্ঞ রচনা। চিত্রগুলি শিক্ষাপীঠের কর্মধারার পরিচিতি-জ্ঞাপক। প্রচ্ছদপটটি পত্রিকার নামটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

কল্যাণ (হিন্দী): ৪০তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—ধর্মাঙ্ক। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০; মূল্য ৭·৫০ টাকা।

বহুল-প্রচারিত ও হিন্দী ভাষার বিখ্যাত ধর্মপত্রিকা 'কল্যাণ'-পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া সুন্দর ও মূল্যবান সচিত্র বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন; এই বৎসর 'ধর্মাঙ্ক' নামে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই বিশেষাঙ্কখানি প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মহীনতার ভাব প্রকট, সেইজন্য প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সন্দিহানতা জনসাধারণকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; এই অবস্থায় 'ধর্মাঙ্ক'-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য।

আলোচ্য 'বিশেষাঙ্ক'টিতে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রবক্তাগণের লেখনীমুখে বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধের মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ, মহিমা, অনুশাসন, আদর্শ প্রভৃতি যুগোপযোগী করিয়া পরিবেশিত। বহুচিত্রসমন্বিত পত্রিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

স্মরণিকা (১৯৬৬)—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদ, কার্যালয়: ১, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৪৩।

সুচিন্তিত রচনাসমৃদ্ধ স্মরণিকাটি স্বামীজী-নেতাজী সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য রচনা: 'শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ', স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', 'বিবেক-মনীষা', 'জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ', 'মহাসূর্য' (কবিতা), 'গুরুবাদ ও পুরোহিততন্ত্র', সুভাষচন্দ্রের 'রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ', 'নেতাজী সুভাষ' (কবিতা)।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষদের কর্মিবৃন্দ যে উদ্দেশ্যে 'স্মরণিকা' প্রকাশ করিয়াছেন, পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচন দেখিয়া মনে হয় সে প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ছোট ছোট ঢেউ—সঞ্জয়। প্রকাশক: শ্রীঅমিয়কান্ত দেবসিংহ, সম্বোধি প্রকাশ, টেম্পল স্ট্রীট, জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৯৭; মূল্য ২্।

ছোটদের জন্য লেখা বইটিতে প্রাকৃতিক বর্ণনার সঙ্গে কিশোরচরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটি শিশুসাহিত্যে আদরণীয় হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান : এপ্রিল, ১৯৬৪ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ পর্যন্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩তম কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইহাকে একটি সাধারণ হাসপাতালে পরিণত করা হয়। বর্তমানে ৩৫০ জন রোগী থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী রোগীকে বিনা-খরচে রাখা হয়।

এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তত্ত্বাবধান করেন।

নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সেবাপ্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিক্ষার্থিনী পরিষেবিকার সংখ্যা ছিল ১৩৩।

বাহিরের সকল রোগী এবং হাসপাতালের শতকরা ৫০ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৮,৫৮৯ (নূতন ৩১,৯৯৩); তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা ১১,৫২৯টি। অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,২৩৪; অস্ত্রচিকিৎসা ৬৯৯টি।

আলোচ্য বর্ষে চর্মচিকিৎসার জন্য নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। ক্যান্সার-চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হইতেছে।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য 'বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট' খোলা হইয়াছে; ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত।

পেরিয়ানায়কেনপালয়ম (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী (১৯৬৪-'৬৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাটি দাক্ষিণাত্যে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। কোয়েম্বাতুর হইতে ১১ মাইল দূরে উতাকামণ্ড রোডের পার্শ্বে ৪০ একর ভূমির উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে :

বহুমুখী বিদ্যালয়, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, স্বামী শিবানন্দ স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, বি. টি কলেজ, শারীর শিক্ষা কলেজ, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ, সমাজ-শিক্ষা সংগঠক শিক্ষা কেন্দ্র, গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, কৃষি শিক্ষা বিদ্যালয়, কলানিলয়ম্, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, শিল্প বিদ্যালয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২৭,০০০; ১১০ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়।

ডিসপেনসারীতে ১৬,৭৪১ জন রোগী পরীক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯,৯৫৮ জন পুরুষ, ২,১২৭ জন স্ত্রীলোক এবং ৪,৬৫৬টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক উৎসবগুলি যথাযথ মর্যাদাসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে ১০,০০০ নারায়ণের সেবা করা হয়; উৎসবে ৩০,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্ণিয়া

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৬৫ : সৎসঙ্গ ; চরম ও ন্যায়ানুমতি ; বিশ্বশান্তি ; 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধিকা শ্রীসারদাদেবী ; আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি ; পরমার্থিক সত্যের প্রতিবন্ধক—শব্দ ; মানুষের পথপ্রদর্শক সেই জীবন (খৃষ্টমাস উপলক্ষে)।

জানুআরি, ১৯৬৬ : যোগ আধ্যাত্মিক সন্ধানের তুলাদণ্ড ; যুদ্ধ না শান্তি ? নৈতিক মানের প্রয়োজনীয়তা ; স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বের প্রতি তাঁহার বাণী , ঈশ্বরই আমার শক্তি ও সঙ্গীত, কাল, মন ও নিত্যতা ; সর্বজনীন ধর্মের অর্থ কি ? ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে দর্শন কর।

মার্চ, '৬৬ : অন্ধকার নয়, জীবনের আলো ; মৃত্যুর পূর্বেই যাহা আমাদের করণীয় , ঈশ্বরানুভূতির পরাকাষ্ঠা লাভের উপায় ; শরীর ও মনকে কিরূপে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করা যায় ? চিন্তার সীমার পারে , অতীন্দ্রিয় জীবন , স্ফোটবাদ-রহস্য ; উন্নত মনের জাগরণ ; আমেরিকাকে স্বামী বিবেকানন্দ কি দান দিয়াছিলেন ?

স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্র : অধ্যক্ষ— স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য বিষয় :

জানুআরি, ১৯৬৬ : পুরাতনের বিদায় ও নূতনের অভিনন্দন ; অন্তরের শান্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় ; স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী ; বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক , মনের দুঃসহ যাতনা।

ফেব্রুআরি : নীতিপরায়ণতার তাৎপর্য কি ? যোগ—মন স্থির করিবার বিজ্ঞান ; ঈশ্বর আমার শক্তি ও সঙ্গীত ; শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

মার্চ : জাগতিক ঐশ্বর্য ও ঐশ্বরিক সম্পদ ; যোগ—ইহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ; পৃথিবীতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানোন্মেষ, ঈশ্বরদর্শনের জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা।

এতদ্ব্যতীত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কঠোপনিষদের ক্লাস লইয়াছিলেন।

উৎসব-সংবাদ

রহড়া : ৪ঠা এপ্রিল সোমবার প্রাতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন প্রভৃতি দ্বারা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচী আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে শিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। অধ্যাপক বসু তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে শিশুদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় পরিচয় এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানাচার্যকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী পুণ্যানন্দ বলেন যে, আশ্রমের ছেলেদের এই প্রদর্শনীটি শিশুর সৃজনশীল মনের পরিচয় বহন করিতেছে।

শিক্ষা ও কুটীরশিল্প প্রদর্শনীতে বালকাশ্রমের সতরটি সংস্থা যোগদান করিয়াছিল। তাছাড়া নরেন্দ্রপুর আশ্রম, ভারত সরকারের পুনর্বাসন শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগ ইউ. এস. আই. এস., ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আশুতোষ মিউজিয়মের সহযোগিতায় একটি চমৎকার শিক্ষামূলক গ্যালারি পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখার বিদ্যার্থীরা তাহাদের কক্ষগুলিতে নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ও

যন্ত্রপাতি সহ বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিল।

প্রাক্-বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিশুদের হাতের কাজ, নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলির বিভাগ পরিকল্পনা ও পরিচালনা, নিম্ন ও স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিবিধ শিক্ষামূলক মডেল, হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প ও কারুশিল্প এবং জেলা গ্রন্থাগারের রহড়া শাখা কর্তৃক পরিকল্পিত আদর্শ গ্রন্থাগারের পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রদর্শনীটি সমগ্রভাবে খুবই আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

উৎসবে কীর্তন, ভজন, নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগের তরজা এবং শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও সম্প্রদায়ের ব্যায়াম প্রদর্শন দর্শকগণের মনে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে। বিভিন্ন দিনে যাঁহাদের বক্তৃতা ও ভাষণ সুধীজনকে নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দুই লক্ষাধিক দর্শক উৎসব ও প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। ১০ই এপ্রিল রবিবার সকালে রহড়া পল্লীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর সপ্তাহব্যাপী উৎসব শেষ হয়।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত তিন দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎসবের প্রথম দিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা আশ্রমপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি এবং আশ্রমের ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্থী-হোম এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। বিকালে জনসভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীরাধেশ্যাম সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা কালে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মসমন্বয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত উদার মত ও পথ অবলম্বন করিলে বর্তমান বিশ্বের শান্তির প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করা যাইবে।

দ্বিতীয় দিন কোল মাইনস্ ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী এস. কে. সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা হয়। সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন-কাহিনী পরিবেশন প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীশ্রীমা নারীজীবনের এক মহিমময় দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার অপার করুণা ও মাতৃস্নেহে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ধন্য হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী তাঁহার ভাষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষের নব জাগৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবময় ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, তাঁহার দেহাবসানের তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহারই প্রদত্ত 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলা তথা ভারতবর্ষের নচিকেতারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

১লা মে রবিবার তৃতীয় দিনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে—স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়িয়া তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন আশ্রমের

কর্মসচিব স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণের পর শ্রীদত্ত বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভার শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাফল্যের সহিত 'নচিকেতা' নাটক মঞ্চস্থ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

বাগেরহাট : গত ২৯শে এপ্রিল বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্ম মহোৎসব মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ এবং বিশেষ পূজাহোমাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুপুরে প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। বিকালে শ্রীযুত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় আট-নয়শত বিশিষ্ট শ্রোতার উপস্থিতিতে ডা: অরুণচন্দ্র নাগ, মো: ইউসুপ আলি সেখ, নিত্যানন্দ বিশ্বাস, শ্রীপরমানন্দ রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের সম্পাদক মোবারক আলি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

সভাপতি তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করেন। সভার পর সন্ধ্যায় প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী লঙ্কাকাণ্ড পালা কীর্তন করেন।

অবৈতনিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

দেওঘর : গত ৭ই এপ্রিল বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এক-পার্শ্বে স্থানীয় শ্রমিক-সম্প্রদায়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিবেকানন্দ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই সব শিশু স্থানীয় পাশী (অনুন্নত) সম্প্রদায়-ভুক্ত, অত্যন্ত দরিদ্র। এতদিন ইহাদের পড়াশুনার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রত্যহ বিনামূল্যে দুপুরের আহার দেওয়া হয়, পোষাক, পুস্তক প্রভৃতিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মন্ত্রীমহোদয় বলেন যে সমগ্র বিহারে এই ধরনের স্কুল (যেখানে বিনামূল্যে দুপুরের আহার এবং পুস্তকাদি দেওয়া হয়) ইহাই প্রথম। মিশনের এই শুভ প্রচেষ্টাকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এইদিন মন্ত্রীমহোদয় বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি ও বায়োলজি লেবরেটরী গৃহেরও দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রচারকার্য

গত ১. ৭. ৬৫ হইতে ২৯. ১২. ৬৫ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
সনাতন ধর্ম	খার, বোম্বাই
ধর্মসমন্বয়	,, ,,
আচার্য শঙ্কর, ভগবান বুদ্ধ	বিবেকানন্দ হল
শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি	বোম্বাই
সনাতন ধর্ম	বরিষা-বেহালা, কলিকাতা
ধর্মজীবন	কলিকাতা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	ভট্টাচার্যপাড়া, হাওড়া
শিক্ষার উদ্দেশ্য	খালতলা লাইব্রেরী
ভারতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাণী	বলরাম-মন্দির, কলিকাতা
মহাপুরুষ-স্মৃতি	বালিগঞ্জ ,,
ভক্ত নাগমহাশয়	বকুলবাগান ,,
ধর্ম কি ?	সুরক্রিজ ভবন ,,
নারীজাতির আদর্শ	রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ,,
কর্মযোগ	ইছাপুর
অতীত ও বর্তমানের উপর বেদান্তের প্রভাব	দুর্গাপুর লায়নস্ ক্লাব
স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও সমাজসেবা	দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
সনাতন ধর্ম	খার আশ্রম, বোম্বাই
সনাতন ধর্ম ও দুর্গাপূজা	,, ,,
বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম	,, ,,
ভগবদ্গীতার বাণী	শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ,,
সনাতন ধর্মের দান	অনঙ্গমোহন হরিসভা
শ্রীরামকৃষ্ণ	পাঠচক্র, টালিগঞ্জ

বিষয়	স্থান
বিভিন্নধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের দান	রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিষ্কাম কর্ম	মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
শক্তিপূজা	বরিষা-বেহালা, কলিকাতা
ভারতের মহান সন্ন্যাসী	আঁটপুর, হুগলি
স্বামী প্রেমানন্দ	" "
সুধা	বণমহল, কলিকাতা
স্বামী প্রেমানন্দ	তত্ত্বমন্দির, বেলুড়
শ্রীশ্রীমা	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, দিল্লী
শ্রীশ্রীমা	" সারদা সমিতি
স্বামী প্রেমানন্দ	আঁটপুর, হুগলি
স্বামী বিবেকানন্দ	ভিজাগাপত্তন
স্বামীজীর আহ্বান	রেলওয়ে ইনস্টিট্যুট

স্বামী অন্তরাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি যে, গত ২রা মে, বেলা ৫টার সময় কলিকাতা সেবা-প্রতিষ্ঠানে স্বামী অন্তরাত্মানন্দ (কৃষ্ণন্ মহারাজ) ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ডায়াবিটিস্ ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ৩১শে মার্চ তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমের ও পরে ত্রিচুর আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কালাডি আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তাঁহার মধুর স্বভাব ও সহাস্য মুখমণ্ডল তাঁহার চিত্তপ্রসাদের পরিচয় প্রদান করিত। সকলেরই তিনি বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২রা ও ৩রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব পূজা ও শাস্ত্রপাঠাদির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কাঁদুন্দিয়া 'মায়ের মন্দিরের' সভ্যগণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে কলিকাতার 'রামকৃষ্ণ কথামৃত সঙ্ঘ'—'সুরে কথামৃত' পরিবেশন করেন। বৈকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহারাজ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুললিত ভাষণ দেন।

পরে শিবপুর কল্পনা মজলিস কর্তৃক 'হৈমবতী উমা' ও 'বীর অভিমন্যু' যাত্রাগান হয়। উৎসবের দুইদিন অন্ততঃ দশহাজার ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। প্রসাদ হাতে হাতে বিতরিত হয়।

নূতনপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব অনাড়ম্বর গ্রাম্য পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন পর্যালোচনা খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল।

বাঁখাটি শ্রীরামকৃষ্ণ জুনিয়ার হাইস্কুলে গত ২০শে চৈত্র রবিবার যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সহ প্রভাতফেরী, পূজার্চনা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং দুপুরে প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক বিবিধ বিষয়ের আলোচনা জনচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

স্বামী গদাধরানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে, এবং স্বামী চিদ্রসানন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-সংকীর্তন জনগণকে মুগ্ধ করে।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব পূজাদির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুপুরে প্রায় দুই-হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি স্বামী প্রশান্তানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীরথীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে গত ৩রা বৈশাখ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মোৎসব, কল্যাচক বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূজার্চনা, ভোগরাগ, শোভাযাত্রা, খেলাধূলা, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐদিন সন্ধ্যায় গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বদেবানন্দজীর পৌরোহিত্যে ও হেঁড়্যাচক্রের অবর পরিদর্শক শ্রীযুত বাণীকণ্ঠ মিশ্র মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। সভান্তে স্বামী নিগমাত্মানন্দ সেবাসমিতির কর্মীদের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচালিত সেবাসমিতির দুগ্ধবিতরণ ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৪ঠা বৈশাখ, সকালে ঠাকুরনগর নন্দা মহিলা বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিকট স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা ও মাতৃ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র-স্মৃতি বিদ্যানিকেতনে গত ১লা মে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পূজা, শাস্ত্রপাঠ ও ভজনের মাধ্যমে সমস্তদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে খিচুড়ি ও ফলমূল প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ও জেলা শারীর শিক্ষণ ও যুব-কল্যাণ পরিদর্শক শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শনের গূঢ়-মর্মটি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেন।

সন্ধ্যায় ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি ডিভিশন কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চিত্র এবং অন্যান্য তথ্যমূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অভিনব মোটর

স্টুটগার্টের এক মোটরগাড়ির কারখানা নূতন ধরনের একটি বাস নির্মাণ করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'রোটেল'। এই বাসে আছে ২৭ জন ট্যুরিস্টের শোবার ঘর, স্নানাগার, রান্নাঘর এবং বৈঠকখানা। ট্যুরিস্টরা কোন হোটেলে না উঠিয়া এই বাসে

বাস করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিতে পারিবে, খরচও কম পড়িবে। বর্তমানে এই বাসটি জেরুজালেম অভিমুখে ভ্রমণরত।

বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান

সম্প্রতি-প্রকাশিত ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জীতে বাহির হইয়াছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২০ কোটিরও বেশী এবং এই সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ষপঞ্জীতে দেখানো হইয়াছে যে, ১৯৬০ হইতে ১৯৬৪—এই চার বৎসরে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১'৮ ভাগ।

চীনের জনসংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬৯ কোটি। ইহার পরবর্তী স্থান ভারতের—জনসংখ্যা ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ। ইহার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন (২২ কোটি ৮০ লক্ষ) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (.৯ কোটি ২০ লক্ষ) স্থান।

এশিয়ার জনসংখ্যা ১৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ, ইওরোপের ৪৪ কোটি ১০ লক্ষ, আফ্রিকার ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ, লাটিন আমেরিকার ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ, উত্তর আমেরিকার ২১ কোটি ১০ লক্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ।

—রয়টার

পরলোকে ক্ষীরোদবালা রায়

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা ক্ষীরোদবালা র[illegible] গত ৭ই মে সকাল ৫॥ টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরে[illegible] নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যা[illegible] করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছি[illegible] ৭২ বৎসর। গত একবৎসরকাল তি[illegible] কলিকাতায় ৬-এফ্, আনন্দ পালিত রোডে[illegible] ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ সরকারের ভবনে বা[illegible] করিতেছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান সিলেটে। ১০ বৎসর বয়[illegible] তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৫ বৎসর বয়সে তি[illegible] বিধবা হন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হই[illegible] মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের দুর্লভ সঙ্গ [illegible] অসীম কৃপা লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়[illegible] ছিল। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে "কমলানেবুর দেশে[illegible] বৌমা" বলিতেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পুস্তকে (দ্বিতীয় খণ্ড) তাঁহার লেখা স্মৃতিকথা রহিয়াছে।

তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

দিব্য বাণী

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ॥ তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

—মুণ্ডকোপনিষদ্—১।১।৩-৫

গৃহস্থের অগ্রগণ্য শৌনক একদা আসি অঙ্গিরা ঋষির কাছে কন,
"কোন্ বস্তু, (কোন্ মূল উপাদান) জ্ঞাত হলে সবই হয় জানা, ভগবন্—
(যাহা কিছু বিশ্বজুড়ে রয়েছে এ সৃষ্টিমাঝে) ?" শুনিয়া অঙ্গিরা কন তাঁরে,
"ব্রহ্মবিদ্‌গণ কহে, 'পরা' ও 'অপরা' এই দুটি বিদ্যা হবে জানিবারে।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব—এ চারি বেদ, শিক্ষা কল্প আর ব্যাকরণ
নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ—এসব অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যায় হয় ব্রহ্মজ্ঞান,
(শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়) উপলব্ধি করা যায় অবিকারী নিত্য অক্ষরেরে—
সেই বিদ্যা পরা বিদ্যা (—ছাড়ায়ে বুদ্ধির সীমা দেখায় যা চরম সত্যেরে)।

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৭।১৭।১

সত্যেরে যে জানে, সেই যাহা বলে সত্য বলে। সত্যেরে না জানি সবিশেষ
সত্য নাহি কহা যায়। বিজ্ঞান—বিশেষজ্ঞান—লাভ করি তবে পারা যায়
সত্য যাহা, যথাযথ রূপে তাহা কহিবারে। (সকল কিছুর মূলদেশে
রয়েছে যে মহাসত্য, নাহি জানি সে সত্যেরে 'সত্য' বলি' যাহা বলা হয়
আপেক্ষিক সত্য মাত্র বলিয়া তাহারে জেনো, সে কভু চরম সত্য নয়।)

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন আসাম বন্যার্ত সেবাকার্য

সকলেই অবহিত আছেন, আসামের বিধ্বংসী বন্যা হাজার হাজার মানুষকে গৃহহীন ও অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে। বন্যার প্লাবন আসিয়াছে পর পর তিনবার; এখন পর্যন্ত সর্বাধিক-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির অধিকাংশ স্থলেই পৌঁছিবার কোনও উপায় নাই। শিলচর এবং করিমগঞ্জের মত সহরেও খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায় হওয়ায় সঙ্কট আরো ঘনীভূত হইয়াছে।

যে স্বল্প পরিমাণ খাদ্য এখনো পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্য এত উচ্চ যে তাহা ক্রয় করা দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের একেবারে সাধ্যাতীত। তাছাড়া বন্যার ফলে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যে কোন সময় মহামারী সুরু হইতে পারে।

বন্যায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কাছাড় জেলা; এই জেলায় অবস্থিত মিশনের করিমগঞ্জ এবং শিলচর কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি গ্রামে বিবিধ আকারে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে; বহু গ্রামে এবং শিলচর সহরে প্রয়োজনানুসারে খাদ্যদ্রব্য বা নগদ টাকা ডোল দেওয়া হইতেছে। করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে কয়েকটি গ্রাম জুড়িয়া সেখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে। বস্ত্র এবং ঔষধও বিতরিত হইতেছে।

এই সেবাকার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। খরচ করার মত যে অর্থ আমাদের ছিল, তাহা লইয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গতি সীমিত, আরব্ধ সেবাকার্য চালাইয়া যাওয়ার এবং বিস্তৃততর অঞ্চলে উহা প্রসারিত করার জন্য অবিলম্বে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এরূপ বিষম বিপদের সময় দুস্থ জনগণকে সাহায্যদানের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদাই সহৃদয় জনগণের সহায়তা পাইয়া আসিতেছে; আমরা আশা করি এই সেবাকার্য সফলতার সহিত পরিচালনার জন্য এবারেও আমরা অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্য পাইতে থাকিব।

এই সেবাকার্যের জন্য সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে:—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া

২। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম,
রহড়া, জেলা—২৪পরগনা

৩। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,
নরেন্দ্রপুর, জেলা—২৪পরগনা

৪। কার্যাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ,
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৫। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,
৫, ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

তারিখ: ১২ই জুলাই,
১৯৬৬

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস বিষয়ে ব্যাপক তদন্ত শেষ করিয়া ডক্টর কোঠারী পরিচালিত শিক্ষা কমিশন নিজ সুচিন্তিত অভিমত সমন্বিত রিপোর্ট বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরে দিয়াছেন।

সম্প্রতি এই সুদীর্ঘ রিপোর্টটির সারাংশরূপে সামান্য অংশমাত্র পত্রিকাদির মারফত পাওয়া গিয়াছে, বিস্তারিত সব কিছু এখনো জানা যায় নাই। উহাতে জানা যায়, কমিশন জোড়া-তালি দিয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সামান্য সংস্কারমাত্র করিবার চেষ্টা করেন নাই, শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষাপদ্ধতিকে ঢালিয়া সাজিতে চাহিয়াছেন, এবং উহা করিতে চাহিয়াছেন একেবারে নিম্নতম প্রাইমারী শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত, সামগ্রিক ভাবে।

স্কুল ও কলেজের বর্তমান শ্রেণীবিভাগের পুনর্বিন্যাস, ছাত্রদের আবাসস্থল হইতে শিক্ষায়তনে যাইবার সুবিধা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থা, পরিচালনাদির উন্নয়ন, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষকের বেতন প্রভৃতি বিষয়গুলি ছাড়াও শিক্ষা কমিশন আরও দুইটি বিশেষ দিকে মনোযোগ দিয়াছেন; এমন দুইটি বিষয়কে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছেন, যাহা ছাত্রগণকে শুধু সাহিত্য-গণিত-বিজ্ঞান-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানে চিন্তা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রেই মাত্র উন্নত না করিয়া সেই সঙ্গে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানকেও উন্নত করিয়া তুলিবার, এবং হৃদয়কে প্রসারিত করিবার পক্ষে সহায়ক হয়। শিক্ষা কমিশন এজন্য দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যে সহায়তার জন্য শিক্ষায় সমাজসেবাকে আবশ্যিক করিতে চাহিয়াছেন, এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সহিত ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছেন, ধর্মশিক্ষা ও ধর্মের মূল্যবোধকে সাধারণ-শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছেন। ছাত্রগণই কৃতবিদ্য হইবার পর সমাজ- ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হইবে; কাজেই শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের বাঞ্ছিত আদর্শের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে তাহাদের মনেরও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শিক্ষা কমিশন এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

এই প্রচেষ্টা খুবই মহান্ এবং অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এইটিরই এতদিন একান্ত অভাব ছিল। আশা করা যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কমিশন কর্তৃক উপদিষ্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সহিত এটিকেও (রিপোর্টের বিস্তারিত অংশে অধিক গুরুত্ব দেওয়া না থাকিলেও) একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইহাকে কার্যপরিণত করিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইবেন। এবিষয়ে দেশের শিক্ষিত জনগণের সাগ্রহ সমর্থনও একান্ত কাম্য।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের যে সারাংশটুকু জানা গিয়াছে, তাহার বিবিধ দিকগুলি লইয়া বহু শিক্ষাবিদ্, চিন্তাশীল ব্যক্তি ইতিমধ্যেই নানরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। স্কুল-কলেজের শ্রেণীর

পুনর্বিন্যাস, শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি, এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি তাঁহাদের মতামতের ন্যায় সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার সহিত ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি শিক্ষার সংযুক্তির প্রতিও তাঁহাদের মতামত বিভিন্ন ধরনের। কেহ কেহ মনে করেন সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পাদির যথাযথ শিক্ষা দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট পরিমাণ উন্নতি ঘটাইতে পারিলে তাহারই ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বাঞ্ছিত রূপ গ্রহণ করিবে; ইহার জন্য সাধারণ শিক্ষার ভিতর জোর করিয়া ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতি ঢুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাই যদি সত্য হইত তাহা হইলে বর্তমানে আমাদের দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা যে সব স্বার্থান্ধ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের জন্য ক্রমশঃ অবাঞ্ছিত পথগামী ও অবনত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত একজন ব্যক্তিকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অন্যরূপ। আবার দেখা যায়, অকল্যাণকারীদের মধ্যে যাহার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ যত বেশী সাধিত হইয়াছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অকল্যাণ ঘটাইবার শক্তি তাহার তত বেশী হওয়ায় লোকের সর্বনাশ ঘটায় সে অনেক অধিক পরিমাণে। তাছাড়া যে-আদর্শকে জাতীয় আদর্শ বলিয়া যে-দেশ গ্রহণ করে, শিক্ষার মাধ্যমে সেই আদর্শের ছাপ দেশবাসীর মনে শৈশব হইতে ফেলিবার প্রচেষ্টা সেদেশে বিপুল ফলপ্রসূ হইবার উদাহরণ বর্তমান জগতে বিরল নহে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ দেশের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর, তাহা অবশ্য অন্য প্রশ্ন। আমরা সমাজের যে রূপটিকে নিজেদের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছি, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে (শিশুকাল হইতেই) তাহার অনুকূল চিন্তার অনুপ্রবেশ ও তাহার বিরোধী চিন্তার দূরীকরণ যে ফলপ্রসূ হইবেই, তাহাতে সন্দেহের কি আছে?

স্কুল-কলেজ হইতে যে শিক্ষা এখন দেওয়া হইতেছে, কেবল তাহারই পরিধি ও গভীরতা বাড়াইয়া আমরা বিদ্যার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির ও কর্মদক্ষতার অধিকতর উৎকর্ষসাধন ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারি না। বুদ্ধিবৃত্তি চলার পথটি দেখাইতে পারে মাত্র, ইচ্ছাশক্তি পথে চলিবার শক্তি যোগায়। কিন্তু ইহাও সব নহে। পথনির্ণয়ের ব্যাপারে মানসিক প্রবণতার প্রভাব প্রধান—বুদ্ধিকে (তা যতই শাণিত ও তথ্যসমৃদ্ধই হউক না কেন) অগ্রাহ্য করে সে পদে পদে, ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করে নিজের নির্ণীত পথে। কাজেই, যে-বিদ্যার্থীরা লব্ধবিদ্য হইবার পর সমাজাদির নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে, সমাজের কল্যাণার্থে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির এবং মানসিক উৎকর্ষসাধনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ সাধারণ শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন যতখানি সম্ভব করুক, যত বেশী সম্ভব উহাকে তথ্যসমৃদ্ধ করুক, জগতের সববিধ চিন্তার সহিত ছাত্রদের পরিচিত করাইয়া দিক, জাগতিক প্রয়োজনীয় কর্মসাধনের দক্ষতা বাড়াইয়া দিক; আর সেই সঙ্গে যথার্থ কল্যাণের পথটিকে চিনিবার জন্য এবং মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ- ও দুবলতা-জনিত বাধা ঠেলিয়া সেই কল্যাণের পথে জীবনকে অগ্রসর করাইবার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে এবং হৃদয়ের শুভ মঙ্গলময় বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া বাড়াইয়া তুলুক ধর্ম ও সংস্কৃতিগত শিক্ষা।

এই সমন্বয় ছাড়া আমাদের জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। বহুপূর্বেই আমাদের ইহা করা উচিত ছিল। বর্তমানে ইহার সম্ভাবনার ক্ষীণ একটু শিখা দেখা দিয়াছে (শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সারাংশে বিষয়টিকে স্পর্শমাত্র করা হইয়াছে মনে হইল, মূল রিপোর্টে বিস্তারিত অংশে ইহার রূপদানের ব্যবস্থা কতখানি এবং কিরূপ করা হইয়াছে এখনো তাহা জানা যায় নাই), উহাকে নির্বাপিত করিবার প্রয়াস না করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া উহাকে যেন বর্ধিত-দীপ্তি ও কার্য-পরিণত করিতে প্রয়াসী হই।

শিক্ষায় ধর্মের স্থান প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মানুষের অন্তরে পূর্ব হইতে নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশের নামই শিক্ষা।" অন্যত্র আবার বলিয়াছেন, "শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে তাহাই প্রকাশ করা।" ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়াও তিনি এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনের কথাই বলিয়াছেন। আমরা সকলেই স্বরূপতঃ পূর্ণ—অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম স্বরূপ। সর্ববিধ জ্ঞান ও প্রেম এবং সর্ববিধ অস্তিত্ব যে মহাপূর্ণতায় একীভূত হইয়াছে, তাহাই আমাদের স্বরূপ, বাধা সরাইয়া আমাদের এই স্বরূপের প্রকাশের পথ অবারিত করাই শিক্ষা এবং ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য। যে দিক হইতেই হউক না কেন, মানুষের সত্যান্বেষণ-স্পৃহা এই পূর্ণত্বের লক্ষ্যেই পৌছিতে চায়—"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?"

এই পূর্ণত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বামীজী বলিয়াছেন যে, ধর্মকে বাদ দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। মানুষের স্বরূপের আবরণ অপসারণে অন্যান্য প্রয়াস অপেক্ষা ধর্ম অধিকতর সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে সমর্থ বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। ইহা যেন অন্ন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত অপর সবই ব্যঞ্জনস্থানীয়। শুধু ব্যঞ্জন খাইলে অজীর্ণতা জন্মায়; আর শুধু অন্ন আহারেও তাহাই।"

সাধারণতঃ জ্ঞানের অংশ-বিশেষের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলিয়াই, শিক্ষা বলিতে আমাদের স্বরূপের আংশিক প্রকাশের কথা ভাবি বলিয়াই, শিক্ষা ও ধর্মের মধ্যে আমরা এত পার্থক্য দেখি এবং শিক্ষায় ধর্মের স্থানের কথা ভাবিতে বেগ পাই। ইহার অপর কারণ, ধর্ম বলিতে আমরা সাধারণতঃ ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ অনুষ্ঠানগুলির কথাই ভাবি। শিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বামীজী তাই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়। তবে কি ? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তার দ্বারা কি আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না ?"—ধর্ম বলিতে এই জ্ঞানের উদ্বোধনই তাঁহার লক্ষ্য।

যতটুকুর জন্য, যে দিক হইতেই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন, "এই জ্ঞান আহরণের একটি মাত্র উপায় আছে। প্রাকৃত ব্যক্তি হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীকে পর্যন্ত ঐ একই উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একাগ্রতাই সেই উপায়।" ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তির বর্ধন এই একাগ্রতাকে এবং ধারণাশক্তিকে বর্ধিত করিয়া তোলার সহায়ক বলিয়া ধর্মলাভে এবং শিক্ষালাভেও এগুলি অনিবার্য।

এই জন্যই তিনি শিক্ষায় ধর্মের স্থান এত

উচ্চে দিয়া গিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া এদেশের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলিতে গিয়া বারে বারে জোর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্মকে সেখানে রাখিতেই হইবে—"চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস হইবে যাহার মূলমন্ত্র।"

যাহারা বিজ্ঞান পড়িতে যায়, তাহারা সকলেই আর নিউটন বা আইনষ্টাইন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞানশিক্ষা কেহ ছাড়িয়া দেয় না—যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে পারে, তাহার ততটুকু ফলই সে লাভ করে। ধর্ম বিষয়েও স্বামীজী তাহাই বলিয়াছেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাগতিক বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা করার অর্থ, অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশ-সাধনের পথে যে যতটুকু পারে অগ্রসর হউক—সে তাহার শুভ ফল পাইবেই; ইহার ফলে তাহার অন্তরস্থ শক্তির বিকাশ যতটুকু ঘটিবে, তাহাতে যে কার্যই সে করুক না কেন, তাহা আরও ভালভাবে করিতে পারিবে—"মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ, এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—এই আত্মবিদ্যার সামান্য অনুষ্ঠানেও মানুষ মহাভয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। মানুষের অন্তরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে সুরু করিয়া সব কিছুই অনায়াসে করিতে পারে।" "অতি অল্প কর্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অদ্ভুত ফল লাভ হয়; অতএব বেদান্তের আলোচনা যে যতটুকু পারে করুক। মৎস্য-জীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ মৎস্যজীবী হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে।" স্বামীজী তাই চাহিয়াছিলেন, ধর্মের ভাবগুলির সহিত বিদ্যার্থীরা পরিচিত হউক এবং প্রথম হইতেই হউক—"রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে সহজ এবং সরল ভাষায় কতকগুলি গল্পের বই সঙ্কলন করিয়া আমাদের ছেলেদের পড়িতে দিতে হইবে।"

স্বাধীন চিন্তায় নিজেকে গঠন করিবার জন্য বিদ্যার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন—"গাধাকে পিটাইয়া ঘোড়া করা যায় শুনিয়া একব্যক্তি তাহার গাধাটিকে প্রহার করিতে করিতে ঘায়েল করিয়াছিল। ঠিক এইভাবে পিটাইয়া ছাত্রদের মানুষ করার পদ্ধতিটি তুলিয়া দিতে হইবে।...চারা গাছকে যেমন বাড়ানো যায় না, শিশুকেও সেরূপ জোর করিয়া শিক্ষিত করা যায় না।" কাজটি হইল, বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়ের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী পরম কল্যাণকর যে সব চিন্তা এদেশের এবং বিদেশের মানুষ করিয়াছে, তাহা সবই বিদ্যার্থীদের নিকট পরিবেশন করিতে এবং তাহাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শিখাইতে হইবে। আমাদের জাতির (সমগ্র মানব-জাতিরই) শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি রহিয়াছে ভারতীয় ধর্মের মূল ভিত্তি বেদান্তের মধ্যে। অন্যান্য বহুবিধ চিন্তার সহিত বিদ্যার্থিগণ সেই উদার সর্বজনীন চিন্তাগুলির সহিতও যেন পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। আর তাহারা সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি কল্যাণকর তাহা বুঝিয়া সেভাবে নিজেদের গড়িয়া তুলুক—"আমার জীবনের একমাত্র সাধ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট কতগুলি মহনীয় ভাব পরিবেশনযোগ্য একটি যন্ত্র চালু করা; তাহার পর ভারতের নরনারী নিজে-দের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়িয়া তুলুক। মানব-জীবনের দুরূহ প্রশ্নাবলী লইয়া আমাদের

পূর্বপুরুষগণ এবং অন্যান্য জাতি কত কি ভাবিয়াছেন, তাহা জানা দরকার।...রাসায়নিক দ্রব্যগুলির সমাবেশ করিয়া দেওয়াই আমাদের কাজ—উহার মিশ্রণজনিত দানাবাঁধা প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী ঘটিবে।"

এই জন্যই বিশেষ করিয়া শিক্ষার সহিত ধর্মের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। নতুবা, স্বামীজীর সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যাহা ঘটিত (এখনো বহুলাংশে যাহা ঘটিতেছে), শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান শুধু নামে মাত্র নয় স্বামীজীর নির্দেশমত বেশ ভালভাবে না দিলে ভবিষ্যতেও তাহাই ঘটিতে থাকিবে—ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিরোধী কতকগুলি বিদেশাগত চিন্তার সহিতই শুধু আমাদের ছাত্রদের পরিচয় ঘটিবে, আমাদের দেশের সচ্চিন্তাগুলির সহিত পরিচিত হইয়া সবগুলি তুলনা করিয়া দেখার সুযোগ তাহারা পাইবে না, এবং তাহার ফলে 'ষোল বছরে পদার্পণের পূর্বেই কতকগুলি নেতিবাচক ভাবের সমষ্টিমাত্র' হইয়া তাহারা মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িবে—'ভালমন্দ নির্ণয় নিজের বিচার-বিবেক সহায়ে' হইবে না, 'পাশ্চাত্য যাহা ভাল বলে তাহাই ভাল বলিয়া এবং যাহা মন্দ বলে তাহাই মন্দ বলিয়া বিবেচিত' হইবে।

যে চিন্তা প্রবলতম হইয়া আজ মনুষ্যজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা জড়াত্মক ; যাহাকে আমরা মানুষের 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' বলি তাহার ঊর্ধ্বে সে চিন্তা উঠিতে চায় না। ইহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। স্বভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা আয়াসহীন ও আপাতমনোরম, কিন্তু উহা অনিবার্যভাবে মৃত্যুর পথেই টানিয়া লইয়া যায়। আজ বহিঃপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ সমস্ত শক্তিসম্পদ আমরা নিয়োজিত করিতেছি অন্তঃপ্রকৃতির, 'স্বভাবের' প্রবাহের অভিমুখে নিজেদের দ্রুততর বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিতে। আমাদের বহিঃপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হইবে, আমাদের উন্নতির না হইয়া অবনতিরই সহায়ক হইবে, যদি এখনো আমরা আমাদের চিন্তাকে দেহেন্দ্রিয়-সীমিত 'স্বভাবের' ঊর্ধ্বে প্রসারিত না করি। এরূপ করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম-শিক্ষা। অতি-আধুনিক যুক্তিজালকেও হেলায় ছিন্ন করিয়া, চিন্তাকে দেহেন্দ্রিয়সীমিত স্বভাবের বহু ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়া এখনো মানুষকে তাহার অতি-আকাঙ্ক্ষিত শান্তিধামে পৌঁছাইয়া দিতে পারে আমাদের ধর্ম-চিন্তাগুলি।

এই চিন্তাগুলি আমাদের মধ্যে অতি সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে। স্বামীজী বলিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষা আমাদের জাতির 'সংস্কারে' পরিণত হইয়াছে—সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রে মন চিন্তার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনায় সর্বভারতে সংস্কৃত-শিক্ষাও বহুদূর পর্যন্ত আবশ্যিক হইবে, অন্ততঃ পূর্বে যেরূপ ছিল, ততদূর (১০ম শ্রেণী) পর্যন্ত। তাছাড়া সংস্কৃত শিক্ষা শুধু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহকই নয়, জাতীয় সংহতিসাধনেও একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

গুরুপাদপদ্ম ভরসা

৮ই জুন, ১৮৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ৪ঠা জুনের পত্রে তুমি টাকাগুলি পাইয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ঐ দশ টাকা বিপিন জামাই দিয়াছে। নামধাম সহ টাকা কাগজে acknowledge করিবে। তোমাদের কার্যের কথা তোমরা না লিখিয়া গ্রামের লোক অথবা Govt. Officerগণ যদি লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে অধিক কাজ হইবে। তোমরা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে। Mirror ও বসুমতাতে তোমাদের কার্য-বিবরণ কিছু বাহির হইয়াছে। সেই বসুমতীখানি তোমাদের পাঠান হইয়াছে। তোমরা যে হারে চাউল দিতেছ, সেই হারে মাসে কত খরচ হয়, তাহা শীঘ্র লিখিয়া পাঠাইবে। আমরা প্রতিদিন এক মণ করিয়া চাউলের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি। টাকা ফুরাইবার ৮।১০ দিন পূর্বে এখানে খবর দিবে। টাকার জন্য কিছু ভাবিওনা। গুরুদেবের উপর নির্ভর করিয়া খুব উৎসাহের সহিত কার্য কর। এখানকার সকলের কুশল। তোমাদের কুশল সমাচার দিবে। সকলে আমাদের নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস
ব্রহ্মানন্দ

(২)

গুরবে নমঃ

২৩।৬।৯৭
আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

অদ্য তোমার এক পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম। কল্য ১০০৲ টাকার মণি-অর্ডার করিব। প্রাপ্তিমাত্রে সংবাদ দিবে। আর আমার কাছে বিশেষ কিছু টাকা নাই। তবে Brahmavadin Office হইতে শীঘ্র কিছু টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। উহা আসিলে জুলাই মাস নাগাদ পাঠাইয়া দিব। তোমরা আর একটি Centre খুলিবার কি করিতেছ? ওখান হইতে কি একটি লোক যোগাড় হয় না? নেহাত না হয়, আমাদের লিখিবে। এখান হইতেই কাহাকেও পাঠাইয়া দিব। আমি এখন এক রকম ভাল আছি। মঠের আর সকলেও ভাল আছে। তোমরা আমার ও এখানকার সকলের প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

দাস
Brahmananda

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর্ত জনগণ সঙ্গে*

স্বামী নির্বেদানন্দ

আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয়গণ তাঁর আন্তরিক নিঃস্বার্থ ভালবাসার ন্যায্য অংশ সকলেই পেয়েছিলেন ; তার বেশী আর কিছু তাঁদের চাইবার ছিল না। তবু তাঁর ভালবাসা কেবল আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে ভালবাসা উদার আকাশের মত সারা জগৎ ছেয়ে ফেলেছিল, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের, ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার করে নাই। তাঁর প্রেম অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়ত ; সে প্রবাহ হতে প্রেম-সলিল পান করার দ্বার তৃষ্ণার্ত সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে তিনি জগন্মাতার প্রকাশ দেখতে পেতেন, এবং জীব ও ঈশ্বর উভয়ের জন্যই তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার তীব্রতা ছিল সমান। কারো কষ্ট দেখলে তাঁর বুক ফেটে যেত। আসলে তিনি আর্ত জনগণের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলতেন, আর্তজনের আকুলতাকে তিনি নিজেরই আকুলতা বলে অনুভব করতেন এবং সেই আকুলতা নিয়েই তার দুঃখের প্রতিকার খুঁজতে সচেষ্ট হতেন। নিজের খাওয়ার প্রয়োজনবোধ যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ তাঁকে দেখতে হত মা-কালীর খাওয়া হল কি না, এবং চোখের সামনে ক্ষুধার্ত যারা রয়েছে, তারাও খেয়েছে কি না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বের হয়ে কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্যটন করেন ; প্রতি তীর্থেই সেখানকার দেবতা বা দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে তিনি তীর্থের মহিমার সত্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। এই তীর্থযাত্রায় পথে তিনি দেওঘর বা বৈদ্যনাথধামে যান। দেওঘর ও তার চারিদিকে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ চলেছে। সেখানকার অধিবাসী সাঁওতালরা তখন দিনের পর দিন খেতে পাচ্ছিল না ; তাদের দেহ অস্থিচর্মসার, পরনে কাপড় ছিল না বললেই চলে ; অনাহারে বহুলোক মারাও যাচ্ছিল। এ দৃশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অসহ্য ! হতভাগা দুর্ভিক্ষ-কবলিতদের পাশে গিয়ে তিনি বসে পড়লেন, নিজেকে তাদেরই মত একজন দুস্থ ভেবে অজস্রধারায় তাদের সঙ্গে কাঁদতে লাগলেন এবং তাদের এ দুর্দশার কিছু প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাদেরই মত অনশনে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হলেন। মথুরবাবু সঙ্কটে পড়লেন ; প্রচুর অর্থব্যয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করে তবে এ সঙ্কটের হাত থেকে তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনাও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখের উপযোগী। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কোন সময় মথুর বাবু তাঁর একটি তালুকে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিলেন ; সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। বৈষয়িক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, মথুরবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বোকামি করেছিলেন, এ বোকামির জন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারতও দিতে হয়েছিল। প্রজাদের তখন দুঃসময় চলেছে। পর পর দুবছর ফসল হয়নি, ফলে স্থানীয় লোকদের প্রায় অনশনের অবস্থা এসে গিয়েছিল। চারিদিকের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্মাহত হলেন, এবং তক্ষুনি মথুরবাবুকে তাদের খাওয়ানোর

---

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramkrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত।

ব্যবস্থা করতে এবং খাজনা আদায় না করে উল্টে তাদের অর্থ সাহায্য করতে বললেন। মথুরবাবুকে তিনি বোঝালেন যে, আসলে মা-কালী-ই তাঁর সম্পত্তির মালিক, তিনি তাঁর দেওয়ান মাত্র; কাজেই মায়ের প্রজাদের দুঃখ-নিবারণকল্পে মথুরের অর্থব্যয় করা উচিত; মথুরবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতই চলতে হল। প্রজাদের প্রতি জমিদারের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, নিঃসন্দিগ্ধরূপে তার একটা দৃষ্টান্ত তিনি তখন এভাবে স্থাপন করেছিলেন।

কখনো কখনো চোখের সামনে কোন হতভাগ্যকে শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর দেখলে তাঁর সমবেদনায় অতি-কাতর হৃদয়ে ও সমভাবে স্পর্শসচেতন শরীরে সে যাতনার স্পন্দন উঠতো। একবার নৌকার ওপর একটি মাঝিকে একজন লোক প্রহার করেছে দেখে সত্যিই তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন, "আমায় মেরে ফেললো, রক্ষা কর!" এবং আশ্চর্যের কথা, প্রহৃত মাঝির পিঠে যেমন কালশিরা পড়েছিল, দেখা গেল, তাঁর পিঠেও ঠিক তারই অনুরূপ দাগ পড়েছে—মাঝিকে যে মারছিল তার পাঁচটা আঙুলের মাপে। সর্বদা মহিমময় একত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি বহির্জগতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার পরিমাপ করবে কে? বাস্তবিকই এই ঘটনায় সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্যটিই মনে পড়ে, 'স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন বহু জিনিস রয়েছে, দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও যার কল্পনা করতে পারে না।'

শোকার্তদের দেখামাত্র তাঁর হৃদয় গলে যেত, তিনি নিজেই যেন তাঁদের একজন হয়ে যেতেন। এভাবে দুঃখের অংশগ্রহণের ফলেই তাঁদের হৃদয়ের ভার লাঘব হত অনেকখানি। তারপর তিনি স্নিগ্ধবাক্যে তাঁদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে চলতেন; সে বাক্যের শক্তিতে ব্যথিত চিত্তের ক্ষত যতক্ষণ না একেবারে নিরাময় হয়ে উঠত, ততক্ষণ তিনি থামতেন না।

সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার ফলে একটা নতুন দৃশ্যসম্ভারের দিকে তাঁর দৃষ্টি অবারিত হয়েছিল, সেখানে তাঁর মা-কালীকে, তাঁর আত্মীয়গণকে, দুর্গত জনগণকে, এককথায় সকলকেই তিনি সত্যের একই ভূমিতে, তার বিকাশের একই পর্যায়ে দেখতে পেতেন। বিদ্যামায়ার এইসব বিভিন্ন বিকাশগুলির প্রতি, দেব-মানব, ছোট-বড় সবকিছুর প্রতি একই অসীম প্রেম ও ভক্তির ভাব হৃদয়ে পোষণ করতেন তিনি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে জ্ঞানযোগীদের তফাৎ অনেকখানি, কারণ মায়াময় জগতের প্রতি জ্ঞানীদের বিন্দুমাত্র দরদ থাকে না; মন থেকে জগৎকে মুছে ফেলতে তাঁরা উঠে-পড়ে লেগে যান। মায়ার স্বপ্নরাজ্যে শূন্যময় ছায়ার মত যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেইসব অবাস্তব জীবের দুঃখমোচন-কল্পে মায়াকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে তাকে তাঁরা সমর্থন করবেন কিরূপে? ব্যথিতের জন্য সহানুভূতি দেখাতে গেলেই ভ্রমজ দৃশ্যের সত্যতা স্বীকার করতে হয়, তাতে অদ্বৈত সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে নিশ্চিত; কারণ সে সাধনার শিক্ষাই হচ্ছে, "পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, আর যা কিছু সবই মিথ্যা।" অদ্বৈতবাদিগণকে এ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে তুলতে হবে। এ পথের নব-দীক্ষিতেরা সেজন্য দুস্থ জনগণের দিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে রাখেন; আর মুক্ত পুরুষরা এদের অস্তিত্বই হেসে উড়িয়ে দেন, যেমন তাঁরা উড়িয়ে দেন সাকার ঈশ্বরকে, তাঁকে বালসুলভ সোনার স্বপ্ন মাত্র জ্ঞান করে। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে এ পথের মুক্তপুরুষ তোতাপুরীর হৃদয়ে জগন্মাতা সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোকসম্পাত করে

তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। ঠিক এই ভাবেই দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতি সম্বন্ধে অভূতপূর্ব শিক্ষার জ্ঞানালোক বর্ষণ করে পরবর্তী কালে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধী যুবকশিষ্য নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, জীব ও শিব অভেদ; বিশেষ নাম ও রূপের আবরণ জড়িয়ে প্রতিটি প্রাণীর ভিতরে ঈশ্বর স্বয়ং অবস্থান করছেন। নরেন্দ্রনাথ (পরজীবনে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে লোকসমাজে পরিচিত হন) গুরুকৃপায় এভাবে ভগবানের আপেক্ষিক প্রকাশের মধ্যে নিহিত এই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

দুর্গত মানবের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আবার ভক্তদের আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গীকেও ছাড়িয়ে যায়। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী উভয়বিধ ভক্তেরাই জগৎ ও তদন্তর্গত সব কিছুকেই হয় ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, আর না হয় তৎকর্তৃক অভিক্ষিপ্ত বলে গ্রহণ করেন। কাজেই এরূপ জগতের দুঃখ দেখে তাঁদের মনে ব্যথা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য করুণা-বর্ষণই হচ্ছে তাঁদের হৃদয়ের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। ভক্তিযোগের মহান প্রচারক শ্রীচৈতন্য সর্বজীবের প্রতি দয়ার ভাবকে প্রকৃত ভক্তের হৃদয়গঠনের জন্য প্রধান প্রয়োজনগুলির অন্যতম বলে প্রচার করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। একদা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন, 'জীবে দয়া করার কথা বলে সবাই! জীবই শিব; কাজেই তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের চিন্তার দুঃসাহসিকতা আসে কোথা থেকে? মনে কৃপা করার ভাব না রেখে জীবকে শিবজ্ঞানে ভক্তি করে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তার সেবায় অগ্রসর হতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে ঈশ্বরময় দেখতেন; তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দয়ার ভাব সত্যিই খাপ খায় না। দুস্থ ব্যক্তির চেয়ে নিজেকে উঁচু আসনে বসিয়ে তাকে অনুগ্রহ করার জন্য হস্তপ্রসারণ করা দেবত্বের অবমাননার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দাতার অহমিকা ত্যাগ করে ভাগ্যহীন দুস্থের বেশধারী ভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে, প্রয়োজন হলে হৃদয়ের রক্ত দিয়েও তাঁর পূজা করতে হবে।

এ যে রহস্যের এক নব দ্বারোদ্ঘাটন! আধ্যাত্মিকতা-লিপ্সুদের চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং ঈশ্বরকে সর্বভূতস্বরূপে প্রত্যক্ষ করার স্তর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দেবার জন্য ভগবৎ-উপাসনার একেবারে নতুন একটি পথ আবিষ্কৃত হয়েছে এতে; আধ্যাত্মিকতার যে ধাপে উঠলে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন হয়, তার ঠিক পরের ধাপই হচ্ছে পরব্রহ্মরূপ ভাবাতীত ভূমি। অভূতপূর্ব এবং সম্ভাবনার প্রাচুর্যে ভরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী ধর্ম-বীণার জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দুটি তারকেই এক মোচড়ে গতানুগতিক সুরের পর্দার চেয়ে অনেক উঁচু পর্দায় বেঁধে দিয়েছে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একথা যেদিন শোনেন, সেইদিনই নরেন্দ্রনাথ তাঁর এক গুরুভাইকে বলেছিলেন, 'আজ যা শুনলাম, সে কথার তাৎপর্যের কোন তুলনাই হয় না। যদি দিন আসে, এই অদ্ভুত বাণীর গভীর রহস্য একদিন সারা জগৎকে শোনাবো।' আর, এ প্রতিজ্ঞা-পালন করার জন্য বেঁচে থেকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে দুর্গত মানবকে সেবা করা রূপ নতুন অধ্যাত্ম-সাধনার প্রবর্তন জগতে করে গেছেন, এবং এই সাধন-পদ্ধতির আধ্যাত্মিক মূল্য চোখের সামনে কার্যকরী করে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশন।

খৃষ্টানদের দানধর্মের ও বৌদ্ধদের মানব-সেবাধর্মের ভাবের সঙ্গে এই ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে সেবার ভাবের মূলগত পার্থক্য অনেক। বস্তুগত দিক থেকে অবশ্য সবগুলিরই সাদৃশ্য রয়েছে। এ তিনটির মধ্যেই মানুষের দুঃখ নিবারণকল্পে সেবাকার্যের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়; এ-পর্যন্ত এগুলির ভেতর পার্থক্য আনার মত কিছুই নজরে পড়ে না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সঙ্গে, দুস্থ মানবের সেবার মাধ্যমে ভগবদর্চনার সঙ্গে, অনেকেই বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের দয়াব্রতকে গুলিয়ে ফেলেন। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের এই দয়াব্রত আধ্যাত্মিকতালিপ্সুদের সম্যক্-আচরণের একটা দিক মাত্র, নৈতিক শিক্ষার সহায়ক পদ্ধতির একটা অংশমাত্র। বৌদ্ধধর্ম তো কোনও রূপ ঈশ্বরারাধনায় বিশ্বাসই করে না, আর খৃষ্টধর্মে বলা হয়েছে, "প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসো"। খৃষ্টধর্মে 'আত্মা' বলতে কখনো ঈশ্বরকে বোঝায় না, কারণ খৃষ্টধর্ম অদ্বৈতবাদীদের মত জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের অভেদত্বে বিশ্বাসী নয়। কাজেই অপরকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখানোর জন্য খৃষ্টধর্মের এই নির্দেশ শুধু জোর দেয় অপরের দুঃখকষ্টকে নিজেরই দুঃখকষ্ট বলে ভাবার ওপর। যে দিক দিয়েই ধরা যাক না কেন, এই উভয় ধর্মের মতেই মানবসেবারূপ কার্য আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির একটি অংশমাত্র; সেখানে শুধু নৈতিক মূল্যই দেওয়া হয়েছে একে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। নিজ শিষ্য বিবেকানন্দকে যন্ত্রস্বরূপ করে তিনি ঈশ্বরারাধনার নতুন নিয়ম ও পদ্ধতির প্রবর্তন করে গেছেন। ঈশ্বরেরই পূজা করা হচ্ছে—এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব নিয়ে দুস্থ মানবের সেবা করাটা আধ্যাত্মিক সাধনার একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি, এবং দেখা গেছে এ পদ্ধতি আর কোনকিছুর অপেক্ষা না রেখেই সাধককে ঈশ্বর-উপলব্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এটি যে একটি নতুন পন্থার প্রবর্তন, এবং জগতের ধর্মসাধনার ভাণ্ডারে একটি মহামূল্য নতুন সঞ্চয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর ভিত্তিভূমি। প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজার মত মানবরূপ বিগ্রহ অবলম্বনে তাঁর সেবার মাধ্যমে মানুষ যে নিশ্চিতই ঈশ্বরলাভ করতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে একবার তাঁর একজন ভক্তকে তিনি এভাবে সাধন করতে বলেছিলেন, এবং স্বল্পকালের মধ্যেই এই অভূত-পূর্ব সাধনা অপূর্ব ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানতে পেরেছিলেন। ভক্তটি স্ত্রীলোক, মণিলাল মল্লিক নামক শ্রীরামকৃষ্ণের অতীব শ্রদ্ধাবান একজন ব্রাহ্ম ভক্তের কন্যা। ধ্যানকালে বাজে চিন্তা এসে স্ত্রীলোকটির মনের বিক্ষেপ ঘটাতো। তাঁর অসুবিধার কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন, বল্লেন যে একটি ভাইপো তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আরো বেশী করে ভালবাসতে বল্লেন, যত গভীরভাবে পারা যায় ততটা; তবে ছেলেটিকে নিজের ভাইপো না ভেবে গোপাল (বালক শ্রীকৃষ্ণ) বলে ভাবতে বল্লেন। স্ত্রীলোকটি সশ্রদ্ধ আন্তরিকতা নিয়ে এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উপদেশ মেনে চলতে লাগলেন; অচিরে তাঁর মন খুব উঁচু আধ্যাত্মিক ভাবে সমাহিত হল, চোখের সামনে ভাইপোকে জ্যোতির্ময় বাল-কৃষ্ণ মূর্তিতে রূপান্বিত হয়ে যেতে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। ভাইপোর প্রতি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী

পরিবর্তনের ফলে তিনি বহু দিব্যদর্শনের অধিকারী হয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

ঘটনাটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এতে দেখা যায়, দৃষ্টিকোণ সামান্য একটু পাল্‌টে নেবার ফলে কিভাবে মহিলাটির আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসাটুকু আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিতে রূপায়িত হয়ে তাঁকে ঈশ্বরানুভূতির রাজ্যে দ্রুত উন্নীত করেছিল। ক্লিষ্ট মানবের প্রতি পরহিতৈষীদের ভালবাসাও ঠিক এই ভাবেই শক্তিশালী আধ্যাত্মিক সাধনার রূপ নিতে পারে, একথা সহজেই বোঝা যায়। প্রিয়পাত্রকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে, এবং তাকে সেবা করার সময় 'ঈশ্বরের পূজা করছি'—এই ভাব বজায় রাখলে আত্মীয়ের প্রতি সাধারণ ভালবাসার বা পরকল্যাণ-চিকীর্ষুদের অপরের প্রতি ভালবাসার ভিতর একটা আধ্যাত্মিক মূল্য এসে যায়। শুধু মানবিকতার দিক থেকে মনে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার পুষ্টিসাধন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে এই জন্যই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'য় ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষকে ভালবাসাকে আলাদা করে দেখতে হবে আত্মীয়ের প্রতি মানুষের সাধারণ ভালবাসা থেকে, এমন কি পরহিতৈষীদের ভালবাসা থেকেও; কারণ সে সব ভালবাসায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে স্বার্থের একটু গন্ধ থেকেই যায়। তাৎপর্য ও মূল্যের দিক থেকে এই দ্বিবিধ সেবার ভেতর আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণও জনহিতকর কার্যের দুটি ভাগ করেছিলেন—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। তাঁর পরিচিত একজন ধনী ব্যক্তি, শ্রীশম্ভুচন্দ্র মল্লিক, একদিন তাঁকে বললেন যে, কয়েকটি দাতব্য কর্মানুষ্ঠানে বেশ কিছু টাকা তিনি খরচ করবেন বলে ভেবেছেন। তাঁর এই শুভ ইচ্ছায় উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিস্ময় বাড়িয়ে একটু কড়াসুরেই বললেন, 'প্রতিদানের কোনরূপ আশা মনে না রেখে এ জাতীয় কাজ যদি করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ কর্ম। কিন্তু এ ভাবে করা খুব কঠিন। যাই হোক, ক্ষণেকের জন্যও যেন ভুলো না, এসব কাজ মানুষের পূর্ণতালাভের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। ভগবানকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসা ও তাঁকে লাভ করাই হল মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। আচ্ছা, বল তো, ভগবান যদি এখন তোমায় দেখা দেন, তাহলে তার কাছে কি চাইবে? কয়েকটা হাসপাতাল আর ডিস্পেন্সারী চাইবে, না সর্বক্ষণ তাঁর দর্শন আর কৃপালাভ যাতে হয়, তাই চাইবে? ভুলে যেও না, ভগবানই সত্য, আর সব অনিত্য। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে লাভ করার জন্য সাধনায় ডুবে যাও। ভগবানকে ভুলে গিয়ে কতকগুলো দাতব্য কর্মানুষ্ঠানে জড়িয়ে যাওয়া তোমার মত লোকের শোভা পায় না।' এ কথার বিকৃত অর্থ করে প্রমাণ করা চলে না যে জনহিতকর কার্যের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের কোন দরদ ছিল না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ব্যথা তাঁর প্রাণে যতখানি সাড়া জাগিয়েছিল, বিনা-চিকিৎসায় যারা অসুখে ভুগছে তাদের জন্যও নিশ্চয়ই তিনি ব্যথিত হতেন ততখানিই। হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি কখনই ছোট করে দেখতে পারেন না। দেওঘরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার জন্য এবং তালুকের প্রজাদের দুঃখ মোচনের জন্য মথুরবাবুর কাছে তাঁর কাতর প্রার্থনা, এবং কোন গ্রামের পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য অপর একজন ভদ্রলোকের কাছে তাঁর আবেদন হতেই বোঝা যায় দুস্থ মানবের জন্য তাঁর অন্তরের বেদনা কত গভীর ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, শম্ভুবাবুর প্রতি তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরনের এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শম্ভুবাবুর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের

মন্দীভূত স্পৃহাকে সতেজ করে তোলা। স্পষ্টই বোঝা যায়, শম্ভুবাবুর অন্তরে ভগবানলাভের চেয়ে দান করার আগ্রহই তীব্রতর হয়েছিল; এবং একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ লোকে যে ভাব নিয়ে দান করে, শম্ভুবাবুর মনে এ বিষয়ে তার চেয়ে উঁচু ভাব ছিল না। কাজেই এ ধরনের সমাজসেবা নিয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবানলাভের দিকে তাঁকে দৃষ্টি ফেরাতে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব সঙ্গত কাজই করেছিলেন। শম্ভুবাবুর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে দেখেই বোধ হয় জনহিতকর কাজ থেকে ধর্মসাধনার দিকে তাঁর মতি ফিরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়োজন-বোধে তাঁকে নৈতিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। মণিলাল মল্লিকের কন্যাকে ভগবান লাভের জন্য মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার যে বিধান তিনি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে শম্ভুবাবুর ভাবানুরূপ জন-হিতকর কার্যের পার্থক্য শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নির্ণয় করতেন, তার নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ঘটনাটিতে। দুস্থ মানবের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করার—শিবজ্ঞানে জীব-সেবা করার—যে বাণী তিনি রেখে গেছেন, জন-হিতকর কাজের সাধারণ লোকপ্রিয় ভাবের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

অধিকার-ও লভি নাই

শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ঘুরিয়াছি তীর্থে তীর্থে,
পূত-নীরে করি স্নান
দেহ ও মনের ঘুচাইতে মল
ছিল মোর অভিযান!
শাস্ত্রপাঠ-ও করিয়াছি বহু,
যাগ-যজ্ঞ কি কম!
সাধুসঙ্গেও শুনিয়াছি কত
সৎকথা—দম, যম।
মনে ছিল মোর তাই—
ধর্মজগতে লভিয়াছি স্থিতি,
সংশয় কিছু নাই!

আজি দেখি হায়, তীর্থভ্রমণ
সকলি আমার ফাঁকি,
শাশ্বত, সর্বাশ্রয় যেথা
সেই তীর্থই বাকি!
মানস-তীর্থে হয় নি যে যাওয়া
ফেলে রেখে অভিমান!
অহংকারই বাড়িয়ে তুলেছি,
ভেবেছি লভিনু জ্ঞান।
আজ বুঝি মনে তাই—
ধর্মজগতে উত্তরণের
অধিকার-ও লভি নাই।

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(৩) তাপ

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কান দিয়ে আমরা শব্দ অনুভব করি, চক্ষু দিয়ে আলো অনুভব করি, আর তাপ অনুভব করি ত্বক্ দিয়ে। তাপ কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে সোজাসুজি বলা যেতে পারে, যা আমাদের ত্বকে স্পর্শানুভূতি ছাড়া অন্য ধরনের অনুভূতি আনে তাই তাপ। সূর্যকিরণে বা আগুনের ধারে বসলে আমরা এই তাপের অনুভূতি পাই। আগুনে গরম-করা কোন জিনিসকে স্পর্শ করলে বা আমাদের গায়ে গরম হাওয়া লাগলে আমরা তাপের অনুভূতি পাই। তাই বলা হয় যে, সূর্যকিরণে বা অগ্নিশিখায় তাপ আছে। আবার আগুনে গরম-করা কঠিন পদার্থে বা গরম হাওয়াতেও তাপ আছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তাপ দু-ভাবে অবস্থান করতে পারে—বস্তুকে আশ্রয় না করে, যেমন সূর্যকিরণে; বা বস্তুকে আশ্রয় করে, যেমন গরম পদার্থে। তাপ যে একধরনের শক্তি, তাও সহজেই বোঝা যায়। যেমন, আমাদের দুটো হাত ঘষলে গরম হয়ে ওঠে, ঘষার সময়ে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করা হচ্ছে এবং ব্যয়িত শক্তি হারিয়ে গিয়ে গরম হাতে তাপরূপে দেখা দিচ্ছে। আবার তাপ ব্যবহার করেও যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে—যেমন পাওয়া যায় বাষ্পীয় বা তৈলচালিত যন্ত্রে। খুব সহজ যন্ত্রও তৈরী করা যায়, যার উপরে তাপরশ্মি পড়লে যন্ত্রটির চাকা ঘুরতে থাকবে। তাপ শক্তি; আবার শব্দ এবং আলোও শক্তি। একভাবে বলা যেতে পারে—তাপ হচ্ছে শব্দ ও আলোর মাঝামাঝি একধরনের শক্তি। শব্দ বস্তু-আশ্রয়ী শক্তি; বস্তুর মাধ্যম ছাড়া শব্দের প্রকাশ নেই। আলো বস্তু-নিরালম্ব শক্তি—আলো বস্তুকে আশ্রয় না করেই প্রকাশিত হয়। বস্তুর শক্তির কোন অংশ আলোতে রূপান্তরিত হলেই সেই আলো বস্তুকে ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আলো-কে কখনই সীমিত জায়গায় বস্তুর মাধ্যমে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু তাপ শব্দের মত বস্তুকে আশ্রয় করেও থাকতে পারে, আবার আলোর মত বস্তুর আশ্রয় ছেড়েও শূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাপের দুই অবস্থা—বস্তু-আশ্রয়ী ও বস্তু-নিরালম্ব; তাই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাপশক্তিকে দেখা দরকার।

তাপশক্তি বস্তুতে সঞ্চারিত হলে প্রথমে দেখা যায় যে, বস্তুটির উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। ত্বকের সাহায্যে এই উষ্ণতার তারতম্য সহজেই অনুভব করা যায়। যদি উষ্ণতা বাড়ে তাহলে পদার্থটি গরম বলে মনে হয়, আবার উষ্ণতা কমলে ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। এই গরম ও ঠাণ্ডা অনুভূতির আসল স্বরূপ হল এই যে, গরম জিনিস থেকে তাপশক্তি আমাদের শরীরে চলে আসতে পারে এবং ঠাণ্ডা জিনিসে আমাদের শরীর থেকে তাপশক্তি চলে যেতে পারে। যে বস্তু থেকে বেশী করে তাপ আমাদের শরীরে আসে সেই বস্তু বেশী গরম মনে হয়, আবার যে বস্তুতে আমাদের শরীর থেকে বেশী করে তাপ চলে যায় সেই বস্তু বেশী ঠাণ্ডা মনে হয়। তাই বলা যেতে পারে, কোন বস্তুতে তাপশক্তি জমা করলে অন্যবস্তুতে তাপ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা তার বাড়ে—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাপমাত্রা বাড়ে।

কোন বস্তুর তাপশক্তির পরিবর্তন সামান্য পরিমাণে তার মধ্যে হলে শুধুমাত্র তাপমাত্রার পরিবর্তনই দেখা যায়। কিন্তু যদি কোন জিনিসে ক্রমান্বয়ে তাপ দেওয়া যায় তাহলে বস্তুর মধ্যে আরও বিশেষ পরিবর্তন আসে—জিনিসটির অবস্থার পরিবর্তন হয়। খুব কম তাপমাত্রায় সব বস্তুই কঠিন অবস্থায় থাকে। কঠিন অবস্থার লক্ষণ হল এই যে, কোন বলপ্রয়োগ না করলে বস্তুটির আকার ও আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। যখন কোন কঠিন জিনিসের তাপমাত্রা বাড়ানো হয় তখন দেখা যায়, প্রথমে জিনিসটির আয়তন অল্প অল্প পরিবর্তিত হতে থাকে কিন্তু তার আকার অপরিবর্তিত থাকে। একটি বিশেষ তাপমাত্রায় এলে বস্তুটির আকারও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়— এবং বস্তুটি তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরল জিনিসের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন না হলে নির্দিষ্ট আয়তন আছে। তরল জিনিসের যখন আবার তাপমাত্রা বাড়ানো যায় তখন তার আয়তন সামান্যভাবে পাল্টাতে থাকে এবং একটি দ্বিতীয় তাপমাত্রায় জিনিসটির আয়তন অনির্দিষ্ট হয়ে যায়—জিনিসটি যে পাত্রে থাকে তার আয়তনই গ্রহণ করে। এই অবস্থাকে বলা হয় বায়বীয় অবস্থা। বায়বীয় অবস্থার বস্তুতে যদি আবার তাপ দেওয়া হয় তাহলে ক্রমান্বয়ে বস্তুটির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং খুব উচ্চ তাপমাত্রায় বস্তুটি অন্য একটি অবস্থায়, চতুর্থ অবস্থায় আসে— যার নাম দেওয়া হয়েছে প্লাজমা। প্লাজমায় অণুগত সাম্য বিনিষ্ট হয় এবং অণুর কেন্দ্রীনগুলি ও ইলেকট্রনগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীনগুলিও নিজের স্বরূপ পাল্টাতে থাকে। বস্তুর এই চতুর্থ অবস্থা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে; কিন্তু সূর্যে বা অন্যান্য গ্রহে এই চতুর্থ অবস্থাই বস্তুর সাধারণ অবস্থা।

তাপশক্তি আহরণ করলে বস্তুর এই যে অবস্থার পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ করে বস্তু-আশ্রয়ী তাপশক্তির স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা হল পরমাণু। পরমাণুতে কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রন নিজেদের তড়িৎজনিত আকর্ষণের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। দুটি পরমাণুকে কাছাকাছি নিয়ে এলে ইলেকট্রনের মাধ্যমে কেন্দ্রীনদুটির মধ্যেও বন্ধনের সৃষ্টি হয়; ঠিক যেমন টেনিস বলের মাধ্যমে দুজন টেনিস খেলোয়াড়ের মধ্যে বন্ধন থাকে, যার ফলে তারা খেলার মাঠে আবদ্ধ থাকে। এই ধরনের বন্ধনের ফলেই এক বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু মিলে অণু তৈরী করে; আবার এই বন্ধনই অণুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে রেখে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে। পদার্থে যখন কোন তাপশক্তি থাকে না তখন অণুগুলির মধ্যে শুধুমাত্র তড়িৎজনিত বন্ধনই থাকে এবং সব পদার্থই কঠিন অবস্থায় থাকে। তাপশক্তি-বিহীন তাপমাত্রাকে বলা যায় শূন্য তাপমাত্রা—বায়বীয় পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই শূন্য তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড স্কেলে —২৭৩° ডিগ্রী। শূন্য তাপমাত্রার বস্তুতে অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বন্ধনযুক্ত কিন্তু স্থির থাকে। যখন এরূপ বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চারিত করা হয় তখন অণুগুলি কাঁপতে থাকে। অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা থাকে বলে সবগুলিই কাঁপতে থাকে। কিন্তু পদার্থে শব্দশক্তি যে ধরনের শৃঙ্খলাপূর্ণ কম্পনের সৃষ্টি করে, তাপের কম্পন সে ধরনের নয়। তাপশক্তির কম্পন বিশৃঙ্খল এবং অণুগুলি খেয়াল-খুশিমত বিভিন্ন দিকে কাঁপতে

থাকে। তাপশক্তির প্রভাবে পদার্থের এই কম্পন কোন সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না; কিন্তু পদার্থের তাপশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন গুণাগুণের পরিবর্তন এবং অন্যপদার্থে তাপ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতার পর্যালোচনা থেকে তাপজনিত কম্পনের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কাজেই বলা যেতে পারে পদার্থের শৃঙ্খলিত কম্পন যেমন শব্দশক্তির প্রকাশ, তেমনি কঠিন পদার্থে তাপের প্রকাশ হল অনুগুলির বিভিন্ন দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে কম্পন। প্রতিটি অণুর কম্পনের ফলে গতি-জনিত শক্তি হয় এবং দেখা যায়, সব অণুগুলির মোট কম্পন-জনিত শক্তি এবং বস্তুটির মোট তাপশক্তি সমান। যতই বস্তুর তাপশক্তি বাড়ে ততই কম্পনের বিস্তার বাড়ে। আবার যখন কোন বস্তুকে তাপশক্তিযুক্ত বস্তুর সংস্পর্শে রাখা যায় তখন দ্বিতীয় বস্তুটির কম্পন প্রথম বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে- যে বস্তুতে কম্পনের বিস্তার বেশী, অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা বা তাপমাত্রাও তার বেশী। তাপশক্তি বাড়ালে বস্তুর অণুগুলির কম্পনের বিস্তার বাড়তে থাকে, অন্য বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চারিত করার ক্ষমতাও বাড়ে এবং বস্তুটিকে আমরা গরম বলে অনুভব করি।

তাপশক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে গেলে কোন বস্তুর অণুর কম্পনের বিস্তার বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থা আসে যখন অণুগুলি তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্তত: চলতে আরম্ভ করে—কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। পদার্থের এরূপ অবস্থার নামই তরল অবস্থা। তরল পদার্থের অণুগুলির বিচরণ খুব সহজ পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে। তরল পদার্থে খুব ছোট বস্তুকণিকা ছড়িয়ে দিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই কণাগুলির ইতস্তত: বিচরণ দেখা যায়। বিজ্ঞানী ব্রাউন প্রথমে এই বিচরণ আবিষ্কার করেন; সেজন্য অণুর ইতস্তত: বিচরণের নাম হল 'ব্রাউনীয় বিচরণ'। তরল পদার্থে তাপ দিলে অণুগুলির ইতস্ততঃ বিচরণের গতিবেগ বেড়ে যায়; যতই তাপ-মাত্রা বাড়ে ততই গতিবেগ বাড়তে থাকে। এজন্য একসঙ্গে রাখা দুটি তরলপদার্থের উপরে বাইরের কোন বল কাজ না করলে পদার্থদুটি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়, আবার যদি তরল পদার্থটির এক অংশ গরম করা যায় তাহলে অণুগুলির ইতস্তত: বিচরণের জন্যই তাপশক্তি ছড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে, তরল পদার্থে তাপশক্তি প্রকাশিত হয় অণুগুলির ইতস্তত: বিচরণরূপে। এই বিচরণও কঠিন পদার্থের অণুর তাপজনিত কম্পনের মতই বিশৃঙ্খল।

তরল পদার্থের তাপমাত্রা বাড়িয়ে গেলে ইতস্তত: বিচরণশীল অণুগুলি একসময় এমন অবস্থায় এসে পৌছায় যে তাদের সমষ্টিগত বন্ধনও আর থাকে না। এই অবস্থাই হল বায়বীয় অবস্থা। বায়বীয় অবস্থায় তাপশক্তির প্রকাশ তরল অবস্থার অণুগুলির ইতস্তত: বিচরণের মতই। তবে এক্ষেত্রে অণুগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচরণ করে। যে শক্তি অণুগুলিকে পরস্পর বন্ধন করে রাখে, সে শক্তি অণুগুলির বিচরণ-জনিত শক্তির তুলনায় নগণ্য।

পদার্থের চতুর্থ অবস্থায় বা প্লাজমাতে অণু-গুলির আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের বন্ধনও ভেঙ্গে যায় এবং অণুর কিছু ইলেকট্রন কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি এবং কিছু ইলেকট্রনবিহীন অণু যার নাম দেওয়া হয়েছে আয়ন—প্লাজমায় ইতস্তত: ঘুরে বেড়ায়। চতুর্থ অবস্থার বস্তুতে

তাপের প্রকাশ তরল ও বায়বীয় অবস্থার মতই—বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন ও আয়নের ইতস্ততঃ বিচরণরূপে।

কাজেই তাপশক্তির প্রভাবে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার পর্যালোচনা থেকে বলা যেতে পারে, বস্তু-আশ্রয়ী তাপের প্রকাশ হল বস্তুর অণুগুলির গতিজনিত শক্তিরূপে। কঠিন পদার্থে এই গতি হল অণুগুলির বিভিন্ন দিকে কম্পন এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থে বা প্লাজমায় গতি হল অণুগুলির বা মুক্ত ইলেকট্রন ও আয়নের ইতস্ততঃ বিচরণ।

বস্তু-নিরালম্ব বা বিকীর্ণ তাপের প্রকাশ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের; সূর্যকিরণে এই বিকীর্ণ তাপ আছে, আবার গরম জিনিস থেকেও বিকীর্ণ তাপ পাওয়া যায়। এই তাপের গুণাগুণ সব দিক দিয়েই আলোর অনুরূপ। অ-স্বচ্ছ পদার্থ বিকীর্ণ তাপকে আটকে দেয়। আলোর মতই এই তাপ প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হয়। শোনা যায় বহুযুগ আগেই আর্কিমিডিস অবতল দর্পণ ব্যবহার করে সূর্য-কিরণের তাপ দূরবর্তী জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে শত্রুপক্ষের জাহাজে আগুন ধরিয়ে নিজের দেশকে রক্ষা করেছিলেন। লেন্স ব্যবহার করে যেমন আলো-কে কেন্দ্রীভূত করা যায়, তেমনি বিকীর্ণ তাপকেও কেন্দ্রীভূত করা যায়। লেন্স ব্যবহার করে এমনি কেন্দ্রীভূত তাপ দিয়ে আগুন জ্বালানো তো আমাদের খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আলো ও বিকীর্ণ তাপের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। আলোর মতই তাই এই তাপকেও তরঙ্গ বলা যেতে পারে। তাপ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও মাপা যায় এবং মাপলে দেখা যায়, তাপ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে সাধারণতঃ বেশী। আলোর রং পাল্টালে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও পরিবর্তিত হতে থাকে। বেগুনী থেকে যতই লালের দিকে যাওয়া যায় ততই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। যখন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়েও বড় হয় তখন আলো আর দেখা যায় না—ঐ আলোই তাপ বলে অনুভূত হয়। লাল বা হলুদ রং-এর আলো দেখা যায়, আবার তাপের অনুভূতিও এনে দেয়। এরা ঠিক যেন আলো ও তাপের প্রত্যন্ত সীমায় দাঁড়িয়ে। আমাদের অনুভূতির দিক দিয়ে এদের আলোও বলা যেতে পারে আবার তাপও বলা যেতে পারে। তাই বিকীর্ণ তাপকে আলোক-তরঙ্গেরই অন্য রূপ বলে ভাবা যেতে পারে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায়—বিকীর্ণ তাপ, আলো ও বেতারতরঙ্গ একই ধরনের শক্তি এবং বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গেরই বিভিন্ন রূপ। তাই বিকীর্ণ তাপকে ভাবা যেতে পারে এক ধরনের বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেতারতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট।

প্রত্যেক পদার্থকেই গরম করলে এই বিকীর্ণ তাপ সৃষ্টি হয়। পদার্থে অণুগুলির গতিজনিত শক্তিরূপে যে তাপশক্তির প্রকাশ তারই কিছু অংশ এই বিকীর্ণ তাপ হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পদার্থের তাপমাত্রা যতই বাড়তে থাকে ততই বিকীর্ণ তাপের পরিমাণও বাড়ে। এভাবে বিকীর্ণ তাপে সব-রকমের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তাপই থাকে। কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এক বিশেষ তাপমাত্রায় কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে যে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হয় তার একটি বিশেষ নিয়ম আছে। এই নিয়ম বুঝতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা তাপ-তরঙ্গের আর একটি বৈজ্ঞানিক গুণের পরিচয় পেলেন। দেখা গেল, তরঙ্গের মতই তাপ প্রতিনিয়ত বিকীর্ণ হচ্ছে—একথা ধরে নিলে ঐ নিয়মটির

ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক এক যুগান্তকারী অনুমান থেকে নিয়মটির এক সুষ্ঠু ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। তিনি অনুমান করেন যে, তাপ যখন বিকীর্ণ হয় তখন ঠিক যেন কণার মত বিক্ষিপ্ত হয়। কণাগুলির শক্তি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে। প্ল্যাঙ্কের এই মতবাদ পরীক্ষার দ্বারা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। তাই বর্তমানে বিকীর্ণ তাপের এক দ্বৈত-সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। এক সত্তা হল এর তরঙ্গ-স্বরূপ এবং দ্বিতীয় সত্তা হল কণা-স্বরূপ। তাপ বিকীর্ণ হয় কণা-রূপে কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে তরঙ্গ-রূপে। এই আপাতবিরোধী দুই সত্তা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না—কিন্তু এই অসঙ্গতিই প্রকৃতির এক খেয়াল। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই অসঙ্গতির মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পান নি এবং অসঙ্গতিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

তাপ নিয়ে পর্যালোচনা করে তাপের স্বরূপ সম্পর্কে যা জানা গেছে তা একসঙ্গে করলে দাঁড়ায় অনেকটা এ-রকমের: তাপ এক ধরনের শক্তি—যখন বস্তুকে আশ্রয় করে তখন বস্তুকণাগুলির বিশৃঙ্খল গতিজনিত শক্তিরূপেই প্রকাশিত হয়, আবার যখন বস্তুর বাইরে থাকে তখন আলোকতরঙ্গের অনুরূপ তরঙ্গ ও কণার দ্বৈতসত্তা নিয়ে প্রকাশিত হয়। আবার এও বলা যায়, তাপশক্তি বস্তুর সদা-বিদ্যমান অংশ—শুধুমাত্র শূন্য তাপমাত্রায় বস্তু থাকলেই বস্তুর সঙ্গে কোন তাপশক্তি থাকে না। কিন্তু শূন্য তাপমাত্রায় কোন বস্তুকে এখনও নেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই বলা যেতে পারে, তাপশক্তিবিহীন বস্তুর কোন অবস্থান নেই। আবার সব শক্তির মতই তাপশক্তিও অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

সূর্য

শ্রীনবকুমার চৌধুরী

নিবিড় তিমিরে পথ হারাইয়া
অন্ধ আজিকে যাত্রী,
কোথা রে আলোক-উজ্জ্বল পথ,
এ যে ঘোর অমারাত্রি।
হৃদয়-তটিনী সাগরের সনে
ছুটিয়া মিশিতে চায়,
কেহ কি দিবে না বাধা সরাইয়া,
ডাকিবে না ইসারায়!
তুমি কি আসিয়া এ মন-মুকুরে
উদিবে না, সুন্দর,
আঁধার কুটীর আলোকে পূরিতে,
আসিবে না, মনোহর!

সীমার মাঝারে ধরা দাও আসি
তুমি যে গো সীমাহীন,
রূপের মাঝারে রূপাতীত তুমি
জাগিছ রাত্রিদিন।
বিশ্বে আজিও ধ্বনিছে তোমার
বজ্রকণ্ঠ-বাণী,
উড়িছে ত্যাগ ও সেবার প্রতীক
গেরুয়া বসনখানি।
ক্লৈব্য ঘুচায়ে দৈন্য মুছায়ে
জাগায়ে দৃপ্ত ছন্দ,
এস মোর হৃদিপদ্মে দেবতা,
সূর্য বিবেকানন্দ!

রাজস্থানের মেলা উৎসব ও ব্রত পার্বণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাখী পূর্ণিমার আগের শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়ায় একটি খুব বড় মেলা হয়। এটির নাম হল 'তীজের' মেলা বা 'তীজগঙ্গোর' মেলা। এটিকে 'হরিয়ালীকী তীজ' বলা হয়। অন্য 'তীজ' মেলাটি হল 'বাসন্তী তীজ'। এই তৃতীয়া বা তীজটি শ্রাবণ মাসের সবুজ শস্যময় দিনে হয় বলেই 'হরিয়ালীকী' তৃতীয়া বা 'তীজ' নামে অভিহিত। এই তৃতীয়াটি 'পুণ্যাহ' হিসেবেও ওদেশে প্রচলিত আছে নতুনখাতা, গৃহপ্রবেশ, হলকর্ষণ প্রভৃতিতে।

এর কাহিনী হল: সত্যযুগে সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করার পর আবার জন্মান্তরে শিবকে লাভ করার জন্য অনেক তপস্যা করেন। তপস্যাশেষে হিমালয়ের কন্যা উমারূপে জন্ম নেন। আর এই তৃতীয়ার দিন তাঁদের পুনর্মিলন হয়। সেই হিসাবে এটি ভারি একটি পুণ্যতিথি রাজস্থানী মেয়েদের কাছে। কুমারী বিবাহিতা সকলেই গঙ্গোর পূজা ও ব্রত করেন। রাজাদেরও এই গণগৌরী বা গৌরী-দেবী বিশেষ উপাস্য। উদয়পুরে ও অন্যান্য রাজ্যেও এই মেলা ও পূজা হয় বটে কিন্তু জয়পুরের এই গঙ্গোর মেলায় যেমন গণগৌরী মূর্তি গঠিত হয় আর মণিমুক্তা সোনাদানায় সাজানো হয়, তেমন বড় অন্যত্র হয় না, লোকে বলে।

মেলাটির নাম হল 'তীজগঙ্গোর' মেলা। ঘরে ঘরে, বড় ঘরে, দেবালয়ে প্রায় সর্বত্রই গৌরীমূর্তি গড়ানো আর চমৎকার করে সাজানো হয়। তাঁরা ঘরেই থাকেন। শোভাযাত্রায় বেরোন না।

কিন্তু রাজার প্রাসাদের পূজিতা গঙ্গোর বা গৌরীদেবী এই মেলায় শোভাযাত্রায় স্বর্ণ-খচিত তাঞ্জামে চড়ে বেরোন। সেদিন রাজাও বেরোন আর একটি তাঞ্জামে (পালকি-জাতীয় যান)।

এই দিনের মেলায় খুব বড় শোভাযাত্রা বেরোয়—রাজকীয় চতুরঙ্গ বাহিনীর হাতি, ঘোড়া, রথ, গাড়ী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য। রাজার নিজস্ব ও প্রিয় ঘোড়া, হাতি, উট, রথ—আলাদা সাজে বেরুত।

শোভাযাত্রা সুরু হয় (গণগৌরী) 'গঙ্গোর দরওয়াজা' থেকে। একেবারে পুরোনো আমলের বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যাতায়াতের নির্দিষ্ট তোরণদ্বার সেটি। বরযাত্রা বিয়ে উৎসব—রাজপ্রাসাদের সব মেলার শোভা-যাত্রার ঐটিই শুভযাত্রা-তোরণপথ। পাশেই ঐতিহাসিক প্রাসাদ 'হাওয়া মহল'।

তার বাঁদিকে চলে গেছে অম্বর প্রাসাদের পথ।

ডানদিকে শোভাযাত্রা আসবে কিষণপোল বাজারের দিকে।

চারদিকের প্রশস্ত পথ, ফুটপাথ, বাড়ী, বাড়ীর ছাত, সিঁড়ি, মন্দির, দেবালয়ের সিঁড়ি, প্রাঙ্গণ নানা রংয়ের নানা সাজে সজ্জিত নরনারীতে, শিশু-বালক-বালিকাতে ঝলমল করত। তার মাঝে দোকান-পসারে মাটি-পাথর-কাঠের পিতলের চন্দনকাঠের খেলনা-পুতুলের সমারোহময় সমাবেশ হত।

আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনের মাঝ থেকে মেয়েদের কণ্ঠের গ্রাম্যসঙ্গীতে পথ মুখর। বাঁশী,

মালা, আলো, ফুল, খাবার, বরফ, কুল্পী বরফ, জল, সুখাদ্য-কুখাদ্য খাবারের দোকানে; ফেরীওয়ালা চারদিকের জনতার মাঝে। বেশীর ভাগই গ্রামের জনতা। গান গাইবে, জিনিস কিনবে। দেখাসাক্ষাৎ করবে। রাতে ফিরবে কাছে গ্রাম হলে। নইলে পথের ধারেই রকে রাত কাটিবে।

প্রতি মেলাতেই পুতুলের বিশেষত্ব থাকে। এ মেলায় পুতুলের বিশেষত্ব হল গৌরী মূর্তি অর্থাৎ 'গঙ্গোর' মূর্তি। ছোট বড় মাঝারি দেবী-মূর্তি, মাটিতে রংয়ের বসনে ভূষণে সজ্জিত হাত-দুখানি প্রসারিত; লাল রংয়ের মাটির ঘাগরা জামা ওড়নায়, মাটির নানা অলঙ্কারে সাজানো গড়ানো মূর্তিগুলি।

লোকে সকলেই একটি দুটি কিনত। আমাদের সরস্বতী লক্ষ্মী প্রতিমা কেনার মত। এর সঙ্গে থাকত শেঠ-শেঠানী মূর্তি। এটি যেন 'ভাঁড়ামি' বা কৌতুকের পুতুলবিশেষ। শোভাযাত্রার সঙ্গে প্রকাণ্ড, প্রমাণের চেয়ে বড় শেঠ-শেঠানী মূর্তি বেরুনোর রেওয়াজ ছিল। পায়ের তলায় চাকাওয়ালা কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো মূর্তিগুলি।

মেলার প্রাঙ্গণ হল বড় বড় রাজপথ। শ্রীজীর (মহারাজা) প্রাসাদ-নগরীর (দুর্গের মত) ভিতর থেকে বেলা ৪টা নাগাদ ভোঁ ভোঁ শব্দে ভেঁপু বেজে উঠত। আর দেখা যেত গণগৌরী-তোরণদ্বার থেকে লাল জামা উর্দী পরা, পেতলের মোটা বাঁশী ঝকঝকে ভেঁপু হাতে নকীব, দৌবারিক, চোপদারদের দল বেরিয়ে আসছে লাঠিসোঁটা বাজনাসহ। অর্থাৎ মেলার শোভা-যাত্রা সুরু হচ্ছে।

ঠিক প্রথমে যে কোন্ বাহিনী—চতুরঙ্গ (চার অঙ্গ) বাহিনীর কারা বেরুত ঠিক মনে নেই আর। ৬০ বছরেরও আগের কথা সে।

মনে হয় প্রথমে রাজ-গোশালার সুসজ্জিত বলীবর্দ ও গরুর দল বেরুত। লাল নীল রংয়ের শিং, গলায় রঙীন পাহাড়ী 'কটেলা'-পাথরের মালা দোলানো, গায়ে লাল নীল কারু-কাজ করা বনাতের আবরণী ঝোলানো রথের গরু বলদ, 'শন্‌গড' (শকটের)-বাহী বলদও গাড়ীতে জোতা। আবার শুধু সুসজ্জিত গোধনও বেরুত—সারি সারি প্রায় পাঁচ-সাতশো জোড়ায় জোড়ায় করে।

এর পরে রাজকীয় অশ্ব। রাজার বিশেষ প্রিয় 'পেয়ারের' ঘোড়া, কালো সাদা লাল উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া, নানা দেশের বিখ্যাত অশ্বশ্রেণী। নানা নামধারী—বাজিবাজ, সুন্দর, পিয়ারা, রাজা, রানী, বীরবর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত তারা।

তাদেরও গলায় কটেলা-পাথরের মালা। চোখে ঝকঝকে পিতলের ঠুলি। মাথায় পালকের সাজ। গায়ে সুদৃশ্য চকচকে চামড়ার জিন, ঝকঝকে পিতলের রেকাব দুপাশে। পায়ে পিতলের নূপুর। রাজার নিজস্ব ঘোড়া, কাজেই পিঠখানি আরো সুসজ্জিত—অহঙ্কত সহিসের সারি নিয়ে তারাও গর্বিত ছন্দে মদমত্ত চালে কদমে কদমে চলত। ছোটরা, আমরা, বারে বারে তাদের গুনেও কখনো শেষ করতে পারি নি। পাঁচশোর বেশী তো কম নয়।

তার পরে উষ্ট্রবাহিনীর আগমন। মরু-পর্বতের দেশের কষ্টসহিষ্ণু যানবাহন-সম্পদ তারা। তাদেরও কম আদর নয় রাজোয়াড়ার রাজ্য-সমূহে। ধূ-ধূ বালির মরুসমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ জনহীন মরুপথ; সেখানে তাদের মত মাথায় রোদ্দুর পায়ে উত্তপ্ত বালি নিয়ে পথ চলার সাধ্য হাতি ঘোড়া রথ গরুর গাড়ীর কারুর নেই। পা গরমে পুড়বে। অন্য জন্তু তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠবে। চলতে চলতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন

হয়ে মারা যাবে অন্য জন্তুরা। উটের তা হয় না। সেইজন্য মরুদেশে, গরম দেশে উটের ভারি সমাদর। আরব, মিশর, কাবুল, রাজস্থান সর্বত্র উটের ভারি সম্মান ও কদর। উটের কুঁজের উপরে হাওদাও থাকে হাতির হাওদার মত। তবে হাতির মত স্নিগ্ধ মাংসল স্থূল শরীর তো উটের নয়, কাজেই তার পিঠে যাত্রীদের বসার আরাম নেই, কিন্তু দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রমের নিশ্চয়তা আছে।

এই উষ্ট্রবাহিনীও সংখ্যায় কম নয়। এরাও পাথরের মালার আভরণ, রঙীন বনাতের আবরণে সজ্জিত। প্রায় ৬০০-৭০০। বেশীও হয়ত ছিল।

অতঃপর বেরত হাতির দল। প্রায় তিন-চার শো তো বটেই। ছোট-বড় কালো-কালো, গয়ার দিকের পাহাড়ের মত, শ্রাবণের আকাশের ঘন কালো মেঘের মত, ছোট বড় নানা আকারের হাতি সারি সারি বেরুত। কারুর নাম গজরাজ, গজরানী, গজমোহর, গজবীর। যত গহনা তত আদর। কুলোর মত কানদুটি। নানা রংয়ে চিত্রিত। কপালে পিতলের কপাল-পাটী পরা, গায়ে ঝলমলে লাল নীল রংয়ের কিংখাবের উত্তরীয়, আবরণী, গলায় মালা, দাঁতে সোনার বা পিতলের বালা পরানো। পিঠের ওপর বড়সড় সুন্দর হাওদা। তাতে বিশেষ আরোহী—রাজ-বংশের হলে বসে থাকতে দেখা যেত। রাজার হাতি হলে হাওদা খালি থাকত, শুধু 'অঙ্কুশ' হাতে মাহুতই বসে থাকত মাথার পিছনে ঘাড়ের ওপর। সোনার বালা পরা দাঁতের মাঝখানে কালো শুঁড়টি দোলাতে দোলাতে, শরীরের তুলনায় ছোট্ট ছোট্ট দুটি সন্দিগ্ধ চোখে জনতার দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে তারা চলে যেতে থাকত।

কখনো কখনো একটি দুটি হস্তিশাবকও দেখা যেত গজজননীর পাশে। সেদিন দর্শকদের কি উল্লাস! শাবকটি ঠিক মায়ের পাশে পাশে তার জননীর কোমর অবধি উঁচু শরীরটি আর দেড়হাত লম্বা কালো নতুন কচি স্নিগ্ধ শুঁড়টি দুলিয়ে দুলিয়ে দৌড়ত। কিন্তু মাকে ছেড়ে এক পা এগিয়ে যেতনা।

শুনেছিলাম, সেই সময়ের কিছু দিন আগে লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে দিল্লী দরবার হয়, তাতে জয়পুরের রাজার প্রায় সব হাতিগুলিই দরবারের শোভা আর আড়ম্বর বাড়ানোর জন্য চেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে নাকি পথের কষ্টে ও অযত্নে রাজার পিলখানার (হস্তিশালার) ৫০।৬০টি উৎকৃষ্ট হাতির মৃত্যু হয়। নইলে নাকি আরো বেশী গজ-সম্পদ জয়পুর রাজার ছিল। রাজার মনেমনে খুব রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশ করার উপায় ছিলনা। লাট সাহেব চেয়েছেন—দিল্লী দরবারের রাজভক্তির সমারোহের ব্যাপারের কাল সেটা। ক্ষতির ক্ষোভটা মন্ত্রী ও সদারদের মধ্যেই সঙ্গোপন রইল। আমরা ছোট ছিলাম, বাড়ীর গুরুজনদের কাছে গল্প শুনি তখন।

দেখতাম, ঘোড়াদের গরুদের এই সব মানুষিক জাঁকজমক আড়ম্বরে যেন কোন বিরাগ বা আপত্তি থাকত না। ঘোড়ারা গর্বিত চালে চলত খুশী মনেই, কাপড়-গহনাপরা শিশুর মত। গরুদের ওসব বালাই নেই। তারা নিরীহ শোভাযাত্রী মাত্র। কিন্তু হাতিদের যেন ঐ লোকজন আলো বাঁশীর সমারোহ পছন্দ হতনা। তারা ছোট্ট ছোট্ট চোখে কেবলি সন্দিগ্ধ হয়ে চারিদিকে চাইত।

এরপরে পদাতিক সৈন্যের দল। খাকির পোষাক, কালো নীল পোষাক—কুর্তা পাজামা সৈনিক-শিরস্ত্রাণ, টুপী পাগড়ী শোভিত; পায়ে

পরা খাকির ও চামড়ার, হাতে বন্দুক ও সঙ্গীন। বর্শাধারী। নানা নাম নানা বেশ ধারী সেনানীর শোভাযাত্রা। কিছু অশ্বারোহীও দেখা যেত আগে পরে।

এ-দলও শেষ হয়ে যায়। তখন আসত বিশেষ পর্বদিনে কিংবা উৎসবে ব্যবহৃত স্বর্ণময় একটি চার ঘোড়ার গাড়ী; স্বর্ণময় মীনাকরা সোনার পাত-মোড়া তাঞ্জাম দু-একটি। লাল রংয়ের ঘেরাটোপঢাকা বলীবর্দবাহিত মহাভারতের ছবির মত দেখতে কয়েকটি রথ। বলদে-টানা গাড়ী 'বহলী'—একাসন গদীপাতা ছোট একা গাড়ীর মত গরুর গাড়ী। ('বয়েলী' বলদে-টানা)

এর পর সহসা আলো, ব্যাণ্ডের বাজনা, বাঁশী-সানাইয়ের মাঝে এসে পড়ে 'গঙ্গোর' বা 'গৌরী' দেবীর চতুর্দোলা, বাহক মানুষদের কাধে। ইনি রাজার 'লাল্ গৌরী'। প্রাসাদ-বাসিনী দেবী গৌরী। অপূর্ব সুন্দরী প্রমাণ-আকার গৌরী প্রতিমা। রং-এ বসনে ভূষণে সমুজ্জ্বল দেবী-মূর্তি। অঙ্গের সব গহনাই সোনা-হীরা-মুক্তার। গহনার যেন সীমা নেই। সব স্বদেশী অলঙ্কার—কঙ্কণ, পৈঁছা, গোড়, রতনচুড়, তাবিজ, বাজুবন্দ, জশম, সাতলহরী, সরস্বতী হার, কণ্ঠশ্রী, মুকুট; কর্ণভূষণ বা সিঁথি, কপালপাটী, বোরলা, ছোট কুণ্ডল সিঁথির (সধবার গহনা); কোমরের চন্দ্রহার, গোঠ, মেখলা; চরণে চরণপদ্ম, মল, পাইজোর, মুরাটা, আরো অসংখ্য নাম-না-জানা গহনায় ঝলমল, ঘাগরা-লুগড়ী (ওড়না)-কাচুলী শোভিত দেবীমূর্তি। অনেকটা আমাদের সরস্বতী প্রতিমার মত ধরন। শুভ্র গৌরবর্ণা। দুর্গা বা লক্ষ্মী প্রতিমার মত হরিতাল-বর্ণা নন। প্রমাণ আকারের প্রতিমার দুপাশে চমৎকার সুন্দরী মানবী দুই সখী চামর দোলাত। তাদেরও রূপের, বসন-ভূষণের শোভার সীমা নেই যেন।

মেলাভরে নারীকণ্ঠের সমবেত মঙ্গল সঙ্গীত, গ্রাম-সঙ্গীত শোনা যেত। আর পুরুষের জয়ধ্বনি মাঝে মাঝে।

তার পরই পিছনে পিছনে আসত রাজার সোনার তাঞ্জাম।

সঙ্গেসঙ্গে রাজ-স্তুতিগান ও হুজুরসাহেবের জয়ধ্বনিতে মেলা মুখর হয়ে উঠত। গরম কাল। রাজার পরিধানে পাতলা হালকা রঙীন জামা ধুতি, মাথায় পাগড়ী হীরা মুক্তা সোনা খচিত। গলায় মতির মালা, কানে সোনার ফুল বা কুণ্ডল, হাতে হীরার বালা, পায়ে সোনার মল (কড়া)। পিছনে নানা সম্রান্ত ঠাকুর-সামন্তসদারদের গাড়ীঘোড়া যান-বাহন এসে শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ হত। সেপাই-শান্ত্রী সহ গঙ্গোর ও রাজা বেরিয়ে যাবার পরই মেলার পিছন ভাঙতে সুরু হত।

মেলা এবার সচল হয়ে উঠত 'ত্রিপোলিয়ার' রাজপথে। সেখানে অন্য তোরণ 'কিষণপোল', বাজারের তোরণ দিয়ে অফিসপথে প্রতিমা-শোভাযাত্রা সহ রাজা প্রাসাদে ফিরে যাবেন। শোভাযাত্রার চতুরঙ্গবাহিনী, মানুষ, উৎসবের অঙ্গ আলো পুতুল বাজনা নাগরদোলা, খাদ্য-বাজার বেরিয়ে এসে ফিরে যেতে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী সময় লাগত। রাত্রি ৯টার পর তবে পথ হালকা হত। রাত্রে সেদিন গঙ্গোর দরবার। সকল সদার সামন্ত ঠাকুর (জমিদার), লোকেরা লাল পোষাক পরবেন, চোগা চাপকান পাগড়ী জুতা মোজা সব রক্তবর্ণ পরতে হবে। রাত্রে 'নজর' সভা। তারপর উৎসব সমাপ্ত। আমরা মেয়েরা কিন্তু এই রাজসভাটা কখনো দেখিনি। জানিও না কেমন বা কোথায়। রক্তবস্ত্র-পরা শত শত রাজপুরুষ—তাঁদের

পদানুসারে নজর। সভা দেখার সৌভাগ্য যে সেকালের মেয়েদের ছিল না!

এখন ঘরোয়া গৌরী বা গঙ্গোর দেবীর কথা একটু বলি। শেঠ বণিক বড় ঠাকুর জমিদারের ঘরে, লোকদের ঘরে ঘরে, গোবিন্দজীর গোস্বামী-দের ঘরেও এই গৌরী প্রতিমা আসতেন এবং পূজিত হতেন। মেলাতেও ছোট বড় নানা আকারের প্রতিমা দেখতে পাওয়া যেত, আগেই বলেছি। আমাদের রথযাত্রার মেলায় জগন্নাথের মত, সরস্বতীপূজার সময়ের প্রতিমার মত প্রতিমা সাধারণ লোকেরাও পূজা করতেন।

গোবিন্দজীর গোস্বামীদের বাড়ীতে গঙ্গোর প্রতিমা আছেন। চমৎকার উজ্জ্বলবসনা গৌরীদেবী। ওদেশের প্রথা হল সন্ধ্যার পূজার পর রাত্রে একলা ঘরে কুমারী মেয়েরা সকলে গৌরীদেবীর কাছে নানা কামনা জানিয়ে বর চেয়ে আসবেন। গোসাইবাড়ীর মেয়েদের, বিবাহিতা এবং কুমারীদের তো নিশ্চয়ই, বর্ষীয়সী-দের অন্তরালে, অবশ্য তাদের উপদেশ-নির্দেশ অনুসারেই— মেলার অবসানে রাত্রে গঙ্গোর মাতা পার্বতীদেবীর ঘরে তার কানে কানে 'মনের কথা'র মানসিক জানানো নিয়ম, কখনো একা, কখনো সখী-সহচরী-জন সহ। কৌতুকে আনন্দে সেই বরপ্রার্থনা শেষ হত অনেক রাত্রে। যাদের ঘরে 'গঙ্গোর' দেবী আসেন না বা থাকেন না, তারাও প্রতিবেশীর ঘরে এসে 'অঞ্জলি' দেবার মত, বরকামনা প্রার্থনা জানিয়ে যেত।

প্রজাদের দেবতাদর্শন, রাজদর্শন, পুণ্যসঞ্চয়, হাটবাজার করা, আমোদ-প্রমোদ করা; শিশু ও ছোটদের মেলা দেখা, পুতুল খেলনা বাঁশী কেনা, 'বুড়ীর চুল' মালাই বরফ খাওয়া, গুলাবী রেউড়ী ভক্ষণ; এই দিনের বিশেষ খাদ্য 'ঘিয়োর' বা অন্য বড়দের 'খেয়োর' কেনা এইসব হয়ে গেলে এক গাদা মাটির কাঠের পুতুল পরমযত্নে বুকে করে নিয়ে মেলা দেখা শেষ হত। গাড়ীভরা সম্পন্ন ঘরের বালকবালিকা আর হাঁটা পথের গ্রামের শিশুসংঘ পিতামাতার হাত ধরে কাঁধে চড়ে খিদেয় ক্লান্ত, ঘুমে অবসন্ন চোখে ঢুলতে ঢুলতে বাড়ী ফিরত। গাড়ীর আরোহীদের ভাবনা—পুতুলগুলি যেন না ভাঙে ঘুম-চোখের ঠেলাঠেলিতে— ফানুস পাখা যেন না ছেঁড়ে; তবু ভাঙত, ছিঁড়তও। মাটির পশুপাখীর অঙ্গহানি ঘটত। তখন ঘুমভাঙা চোখে তুমুল কলরব কোলাহল কলহ অশ্রুপাত, দাদা-দিদিদের ধমক ও সান্ত্বনা, 'আবার পরের মেলায় পুতুল কেনা যাবে' আশ্বাস ও দুঃখ নিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত চারটা হয়ে যেত। যদিও আবার পরবর্তী গঙ্গোর মেলা পরের বছর, এবং সব মেলায় সব পুতুল গড়ানোর রেওয়াজও সে দেশে ছিল না। আর পথভরে মেলা-শেষের পথিক নরনারীর গান-গল্প চলত পথে কত রাত অবধি। 'গঙ্গোর' গৌরী পুতুল বছরে একবারই গঠিত হয়।

এই হল রাজা-রানীর যুগের তীজ গঙ্গোর মেলার উৎসব। 'হরিয়ালীকা তীজ' নামে। এই গঙ্গোর মেলা কিন্তু আর একবার হয় বৎশেষ চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজার অষ্টমী তিথিতে। জয়পুরে দেখেছি কি না মনে পড়ছে না। কিন্তু উদয়পুরে মহা সমারোহে হয়। হয়ত জয়পুরে একটু কম সমারোহে হত।

এই খেলনা-পুতুলের আবার স্তর ও শ্রেণী ছিল। 'অভিজাত' পুতুল হলেন শ্বেত পাথরের নানা দেবমূর্তি জীবজন্তু হাতি ঘোড়া হরিণ গরু মানুষ ময়ূর পাখী; নানারকম ফুলের কাজ করা শ্বেত পাথরের থালাবাসন রেকাবী গেলাস বাটি তাজমহল; সাদা জালিকাজের বাক্স কত রকমের তার ঠিক নেই। পিতলের খেলনা

ফুলদানী বাসনপত্র ও গহনার বাক্স, দেবতা মানুষ পশুপাখীও এই অভিজন-শ্রেণীতে পড়ে। এ ছাড়া আর এক অভিজাত খেলনা ছিল চন্দন কাঠের নানা দেবমূর্তি জীবজন্তু। কাঠের বাক্স সেলফ বইয়ের র‍্যাক বাতিদান এরাও দোকানের অভিজন পুতুল খেলনা।

আর একটি খেলনা ছিল। সেটিও চমৎকার নতুন উপাদানে রচিত, সেটিও সব জায়গায় ফুটপাতের নিম্নাসনের শ্রেণীভুক্ত নয়। সে জিনিস আর কোথাও দেখিনি। সে হল ছেঁড়া পুরোনো কাগজের মণ্ডের তৈরী হালকা পুতুল খেলনা। ভাঙে না সহজে, মাটিতে পড়লেও। কাগজ ভিজিয়ে ঢেঁকিতে কুটে ('উদুখলে'), তাতে ওদেশী একটি খনিজ বস্তু—মুলতানী মাটির মত এঁটেলা একটি জিনিস—মিশিয়ে, ঐ খেলনা ও অনেক রকম ছোটবড় বাসনপত্র তৈরী হয়। বাসনগুলি আমাদের দেশের ধামার মত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই খেলনাগুলি অপূর্ব-সুন্দর দেখতে, কাগজের তৈরী বলে হালকাও হত। পাখী পশু নানারকমের খেলনা হত।

এগুলি সবই বিপণী- বা দোকানবাসী-অভিজাত পুতুলসম্প্রদায়। এছাড়া থাকত কাঠের খেলনা; তারা দোকানেরও, মাটির পথেরও খেলনা। কাঠের খেলনাও উৎকৃষ্ট শিল্পকাজ। তবে ছোটদের আমাদের ওদিকে খদ্দেরের হাত পৌঁছত না, বলাই বাহুল্য। আমাদের ক্রয়-ক্ষমতার সীমানা বা দৌড়, ঠাকুমার কাছে পাওয়া 'বেস্ত', মেলার পার্বণী; তাও বয়স অনুসারে দু-আনা, এক আনা, চার আনা পয়সা। তাতে উপরে লেখা ঐ সব মূল্যবান 'অবিনশ্বর' পুতুলের দিকে হাত বাড়ানো চলে না।

আমাদের খেলনা মাটির রংচং-এ পুতুল। তার রূপ যতই থাক আয়ু স্বল্প। গাড়ীতে গাড়ীতে পৌঁছবার পথটুকুও বাঁচিয়ে রাখা শক্ত ছিল, আগেই বলেছি। যদি 'জীব' বলা চলে তো তারা ফুটপাথের জীব! এক পয়সায় কখনো দুটো, কখনো একটা, কখনো চারটেও ছোট ছোট পাওয়া যেত। ঐ পয়সা বাঁচিয়ে মালাইবরফ খাওয়া, চিনেবাদাম খাওয়াও চাই ছোটদের। সেকালে মালাইবরফই ছিল। একটি কাঠের বাক্সে চামড়ার খোলে জমানো মালাইবরফ। বরফওয়ালাদের সঙ্গে একরাশ 'ফল্‌সা' পাতা আর একটি চাকু বা ছুরী থাকত। তারা ছুরী করে চেঁচে পাতায় রেখে সেই বরফ ওজন করে বা মেপে দিত এক-পয়সা দু-পয়সার মাপে!

গাজোয়াড়ার মেলার অঙ্গ হল (১) দেবদর্শন (২) রাজদর্শন (৩) আমোদ-প্রমোদ (৪) শিশুদের আনন্দ এবং গ্রামের নরনারীর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী আসার আনন্দ, দেখাসাক্ষাতের আনন্দ (৫) হাটবাজার জিনিস কেনা সব দেশের মেলার মতই।

এর পরে শ্রাবণের শেষে অথবা ভাদ্রে জন্মাষ্টমী। এতে মেলা নেই! দেবালয়ের উৎসব ব্রত উপবাস ভক্ত বৈষ্ণব নরনারীর, মধ্যরাত্রি অবধি।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

জীব ও জগতের মূলতত্ত্ব নির্ধারণ করাই ভারতীয় দর্শনসমূহের প্রধান লক্ষ্য। সৃষ্টির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার অভিপ্রায় লইয়া নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে উপযুক্ত যুক্তিতর্ক-সহকারেই ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ মূল সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একরকম হয় নাই, নানারূপ মতবিরোধই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন স্বভাবের নানাপ্রকার বস্তুই বিচিত্র জগতের মূল কারণ, অথবা এক অখণ্ড বস্তুই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে—এই বিষয়ে দার্শনিকগণ একমত নহেন। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন মৌলিক রহস্যের সন্ধান করিতে যাইয়া নানাস্বভাবের অসংখ্য পরমাণুকেই জগতের কারণরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে ত্রিগুণাত্মিকা এক প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি জড়-স্বভাব বলিয়া চেতন পুরুষের প্রয়োজনীয়তাও জগৎসৃষ্টির জন্য স্বীকার করা হইয়াছে। অদ্বৈত-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে নিত্য শুদ্ধ চেতন এক অখণ্ড ব্রহ্মকেই জগতের কারণরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। অনেক-কারণবাদ, চেতন-সাপেক্ষ অচেতন এক-কারণবাদ এবং চেতন এক-কারণবাদ। এক বা অদ্বৈত বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কারণ ও কার্যের স্বরূপ, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে অদ্বৈত-কারণবাদিগণ বিভিন্নমত পোষণ করেন। ইহাদের মধ্যে শৈব দর্শনের মতবাদ আলোচনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অষ্টাবিংশতি শৈবাগমই প্রধানতঃ শৈবশাস্ত্র-সমূহের প্রমাণ এবং উপজীব্য গ্রন্থ। সমস্ত শৈবাগম শাস্ত্রেই যে অদ্বৈততত্ত্ব পারমার্থিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু অভিনব গুপ্ত প্রমুখ শৈবাচার্যগণ শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের অনুরূপ একপ্রকার অদ্বৈত মতই প্রচার করিয়াছেন। বসুগুপ্ত, সোমানন্দ, কল্লট, ক্ষেম-রাজ প্রভৃতি শৈবাচার্যগণও শৈবাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অভিনব গুপ্তের শৈবাদ্বৈতবাদ একটু স্বতন্ত্র প্রকার। কেবল-মাত্র একেশ্বরবাদ স্বীকারের মধ্যেই শৈবমত-সমূহের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, তাহা ভিন্ন অন্যান্য অংশে অবান্তর ভেদও সুস্পষ্ট। যাহা হউক এই প্রবন্ধে অভিনব গুপ্তের কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাই অভিপ্রায়।[১]

'প্রত্যভিজ্ঞাবাদ' শব্দের মধ্যেই এই মত-বাদের পরিচয় বা মূলরহস্য নিহিত আছে। পূর্বদৃষ্ট বস্তুর পরবর্তীকালে 'এই সেই' বলিয়া যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং 'সোঽহমস্মি'—আমিই সেই পরশিব—এইরূপে নিজেকে পরশিব-স্বরূপ বলিয়া জানাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিবক্ষিত বিষয়। এই

১। ঐতিহাসিকগণের মতে অভিনব গুপ্ত ১০০০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈবশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার মধ্যে প্রত্যভিজ্ঞাবৃত্তি, শিবদৃষ্টিবৃত্তি, পরা-ত্রিংশিকাবিবরণ, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক ও পরমার্থসার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দার্শনিকগণের মতে আগম অর্থাৎ পুরাণ শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র এবং অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে পূর্ণস্বভাব ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইলে মন ভগবানকে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হয়, তখন ধ্যান ধারণা প্রভৃতির সাহায্যে পরমেশ্বরের অপরোক্ষ উপলব্ধি হওয়ার শক্তি উদ্ভূত হইলেই যথার্থ তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে, 'আমিই সেই পরমেশ্বর'—এইরূপ উপলব্ধি জন্মে।[২] অভিপ্রায় এই যে, পরশিব বা পরমেশ্বরই জীব নামে অভিহিত হয়। যদিও পরশিব চৈতন্য-স্বরূপ এবং সর্বদাই প্রকাশশীল, তথাপি মায়া-প্রভাবে অন্তঃকরণাদি উপাধি দ্বারা আবৃত হইয়া তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, অংশমাত্র প্রকাশিত হয়। সুতরাং জীব চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া প্রকাশশীল হইলেও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। ধ্যানধারণা সমাধি প্রভৃতির সাহায্যে পূর্ণরূপে প্রকাশের পরিপন্থী মায়া অপসারিত হইলে 'আমিই সেই পরমেশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে এবং তাঁহার স্বরূপ পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা পরমেশ্বরের পূর্ণরূপের অবভাস ঘটিলেই পরমেশ্বরের অভিন্নতা জীবে অভিব্যক্ত হওয়ায় পরমেশ্বর ও জীব অপৃথক পদার্থরূপে উদ্ভাসিত হয়। ইহাই জীবের মোক্ষ বা পরনির্বাণ। সুতরাং জীবের একান্তকাম্য ও পরমপ্রয়োজনীয় মোক্ষলাভের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞা বা জীব-শিবের অভেদজ্ঞাপক প্রত্যক্ষের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

'আমি'-নামক বস্তুর সহিত পরশিবের অভেদ উপলব্ধির মূল আমি ও পরশিবের সম্বন্ধের দ্যোতনা-সাপেক্ষ। জগৎকে কেন্দ্র করিয়াই আমার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। সুতরাং জগতের অন্তর্গত আমার স্বরূপ বুঝিতে হইলে জগতের মূল রহস্য জানা একান্তভাবেই প্রয়োজন। অতএব জগতের সামগ্রিক তত্ত্ব যথার্থভাবেই জানিতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক তত্ত্ব একান্তভাবেই তাহার উৎপত্তিপ্রণালী-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রথমতঃ জগৎসৃষ্টির পরিচয় আবশ্যক। অতএব অন্যান্য দর্শনের মত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনেও প্রথমতঃ জগৎসৃষ্টির আলোচনাই করা হইয়াছে।

বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি মতভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র জড়বস্তু জগৎসৃষ্টি করিতে পারে না, ইহাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বক্তব্য। এই দার্শনিক-গণের অভিপ্রায় এইরূপ : 'ঘট' প্রভৃতি লৌকিক-অনুভবসিদ্ধ বস্তুর উৎপত্তিপ্রণালী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র মাটি, জল, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি জড়বস্তুই অন্যনিরপেক্ষভাবে ঘট নির্মাণ করিতে পারে না। কারণ কেবল-মাত্র মাটি বা জল প্রভৃতি কোন একটি বস্তু এককভাবে ঘট নির্মাণ করে না বলিয়া মাটি প্রভৃতির পারস্পরিক মিলনকেই ঘটের উৎপাদক বলিতে হয়। কিন্তু মাটি প্রভৃতি অচেতন এবং সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানেই থাকে, সুতরাং উহারা নিজেরাই মিলিত হইতে পারে না। 'ঘট'-নামক বস্তু উৎপাদন করিবার জন্য ইহাদের মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন ঘটে, অতএব মিলনের পূর্বে প্রয়োজনীয়তা-বোধ একান্তই প্রয়োজন। চেতন ভিন্ন অপরের উক্ত প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয় যে, কোন একজন চেতন (কুম্ভকার প্রভৃতি) অভিলষিত ঘট নির্মাণের জন্যই প্রয়োজনীয় মাটি প্রভৃতি একত্রিত করে। সুতরাং ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, চেতন না

২। ইহাপি প্রসিদ্ধপুরাণসিদ্ধাগমানুমানাদিজ্ঞাতপরিপূর্ণ-শক্তিকে পরমেশ্বরে সতি স্বাত্মন্যভিমুখীকৃতে তচ্ছক্তিপ্রতি-সন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি নূনং স এবেশ্বরোঽহমিতি।

(সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, ১৯৩ পৃঃ)

হইলে কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। আরও একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই যে—কার্যসম্পাদনের পূর্বে অভিলষিত কার্য-বস্তু নির্মাণের কৌশল জানা না থাকিলে কেহই ঈপ্সিত কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। পাক করিবার উপযোগী যাবতীয় বস্তু থাকিলেও পাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও পাক করিতে পারে না। একটি মোটরগাড়ী বা রেডিও নির্মাণের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থাকিলেও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উহার সাহায্যে মোটরগাড়ী প্রভৃতি নির্মাণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সেই সেই কাজের কৌশল যাহার জানা আছে, কেবলমাত্র সে-ই ঐ সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে। সুতরাং যে কোন ভাবেই বিচার করা হউক না কেন, চেতন না হইলে কার্যের নিষ্পত্তি হয় না বলিয়া কার্যের উৎপত্তি চেতনসাপেক্ষ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সমগ্র জগতের বিন্যাসকৌশল, নির্মাণপদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা যাহার জানা আছে, তাহাকে সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ না বলিয়াও উপায় নাই। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান তিনিই ঈশ্বর বা পরশিব। সুতরাং পরমেশ্বরই জগৎকর্তা ইহা মানিতেই হইবে।

ঈশ্বর জগৎকর্তা—ইহা অন্যান্য দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু জীবের অদৃষ্ট বা শুভাশুভ কর্ম অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বর জগৎ-নির্মাণ করেন—ইহাই ঈশ্বর-স্বীকারকারী সমস্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী। এই দর্শনের মত এই যে, কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলিলে ফলতঃ ঈশ্বরের কর্তৃত্বই ব্যাহত হইবে। কারণ স্বতন্ত্রতাই কর্তৃত্বের বীজ। কর্মের অধীন হইয়া জগৎ নির্মাণ করিলে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যেরই হানি হওয়ায় কর্তৃত্বও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং ঈশ্বর কর্মের সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টি করেন—ইহা ঠিক নহে। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবেই ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেন, ইহাই স্বীকার করা সমীচীন। পরিপূর্ণ-শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর কেবল নিজের ইচ্ছানুসারেই নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তি-তর্ক সহকারে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে এই দর্শনোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন যে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সূত্র, বৃত্তি, বিবৃতি, প্রকরণ ও বিবরণ—এই পঞ্চবিধ প্রমাণই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপজীব্য।[৩] সংক্ষেপে প্রতিপাদ্য-বিষয়প্রতি-পাদক বাক্যই সূত্র। সূত্রের তাৎপর্যব্যাখ্যার নাম বিবৃতি। বিবৃতি দুই-প্রকার লঘু ও বৃহৎ। পৌর্বাপর্য-নির্ধারণকে প্রকরণ বলা হয়। সমস্ত বক্তব্য বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারের নাম বিবরণ। এই পঞ্চবিধ উপায়েই সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়।

প্রথমতঃ সূত্র উল্লেখ করিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম সূত্র বা শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সংক্ষেপে-কথন এইরূপ—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি॥

(সর্ব দঃ সঃ, প্রত্যভিজ্ঞা দঃ)

পরম কৃপাময় গুরুর অনুগ্রহলাভে ধন্য হইয়া মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিতে হয়। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে পরমেশ্বরের অপার করুণা লাভের

৩। সূত্রং বৃত্তির্বিবৃতির্লঘ্বী বৃহতীত্যুভে বিমর্শিন্যৌ।
প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ॥
(সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন)

অধিকারী-রূপে সংগঠিত করাই দাসত্বলাভ। বিশ্বপতি পরমেশ্বরের দাসত্বলাভ হইলেই নিখিল ঐশ্বর্যের কারণস্বরূপ মহেশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞাসম্পন্ন হয়। সুতরাং নিজের আত্মোন্নতি এবং সাধারণ সংসারী জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের এই আদিম সূত্রটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ এই সূত্রের মধ্যেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের যাবতীয় গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। অতএব ইহার প্রত্যেক শব্দ বিশেষভাবে আলোচনা করিলেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূলরহস্য অনেকাংশে পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমেই 'কথঞ্চিদাসাদ্য' এই অংশ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সাধারণ অর্থ—'কোনরকমে লাভ করিয়া', পরবর্তী 'মহেশ্বরস্য দাস্যং'— এই অংশের সহিত উক্ত প্রথম অংশের অন্বয় করিতে হইবে। সুতরাং 'কোনপ্রকারে মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া' ইহাই প্রথম অংশের বিবক্ষিত অর্থ।

অনাদিকাল হইতে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীব সংসারের অনন্ত দুঃখে পীড়িত হইলেও স্বীয় দৃষ্টি অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় দুঃখনিবারণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। সুতরাং মস্তকে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন জলের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সংসারের দুঃখক্লিষ্ট মানবও তেমনিই শান্তির অমৃতবারি অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে ভ্রমণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে কাহারও কদাচিৎ সদ্‌গুরু লাভ ঘটে। নিষ্ঠা সহকারে গুরুর সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা গুরুর আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলেই গুরুর উপদেশ অনুসারে যথাযথ অনুষ্ঠান-আচরণের দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া যায়, প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্ধারণ করিয়া ঐ পথে অগ্রসর হইতে হইতে ঈপ্সিত লক্ষ্যে সে উপনীত হইতে পারে। সুতরাং গুরুর করুণালাভই সর্বাগ্রে একান্ত প্রয়োজন। গুরুর পরিচর্যা পরমেশ্বরলাভের প্রথম সোপান, অতএব বুঝিতে হইবে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই গুরুসেবার প্রেরণা দেয়। গুরুর সাহায্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতে পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে জীবের অন্তরে ব্যাকুলতা জাগ্রত হইলে সর্বান্তর্যামী ভগবান জীবের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যেই সদ্‌গুরুরূপে ব্যাকুলচিত্ত ভক্তের সম্মুখীন হন। অতএব গুরুকে সাধারণ মানবমূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই জীবন্ত বিগ্রহরূপে বুঝিতে হইবে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ইহাই মর্মকথা। এই বিষয়ে মাধবাচার্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে পূর্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন- পরমেশ্বরের সহিত অভেদবুদ্ধিতে স্বকীয় গুরুর চরণযুগল বন্দনা করিলে উহা পরমেশ্বরের বন্দনাই হয়।[৪] সুতরাং গুরুচরণ-বন্দনা দ্বারাই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিবার অধিকারী হওয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে 'কথঞ্চিৎ' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া— ইহাই পরবর্তী অংশ। যিনি মায়ার অধীশ্বর, দেশ বা কালের দ্বারা যাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা চলে না, যিনি স্বপ্রকাশ চৈতন্য- ও আনন্দ-স্বরূপ তিনিই মহা ঈশ্বর বা মহেশ্বর। ব্রহ্মাদি অন্যান্য অনন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেবগণ সাধারণ মায়াকে অতিক্রম করায় ঈশ্বর নামে

৪। পরমেশ্বরাভিন্নগুরুচরণারবিন্দযুগলসমারাধনেন পরমেশ্বরঘটিতৈব ইত্যর্থঃ। (সর্বদঃ সং, প্রত্যভিঃ) বস্তুতঃ গুরুর সাহায্য ব্যতীত শাস্ত্রবাক্যের গূঢ় তাৎপর্যও জানা যায় না। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও আছে, 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ'।

অভিহিত হইলেও তাঁহারা মহামায়ার অধীন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহামায়ার প্রভাবও দূর হইয়া যায়, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীব নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য- ও আনন্দ-স্বরূপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মাদি দেববৃন্দও যাঁহার করুণাকণা লাভ করিয়া ঈশ্বর হইয়াছেন এবং সততই যাঁহার ধ্যান করেন তিনিই মহেশ্বর। এই মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিতে হইবে। প্রভু যাহাকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু দান করেন, প্রভুর অনুগ্রহভাগী সফলমনোরথ তাদৃশ ব্যক্তি দাস নামে অভিহিত হয়। সুতরাং দাসত্ব লাভ করা খুব সহজ নহে। নিত্যপ্রকাশ-মানতা, আনন্দ এবং সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্যই প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বরের স্বরূপ। এই স্বরূপত্রয়ের পরিপূর্ণ উপলব্ধির যোগ্যতাই এখানে দাসত্ব। মায়ার বন্ধন ছিন্ন না হইলে উক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাই সম্ভব হয় না। সুতরাং মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার উপযোগী চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতিই এখানে পরমেশ্বরের দাসত্ব শব্দের মূল লক্ষ্য। ঐরূপ দাসত্ব লাভ হইলে চিত্ত সর্ববিধ বাসনাকামনা-শূন্য হয়, সুতরাং তখন নিষ্কলুষহৃদয়ে জগতের প্রকৃত কল্যাণসাধনের উপযোগী শাস্ত্র প্রভৃতিও রচনা করা সম্ভব। হৃদয়ের সমস্ত কালুষ্য বিদূরিত না হইলে স্বীয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অযথার্থ তত্ত্বও বাক্যের ছটায় এবং যুক্তির চাতুর্যে যথার্থরূপে প্রতিপাদন করা যায় এবং এইপ্রকার শাস্ত্রপাঠ বা উপদেশ অনুসরণ করিলে প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নহে। সুতরাং মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া শাস্ত্র-প্রণেতা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন রচনা করিয়াছেন —ইহা বলায় এই শাস্ত্রের জীবকল্যাণ-সামর্থ্যই সূচিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এই দর্শনের অধিকারী অর্থাৎ এই দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার যোগ্যতাশালী কে হইবে তাহাও বলা হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যক্তিই এই দর্শন-শাস্ত্রপাঠে অধিকারী হইবে। সর্ববিধ ফলকামনা পরিত্যক্ত না হইলে মুমুক্ষু হওয়া যায় না। সুতরাং যাহারা বিশেষ কোনও ফলকামনা করিয়া ব্রত, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে তাহারা এই দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী নহে। অনধিকারীর নিকট শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না, তাহার ফলে শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান শাস্ত্রার্থই পরম সত্য মনে হওয়ায় বহুস্থলে ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট যথার্থ ফল-লাভে অসমর্থ হওয়ায় শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। অতএব অধিকারী হইয়াই শাস্ত্রালোচনা কর্তব্য, ইহাই এখানে অভিপ্রায়। এই শাস্ত্র-পাঠ করিলে অধিকারীর পরম জ্ঞান জন্মে। বস্তুতঃ 'আমিই সেই মহেশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই এখানে পরমজ্ঞান শব্দের অর্থ।

আচার্য সোমনাথ বলেন—

একবারং প্রমাণেন শাস্ত্রাদ্ বা গুরুবাক্যতঃ।
জ্ঞাতে শিবত্বে সর্বস্থে প্রতিপত্ত্যা দৃঢাত্মনা॥
করণেন নাস্তি কৃত্যং কাপি ভাবনয়াপি বা।
জ্ঞাতে সুবর্ণে করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেৎ॥

(সর্বদঃ সঃ, দঃ প্রত্যভিঃ)

ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যেই হউক অথবা শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়াই হউক সর্ববস্তুতে একবার শিবত্বজ্ঞান দৃঢ়ভাবে জন্মিলে বাহ্যিক করণ অর্থাৎ প্রমাণ বা শাস্ত্রপাঠাদির কোনও প্রয়োজন নাই। রোগমুক্ত ব্যক্তির ঔষধের যেমন প্রয়োজন হয় না, তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও তেমনই চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদির কোন

প্রয়োজন হয় না। সুবর্ণের বিশুদ্ধি নির্ধারণের জন্যই কষ্টিপাথরের আবশ্যকতা। পরীক্ষিত সুবর্ণের জন্য ঐ প্রস্তর নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিজের পরিপূর্ণ মহেশ্বরস্বরূপতা উপলব্ধি হইলে অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ অবস্থায়ও তত্ত্বদর্শী পরমহংসলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষেরা দুঃখনিপীড়িত মানবগণের কল্যাণ-সাধনের জন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও আচরণ করেন। শাস্ত্রপাঠের ফল বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ। একমাত্র পরমশিব বা মহেশ্বরই প্রকৃত বস্তু, অন্যান্য সমস্তই অবস্তু—এই জ্ঞান হইলেই সমস্ত জাগতিক বস্তু বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বাসনাকলুষ চিত্ত নির্মল হয়। তখনই ধ্যান-ধারণা-সমাধির সাহায্যে 'আমিই সেই নিত্যশুদ্ধ কূটস্থ মহেশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে মহেশ্বর চৈতন্য-স্বরূপ, সুতরাং নিত্যপ্রকাশশীল। জীবাত্মাও স্বরূপতঃ মহেশ্বর, জীব ও শিবের কোনরকম ভেদ নাই—ইহাই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। সুতরাং জীব বা মহেশ্বর সর্বদাই প্রকাশিত হইলে 'জীবই মহেশ্বর' ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের আবশ্যকতা কি? যাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশশীল তাহা নিজ মহিমাবলেই সর্বদা প্রকাশিত থাকে, সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ব্যতীতও সকলে সর্বদা নিজেকে চৈতন্যরূপী মহেশ্বর বলিয়াই জানিতে পারিবে। অতএব নিজের মহেশ্বরত্ব অসন্দিগ্ধ হওয়ায় উহার প্রতিপাদন নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—যদিও জীব ও মহেশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তথাপি অনাদি অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে জীব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। মহেশ্বর সর্বব্যাপক, কিন্তু জীব সর্বব্যাপকরূপে প্রকাশিত হয় না। নিত্যচৈতন্যরূপী সর্বব্যাপক মহেশ্বর নিজের স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমায় লীলাবশতঃ স্বকীয় বোধগগনে সবকিছুকে প্রতিবিম্বের মতই প্রকাশিত করিয়াছেন।[৫] লীলাবিনোদনার্থ তিনি নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষুদ্ররূপে অবভাসিত হইতেছেন এবং অণু বা ক্ষুদ্রতর অংশস্বরূপ জীবের ভোগসিদ্ধির জন্য চরাচর বিশ্ব প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং স্বপ্রকাশতা-নিবন্ধন পরশিব সর্বদা প্রকাশমান হইলেও মায়াবশতঃ অংশতঃ প্রকাশিত অবস্থায় জীব নামে অভিহিত হন। অতএব জীব স্বরূপতঃ পরশিব হওয়া সত্ত্বেও মায়ার প্রভাবে সাধারণতঃ স্বকীয় মহেশ্বরত্ব উপলব্ধি হয় না বলিয়াই দৃক্‌শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুভবের সাহায্যে তাহাকে স্বকীয় মহেশ্বরত্ব বুঝিতে হয়।[৬] ইহার অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্য বা দৃক্‌শক্তি এবং স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেরই আছে। সুতরাং জীব জ্ঞাতা বা কর্তারূপে প্রতীয়মান হওয়ায় জীবকে স্বরূপতঃ পরমেশ্বরই বলিতে হইবে। পারমার্থিক বিচারে জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র পরমেশ্বরেরই সিদ্ধ হইবে। অতএব বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধিতে জ্ঞাতা ও কর্তা রূপে প্রতীয়মান জীব ফলতঃ মহেশ্বর—ইহাই বস্তুতত্ত্ব। এই অবস্থায় বিচারশীল ব্যক্তি 'জীব ঈশ্বর নহে' ইহা কখনও বলিতে পারে না। পক্ষান্তরে জীবই ঈশ্বর বলিয়া জীব ও মহেশ্বরের ঐক্য প্রতিপাদনকারীও প্রকৃতপক্ষে কেহই হইতে পারে না। কারণ জীব এবং মহেশ্বরের অভেদদর্শী অপর কেহ থাকিলেই সেই তৃতীয় দ্রষ্টা ব্যক্তি জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে পারে। কিন্তু মহেশ্বর ও জীব

৫। সর্বমিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিম্বমাত্রম্।
(তন্ত্রসার, ৩য় আঃ)

৬। স্বপ্রকাশতয়া সততমবভাসমানেঽপ্যাত্মনি মায়াবশাদ্ ভাগেন প্রকাশমানে পূর্ণতাবভাসসিদ্ধয়ে দৃক্‌ক্রিয়াত্মক-শক্ত্যাবিষ্করণেন প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শ্যতে।
(সর্বদঃ সঃ, প্রত্যভিঃ দঃ)

অভিন্ন বলিয়া সেই সম্ভাবনাও নাই। বস্তু-স্থিতির দিক হইতে ঐরূপ হইলেও মায়ার প্রভাবে জীব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা নিজস্ব চৈতন্য এবং ক্রিয়াশক্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করিলেই জীব নিজের মহেশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।[৭] নিজের জ্ঞাতৃত্ব কিভাবে স্বকীয় মহেশ্বরত্বের বোধ জন্মাইবে তাহাও আচার্য সোমানন্দ নাথ বলিয়াছেন। তিনি বলেন: চৈতন্যই প্রাণিবর্গের জীবন। উক্ত চৈতন্য জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি বা স্পন্দনশক্তি- এই দুইভাবে অভিব্যক্ত হয়। জীবের জ্ঞানশক্তি স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ জীব আর কিছু না জানিলেও নিজেকে স্বাভাবিকভাবেই জানে। 'আমি' এই বোধ বা জ্ঞান-স্ফুরণ সমস্ত প্রাণীর সর্বদাই বিদ্যমান; প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই কিছু-না-কিছু কর্মানুষ্ঠান করে। অন্ততঃ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান সমস্ত প্রাণীরই রহিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি জীবিত প্রাণীর অবশ্যম্ভাবী-রূপেই থাকিবে। কিন্তু জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সকল প্রাণীর স্বাভাবিক হইলেও উহার তারতম্য বিদ্যমান। কেহ অল্প জানে, কেহ তদপেক্ষা বেশী জানে। কাহারও জ্ঞান দশ বা বিশটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কাহারও বা দশসহস্র বা বিশসহস্র বিষয়ের জ্ঞান আছে। সুতরাং বুঝা যায় জ্ঞান-শক্তি কোথায়ও অধিক সঙ্কুচিত, আবার কোথায়ও বা তদপেক্ষা অধিক বিকশিত। এই-ভাবে বিচার করিলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্থানে পৌছাইতে হইবে যেখানে জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণ নিরাবরণ অর্থাৎ পূর্ণরূপে বিকশিত। জ্ঞানশক্তির এই পরিপূর্ণবিকাশ যেখানে ঘটিয়াছে তাহাকেই মহেশ্বর বলা হয়। দেশ কাল প্রভৃতি উপাধির দ্বারা প্রতিহত হইয়াই জ্ঞানশক্তি সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং অসঙ্কুচিত অবস্থাও উহার আছে—ইহা অবশ্য স্বীকরণীয়। এবং ঐ অসঙ্কুচিত বা পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি পূর্ণরূপে অবভাসিত মহেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে থাকা সম্ভব নহে। সঙ্কুচিত এবং অসঙ্কুচিত - এই অবস্থাগত তারতম্য যাহার ঘটে তাহা মূলতঃ অভিন্ন বা এক। সুতরাং সঙ্কুচিত জ্ঞানশক্তি ফলতঃ অসঙ্কুচিত জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন। অতএব জীবের জ্ঞানশক্তি মহেশ্বরের জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন রূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় 'জীবই মহেশ্বর' ইহাই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ক্রিয়াশক্তির তারতম্য অনুসন্ধান করিলেও জীবের মহেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইবে।[৮]

আচার্যপ্রবর অভিনব গুপ্ত বলেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি (কঠঃ ২।২) অর্থাৎ দীপ্যমান সৎস্বরূপ মহেশ্বরের প্রভায় প্রভাবিত হইয়াই সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তিশালী হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাও মহাজ্যোতির্ময় নিত্যপ্রকাশীল মহেশ্বরের চৈতন্য বা প্রকাশশীলতাই ভাব-পদার্থসমূহের প্রকাশের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। প্রকাশ বা চৈতন্য এক অখণ্ড হইলেও বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ভিন্নরূপে প্রতীয়-

---

৭। সর্বেষামিহ ভূতানাং প্রতিষ্ঠা জীবদাশ্রয়া।
জ্ঞানং ক্রিয়া চ ভূতানাং জীবতাং জীবনং মতম্॥
তত্র জ্ঞানং স্বতঃসিদ্ধং ক্রিয়াকার্যাশ্রিতা সতী।
পরৈরপ্যুপলক্ষ্যেত তথান্যজ্জ্ঞানমুচ্যতে॥
যা চৈষাং প্রতিভা তত্তৎপদার্থক্রমরূপিতা।
অক্রমানন্তচিদ্রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বরঃ॥
(সর্বদঃ সঃ প্রত্যভিঃ দঃ)

৮। তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ।
প্রকাশৈক্যাৎ তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতঃ॥
(সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন)

মান হয়। একই বৈদ্যুতিক আলোক মূলতঃ অভিন্ন হইলেও নীল রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের কাচের আবরণীর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হওয়ায় বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ ঘট, নদী প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর সহিত সংশ্লেষের ফলে এক অখণ্ড চৈতন্যও বিভিন্নরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত দৃষ্টি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে দেশকাল প্রভৃতির দ্বারা সঙ্কুচিত স্ফুরণই বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মূলতঃ উহা অভিন্ন। এই চৈতন্য বা প্রকাশই অন্তঃকরণাদিসম্পৃক্ত হইয়া প্রমাতা নামেও ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যই আত্মা। দেশকাল প্রভৃতি কোন উপাধির দ্বারা প্রতিহত না হইয়া নিত্য সর্বব্যাপী-রূপে যে চৈতন্য প্রকাশিত হয় – উহাই মহেশ্বর। মহেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ, বিজ্ঞানঘন এবং স্বতন্ত্র। মহেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য থাকার ফলেই তিনি কাহারও ইচ্ছা বা প্রভাবের বশীভূত না হইয়াই কেবলমাত্র লীলা-বিনোদনের জন্যই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে জড় বস্তুই জগতের কারণ হইতে পারে না, এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অভাব থাকায় ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহই জগৎ নির্মাণ করিতে পারে না। মহেশ্বরের নিজ ইচ্ছানুসারে সমগ্র বিশ্বনির্মাণসামর্থ্যই তাঁহার ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং যিনি জগৎ রচনা করেন, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ যাহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, প্রলয়কালেও উহা স্বাভাবিকভাবেই তাহাতেই বিলীন হইবে। অতএব জগতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের কারণই—মহেশ্বর।* বেদান্তমতে এই মহেশ্বরই ব্রহ্মনামে অভিহিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে জীব ও মহেশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব মহেশ্বরের মত জীবও নিত্য মুক্ত হইবে, সুতরাং জীবের সংসারবন্ধন কি করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—অনাদি অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে জীব নিজের নিত্যমুক্তস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, সুতরাং মায়াদ্বারা অন্ধ হইয়া স্বকীয় ঈশ্বরস্বরূপতা জানিতে অসামর্থ্যরূপ অজ্ঞানজনিত কর্মের ফলেই সংসারে বদ্ধ হয়। অতএব যথাযথভাবে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন অনুশীলনের ফলে 'আমিই সেই ঈশ্বর' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিলে মহেশ্বরের সাক্ষাৎকার ঘটিবার ফলে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরিপূর্ণতা সাধিত হওয়ায় জীব মুক্ত হয়।[১০]

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে জীব নিজেকে মহেশ্বররূপে জানিবে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মহেশ্বর ও জীব অভিন্ন হওয়ায় মহেশ্বরই জ্ঞাতা হইবেন, অথচ জ্ঞেয় বিষয়রূপেও মহেশ্বরই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ জানিবার বিষয়ও মহেশ্বর। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক বা অভিন্নই হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ইহা অসঙ্গত; যে জ্ঞাতা সে নিজের জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম বা বিষয় হইতেই পারে না। কারণ কর্তা ও কর্ম অত্যন্ত ভিন্ন। আরও কথা এই যে—"অহং বহু স্যাম্"—আমি বহু হইব—সৃষ্টির মূলীভূত এই সঙ্কল্পের ফলেই এক মহেশ্বর বিবিধ বস্তুরূপে রূপান্বিত হইয়াছেন। সুতরাং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু বস্তু—তাহা জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়—যাহাই হউক না কেন সমস্তই মহেশ্বর। অতএব একই মহেশ্বর প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতি বিবিধভাবে অবস্থিত। সুতরাং প্রমেয় পৃথিবী জল প্রভৃতি পদার্থ-নিচয় এবং প্রমাতা জীব

* জন্মাদ্যস্য যতঃ। (ব্রহ্মসূত্র—১।১।২)

১০ এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী কর্মবন্ধনঃ।
বিদ্যাভিজ্ঞাপিতৈশ্বর্যশ্চিদ্‌ঘনো মুক্ত উচ্যতে॥
(সর্বদঃ সঃ, প্রত্যভিঃ দঃ)

একই মহেশ্বর-স্বরূপ হওয়ায় বদ্ধ ও মুক্ত উভয়ের নিকট জাগতিকপদার্থের তাত্ত্বিকস্বরূপের কোনই তারতম্য থাকিবে না। অতএব বদ্ধ ও মুক্ত জীবের পার্থক্যও সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে—যদিও প্রমেয় প্রমাতা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই মূলতঃ এক মহেশ্বরেরই স্বরূপ বলিয়া অভিন্ন, তথাপি মৌলিক এই অভেদ যিনি অপরোক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন একমাত্র তিনিই প্রমাতা ও প্রমেয়ের অভেদ বুঝিতে পারেন—এবং তিনি মুক্ত। মায়ার প্রভাবে যাহার পক্ষে নিখিল বস্তুর স্বরূপ হিসাবে মহেশ্বরকে বুঝিবার সামর্থ্য নাই– তাহার নিকট প্রমাতা ও প্রমেয়ের ভেদ বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ফলে তাহার ভোগাসক্তি প্রভৃতি হ্রাস না পাওয়ায় সে বদ্ধই থাকিয়া যায়। অতএব বদ্ধ ও মুক্তের পার্থক্য অতি পরিস্ফুট।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব স্বভাবতঃ মহেশ্বর-স্বরূপ হইলে উক্ত স্বরূপের উপলব্ধির জন্য প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের কোনই আবশ্যকতা নাই। কারণ—যাহা স্বরূপতঃ মহেশ্বর হইতে অভিন্ন, উপলব্ধি না হইলেও তাহা অভিন্নই থাকিবে এবং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের যে ফল তাহাও স্বতঃসিদ্ধভাবেই ঘটিবে। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, কোনও প্রত্যভিজ্ঞার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নিষ্প্রয়োজন—ইহাই বলা চলে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—অর্থক্রিয়া বা ফলসিদ্ধি দুইরকম, বাহ্য ও আন্তরিক। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি প্রভৃতি বাহ্য অর্থক্রিয়া প্রত্যভিজ্ঞা-সাপেক্ষ নহে। কিন্তু কোন কিছু অনুভব করিবার ফলে প্রীতি শোক দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অর্থক্রিয়া একান্তভাবেই প্রত্যভিজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। লটারির অর্থপ্রাপ্তি বা বিদেশস্থ ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের মৃত্যু প্রভৃতি একান্তভাবেই উপলব্ধির সাহায্যে আনন্দ- বা দুঃখ-দায়ক হয়। ঐ সমস্ত ঘটনা বাস্তবে সংঘটিত হইলেও না জানা পর্যন্ত মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। আরও বলা যায়—দৈববিড়ম্বনায় অতি শিশুকালেই যে পুত্রের সহিত পিতার বিচ্ছেদ ঘটে, ঘটনাপ্রবাহের সংঘাতে দীর্ঘদিনের পর সেই পুত্র ও পিতা পরস্পরের অত্যন্ত সন্নিহিত হইলেও উভয়ের প্রকৃত সম্পর্ক না জানা পর্যন্ত তাহাদের পিতা পুত্র-সুলভ ভালবাসা জন্মে না। সুতরাং আন্তরিক অর্থক্রিয়া জ্ঞানসাপেক্ষ। জীব স্বভাবতঃ মহেশ্বর হইলেও মায়ার প্রভাবে ঐ অভিন্নতা অজ্ঞাতই থাকে। অতএব যথাবিহিত শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির সাহায্যে মায়ার প্রভাব মুক্ত হইলেই জীব নিজেকে মহেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞতার সাধনের জন্য দর্শনাদির আবশ্যকতা রহিয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, শিবই পশুভাব অর্থাৎ জীবভাব গ্রহণ করিয়াছেন। 'শিব এব গৃহীতপশুভাবঃ'- আবার সেই পশু নিজেকে শিব বলিয়া জানিবে—ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা। অনন্ত, চিৎস্বরূপ, স্বতন্ত্র শিবই চরাচর সমগ্র বিশ্বের কারণ। তিনি সর্বাকার অথচ নিরাকার-স্বভাব। তিনি স্বপ্রকাশ, ব্যাপক ও নিত্য। শিবই দ্রষ্টা, শিবই দৃশ্য। এক অদ্বিতীয় শিবই 'নর্মরভসে' (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্র—৫।৬)—অর্থাৎ লীলার জন্য নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া অবভাসিত হন এবং সঙ্কুচিতস্বরূপ জীবের ভোগসিদ্ধির জন্য বিশ্বকে বিকশিত করেন। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন বা অহংভাব হইতেই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

শিব চিৎস্বভাব, পূর্ণ, অবিকারী ও নিরাশংস অর্থাৎ পরমবৈরাগ্যশালী হইলেও তাঁহার শক্তি

অনন্তভাবে প্রস্ফুরিত হয়। তাঁহার মধ্যে চিৎ, আনন্দ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই পাঁচটি প্রধান শক্তি।[১১]

শিব ও শক্তি পরমার্থতঃ অভিন্ন। চিৎশক্তির প্রাধান্য অবস্থায় শিব, আবার স্বাতন্ত্র্যমহিমায় বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছায় যখন প্রথম আত্মবিমর্শ বা ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব ঘটে, সেই আনন্দপ্রধান অবস্থায় শিবই শক্তি। ইহাই অহংভাব বা প্রকাশের দ্বিতীয় স্বরূপ। তাহার পর 'অহং ইদং'—আমি ইহা হইব – ইত্যাদি পরামর্শ বা সঙ্কল্পের উদয় হয়, ইহাই তৃতীয় প্রকাশ। ইহারই নাম সদাশিবতত্ত্ব বা শিবশক্তির মিলিত-রূপ। এই সদাশিবতত্ত্ব ও সৃষ্টির পূর্বরূপ বা সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহা উন্মীলিতমাত্র-চিত্রকল্প-ভাবরাশির ন্যায় অস্ফুট। এই ভাবরাশি পরিস্ফুট হইলেই জ্ঞানশক্তিপ্রধান হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে। হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য ঘটে, তখন 'অহং' বা 'ইদং'-এর অর্থাৎ শিব ও শক্তিতত্ত্বের তুল্যরূপে বিকাশ ঘটায় সৃষ্টি-প্রবাহ আরম্ভ হয়।

চৈতন্যরূপী পরশিব এই জগতের একমাত্র মূল কারণ, কিন্তু তিনি শিব, পশু বা জীব এবং মায়া—এই ত্রিবিধরূপে অভিব্যক্ত হন সুতরাং শিব, জীব ও মায়া বা বিচিত্রকার্য— এই ত্রিধা পরিদৃষ্ট হইলেও সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ এক পরশিবেরই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।[১২]

স্বাতন্ত্র্যশক্তিবলে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া পরশিবই জীবরূপে অবভাসিত হন। অতএব জীব চিৎ-অচিৎ-রূপাবভাসমাত্র। ইহার মধ্যে চিদ্রূপতাই জীবের ঐশ্বর্য, আবার অচিৎ-রূপতাই মল। মলের জন্যই জীব স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মল অপগত হইলেই জীব নিজকে পরশিবরূপে উপলব্ধি করে, ইহাই মোক্ষ।

জীব বা অনুগত দুষ্টভাবই 'মল' বা পাশ অর্থাৎ বন্ধন। এই মল বা বন্ধন পঞ্চবিধ—অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, ভোগাসক্তি ও তৎকারণরূপ ভোগ্যবিষয়ের সান্নিধ্য, চ্যুতি অর্থাৎ সদাচরণ হইতে স্খলন এবং জীবত্ব-প্রাপক অনাদি সংস্কার।[১৩] এই মলযুক্ত পশু বা জীব আবার তিনরকম; বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল। তত্ত্বজ্ঞান, যোগ, সন্ন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে কর্মক্ষয় এবং অনাগতভোগসংস্কার দগ্ধ বীজের মত হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষই 'বিজ্ঞানাকল' নামে অভিহিত হয়। 'কলা' শব্দের অর্থ বন্ধের কারণ ভোগাবস্তু। যাহার 'কলা' নাই তাহাকে 'অকল' বলে। বিজ্ঞানের দ্বারা যে 'অকল' হইয়াছে তাহার নাম 'বিজ্ঞানাকল'। জীবভাবের মূলীভূত 'মল' ব্যতীত অন্য সমস্ত 'মল' বিজ্ঞানাকল পুরুষের বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রলয়কালে সমস্ত ভোগাবস্তুর অভাব ঘটায় কেবলমাত্র মায়া বা অবিদ্যারূপ মলযুক্ত জীব প্রলয়াকল অভিহিত হয়। আর সাধারণ সংসারাসক্ত জীব 'সকল' নামে নির্ধারিত হইয়াছে। যাহা সঙ্কোচনকারী তাহাই মায়া। এই মায়া পরশিবের লীলার উপযোগী আত্ম-সঙ্কোচনের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহের মতই পরশিবের সঙ্কোচশালী পরিণামের মত মায়াও তত্ত্ব বা বস্তু। এই মায়াই কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তিরূপ ষট্কঞ্চুকের সাহায্যে জীবের ভোগ-

---

১১ পরমেশ্বরঃ পঞ্চভিঃ শক্তিভির্নির্ভরঃ।
স স্বাতন্ত্র্যাৎ শক্তিং তাং তাং মুখ্যতয়া প্রকটয়ন্ তিষ্ঠতি॥
(তন্ত্রসার)

১২ ত্রিকমতে নর-শক্তিশিবাত্মকং বিশ্বমুক্তম্। পরমার্থতো হি পর-পরাপরা-পরাত্মক নরশক্তিশিবাত্মকং বিশ্বমুক্তম্। (তন্ত্রসার আঃ ৯, টীকা)

১৩ আত্মাশ্রিতো দুষ্টভাবো মলঃ। স মিথ্যাজ্ঞানাদি-ভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। (সর্ব দঃ সং, শৈবদর্শন)

সাধন সম্পন্ন করে, আবার সমগ্র জগতেরও কারণ এই মায়া। এই মতে সৃষ্টি প্রক্রম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

'মায়া' বা পরমেশ্বরের ইচ্ছাই সমস্ত ভূত-ভৌতিক ও জীব সৃষ্টির মূল কারণ। প্রলয়-কালে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মায়াতে সূক্ষ্মরূপে লীন হয় এবং মায়া পরমেশ্বরেই লীন হয়। সৃষ্টির আরম্ভে পরমেশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা বা মায়ার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশঃ তাহার পরিণাম ঘটে। এই মায়ার প্রথম পরিণামের নাম 'কলা' বা সমগ্র পদার্থের মূলীভূত সূক্ষ্মতম বস্তু। প্রলয়কালে এই কলার বিনাশ ঘটে। কলার পরিণাম কাল। কাল হইতে নিয়তি বা অদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইতে বিদ্যার উৎপত্তি হয়। এই বিদ্যাই চিত্তনামে অভিহিত হয়। বিদ্যা হইতে রাগের জন্ম। যাহা বিষয়াসক্তির মূল এবং বিদ্বেষের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাই রাগ। বিদ্যা এবং রাগ—প্রতি জীবের ভিন্ন। ইহাই আন্তর সৃষ্টি।

সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা মায়াই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) এবং স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ তন্মাত্রের স্থূল পরিণামই পঞ্চ স্থূল মহাভূত।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম পরশিবের ইচ্ছার বিকাশ ও শক্তি বা আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিবশক্তি হইতে ঈশ্বরের উৎপত্তি এবং ঈশ্বর সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের জনক। মায়াই প্রকৃতিতত্ত্বের মূল। 'কলা' মায়ার প্রথম পরিণাম। সুতরাং উপসংহারে ইহাই বলা হইয়াছে যে—(১) শিবশক্তিতত্ত্ব আনন্দপ্রধান। (২) সদাশিবতত্ত্ব ইচ্ছা-প্রধান। (৩) ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানপ্রধান। (৪) শুদ্ধবিদ্যা ক্রিয়াপ্রধান। এই চতুর্বিধ পরিণাম সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূল। এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইলেই 'মল' বিনষ্ট হয় এবং জীব নিজেকে পরশিব স্বরূপে জানিতে পারে।

প্রণাম করি

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

প্রণাম করি তাহার পায়ে সবারে যে স্নেহ করে,
সবারে যে দিবস-রাতি বাঁচাতে চায় বক্ষে ধ'রে।
যে জন সদা মিষ্ট কথায় বক্ষ সবার ভরে সুধায়,
অমৃতলোক দেখায় সে যে, মানবতায় রক্ষা করে।

আকাশ-বাতাস-গ্রহে সূর্যে আছ তুমি মাটির গায়ে,
তবু যেথায় প্রকাশ বেশী—প্রণমি সেই দেবালয়ে।
ভালবাসে সবারে যে বিশ্বপিতার দেউল সে যে,
প্রণমি সেই দেবালয়ে, দেউলবাসীর রাঙা পায়ে।

সাবিত্রী ও সীতা

শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র

আমাদের ভারতভূমি পুণ্যভূমি, পুণ্যতীর্থ প্রভৃতি নামে বা বিশেষণে ভূষিত ও পরিচিত। এই পবিত্র দেশ যেমন শতসহস্র সাধক ভক্ত ও মহামানব বা অবতারপুরুষের জন্মভূমি, সেইরূপ অসংখ্য সতীরমণীরও জন্মস্থান। এই দেশের পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করলে তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

পুরাণকীর্তিতা মহীয়সী যাঁরা সাধ্বী পতিব্রতা রূপে সর্বভারতে আজও বন্দিতা, পূজিতা, তাঁদের মধ্যে রামায়ণের জনক-দুহিতা জানকী এবং মহাভারতের অশ্বপতি-সুতা সাবিত্রী, এঁরাই শ্রেষ্ঠা এবং আদর্শ-স্থানীয়া হয়ে আছেন। তাছাড়া এদেশে মহা-ভারতে মহীয়সী মহারানী গান্ধারী প্রভৃতি আরও যে সব নারী চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরাও অতুলনীয়া।

ভারতাত্মার বাণীবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'হে ভারত! ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'।

নারীর আদর্শরূপে সীতাসাবিত্রীর নামই একসঙ্গে সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়। স্বামীজী দময়ন্তীকে উঁহাদেরই সমপর্যায়ভুক্তা করিয়াছেন। এ তিনজনের কেহই সাধারণ গৃহস্থের কন্যা বা বধূ নন, প্রত্যেকেই রাজ-দুহিতা ও রাজবধূ। সর্বোপরি সেই বহু-পত্নীকের যুগেও প্রত্যেকেই একপত্নীনিষ্ঠ রাজার মহিষী, স্বামীর অতীব আদরিণী। আবার ইঁহারা তিনজনেই অরণ্যবাসিনী হয়েছিলেন; আবার নিজ নিজ জীবনযুদ্ধে বা সংসারক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই ভূমিকা ভিন্ন। সাদৃশ্য অনেক, আবার বৈসাদৃশ্যও কম নয়। আমরা এখানে প্রথমোক্তা দুজনের কথাই বলতে চাই। 'সীতা' 'সাবিত্রী' নাম পাশা-পাশি বা পরপর উচ্চারিত হলেও, দুজনের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু ভিন্নই নয়—সীতা যেন আমাদের মানবলোকের, সাবিত্রী দেব-লোকের। সাবিত্রীচরিত্রে আমরা অলৌকিকত্বই দেখতে পাই। সাবিত্রীর কার্যকলাপ অমানুষিক।

সাবিত্রীকে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় বিবাহের কিছু পূর্ব হতে। বিবাহের পর এক বৎসর পতিগৃহবাসকালে আমরা তাঁর দেখা ভালভাবে পাই। তাঁর চিন্তাধারা বা কার্যপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এই সময়টুকুর মধ্যেই। সাবিত্রীর জীবনের দুশ্চর তপস্যা, সাধনা এবং অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়, নিজ শক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস—সবই ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ণ-বিকশিত হয়। তাঁর জীবনের দুঃখকষ্ট, দুশ্চিন্তা ঐ স্বল্প সময়ে অতি প্রবল, আবার তার সমাপ্তিও ঐ সময়ের মধ্যেই। এবং এই জন্যই সাবিত্রীচরিত্র অলৌকিক, অমানুষিক। এদিক থেকে এই পুণ্যভূমি ভারতেও তাঁহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মেলা ভার।

অপ্রত্যাশিত অতর্কিত বিপদ, যা কত অজ্ঞাত, তা-ও মানবজীবনে অভাবিত-রূপেই এসে পড়ে; নিরুপায় মানব নির্বিবাদে মাথা পেতেই নিতে বাধ্য হয় তাকে। শোক, দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, যা পূর্বে অসহ মনে হয়েছে, বা কল্পনাতেও আসে নাই।

তাকেও সহ্য করে থাকতে বাধ্য হয় মানুষ এবং থাকেও। এই দৃষ্টান্ত আমরা নিজেদের জীবনেই দেখতে পাই। এ যুগে তো কথাই নাই। আগে হতে জানা এক নির্দিষ্ট দিনে এক অনিবার্য চরম বিপদ—তার দুশ্চিন্তার কোন তুলনাই নাই। এক বালিকার নববিবাহিত জীবন, স্বামী স্বনির্বাচিত; সেই স্বামীরই আয়ু মাত্র এক বৎসর। সতীত্বের, অমল ধবল মানসিক পবিত্রতার চরম দৃষ্টান্ত সাবিত্রীর সঙ্কল্প; সত্যবানকে মনে মনে স্বামী-রূপে বরণ করার পর সব কথা জেনেও, পিতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সত্যবানকেই বিবাহ করতে কৃতনিশ্চয়া—একবার যখন মনে মনে একজনকে স্বামী-রূপে বরণ করা হয়েছে তখন তার ব্যত্যয় আর কখনো কিছুতেই হতে পারে না!

রাজ্যহারা চক্ষুহীন দ্যুমৎসেন পত্নী ও পুত্র সত্যবান সহ বনবাসী। সত্যবান তাপস-কুমাররূপেই দৃষ্ট হন সাবিত্রীর চক্ষের সম্মুখে। তপস্যা-তেজদীপ্ত, বলিষ্ঠ, রূপবান সত্যবানই রাজতনয়াকে মুগ্ধ করেন। সাবিত্রী তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করলেন এবং তাঁর নাম ও পিতৃপরিচয় জ্ঞাত হয়ে, গৃহে ফিরে এসে তা জনকের গোচর করলেন। দেবর্ষি নারদ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই জানালেন যে, সত্যবান সর্ববিষয়ে সাবিত্রীর উপযুক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু তার পরমায়ু যে মাত্র আর এক বৎসরকাল। একথা জানিয়ে বারবার তিনি সাবিত্রীকে নিষেধ করলেন সত্যবানকে বিবাহ করতে; অন্য পতি নির্বাচন করতে বললেন। সাবিত্রীর পিতাও বহু প্রকারে চেষ্টা করলেন কন্যাকে তার পূর্বসঙ্কল্প ত্যাগ করাতে। কিন্তু সাবিত্রী নিজ সঙ্কল্পে অটল।

এই সময় হতেই আমরা প্রকৃতরূপে সাবিত্রীর পরিচয় পেতে আরম্ভ করি। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, অনুপম পবিত্রতা এবং অলৌকিক মনোবলের পরিচয় পাই আমরা এই মুহূর্তেই।

সাবিত্রীর জীবনে চরমবিপদ অতর্কিত মোটেই নয়, ধর্মনিষ্ঠার জন্য স্বেচ্ছাবৃত। অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে সাবিত্রী এ বিপদ বরণ করে নিয়েছিলেন নবজীবনে। আরও বিষম কাজ এই যে, জীবনের এতবড় সর্বনাশের বিষয় কারও সঙ্গে আলোচনা করে মনের ভার একটু লাঘব করারও উপায় নাই! সম্পূর্ণরূপে নিজের অন্তরে তা লুক্কায়িত রেখে প্রকাশ্যে অন্যভাব দেখিয়ে দিনযাপন করে যেতে হবে, যাতে বিবাহিত জীবনের স্বল্প একবৎসর কালটিতে স্বামীর মন কিছুমাত্র নিরানন্দ বা দুশ্চিন্তার ভরিয়ে তোলার কারণ না হয় সাবিত্রী! কত অসীম ধৈর্য এবং অ-পরিমিত সাহসের অধিকারী হলে এই কার্য সম্ভব! যার কল্পনাও নারী-মনে অতি ভয়ানক বিভীষিকার সঞ্চার করে সেই দুশ্চিন্তা এবং প্রতিকারহীন দণ্ডাদেশ-তুল্য অমোঘ বিধিলিপির প্রতীক্ষায় থেকে দিনের প্রতি পল, দণ্ড, প্রহর, সহজ সাধারণ ভাবে প্রকাশ্যে অতিবাহিত করা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। রাজকুমারী স্বেচ্ছায় বনবাসী তাপসকে বিবাহ করে বনবাসিনী হলেন, এ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে বিরল নয়, গৌরবেরই। কন্যার আগ্রহ দেখে সাবিত্রীর পিতারও আপত্তি সেদিক থেকে ছিল না; সত্যবান বনবাসী হলেও উচ্চ রাজকুলোদ্ভব। পিতা আপত্তি করেছিলেন, ভাবতেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল বলে আপত্তি করেছিলেন মাত্র এই কারণে—স্বল্পায়ু যুবক সাবিত্রীর পতি হবে?

সাবিত্রীর মনোভাব বিশ্লেষণ করা অতীব

দুরূহ। সাবিত্রী অতুলনীয়া—একথা অলঙ্করণের শব্দমাত্র নয়, প্রখর সূর্যালোকের ন্যায় সত্য। সাবিত্রীর জীবনের ঘটনার সমতুল্য ঘটনা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। একথা নিশ্চিত, সাবিত্রী ছিলেন দৃঢ়আত্মপ্রত্যয়সঞ্জাত অসীম সাহসের অধিকারিণী। এরই বলে তিনি সত্যবান আয়ুহীন জেনেও তাকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করেন, আর এই আত্মপ্রত্যয় ও সাহসের বলেই তিনি ধর্মরাজের নিকট হতে মৃতপতির জীবন প্রাপ্ত হন। এর ধারণাও সাধারণের কল্পনার বহির্ভূত। বাল্যের ব্রত-তপস্যা, বিশেষ করে বিবাহের পর এক বৎসরের কঠিন সাধনা, এবং অপূর্ব সংযম ও নিষ্ঠার সহিত আদর্শ বধূর কর্তব্য-পালনই, তাঁকে অলৌকিক শক্তির আধার-রূপে পরিণত করে। তাঁর সেই দণ্ড-পল-বিপলের প্রতীক্ষাকালের তপস্যাই দুশ্চর সাধনার ফলদান করে। সাবিত্রী-চরিত্র অপরিমেয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। আমরা যতটুকু তাঁর সাক্ষাৎ পাই, তার মধ্যে কোথাও নারী-জনসুলভ কৌতূহল বা চাপল্য বিন্দুমাত্র নাই। অসীম গাম্ভীর্যময় অথচ মধুরিমামণ্ডিত চরিত্র। দুঃখ, কষ্ট বিপদ, বেদনা—এসব স্বেচ্ছাবৃত বা স্বয়মাগত যাই-ই হোক না কেন, তা আমাদের অন্তরে সমভাবে পীড়াদায়ক। নিঃশব্দে তা সহ্য করা যে কত স্থিরতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচায়ক, তাহা সাধারণের ধারণার অতীত।

সীতা প্রায় আজীবনই দুঃখিনী, বনবাসিনী। দময়ন্তী ও শ্রীবৎস-পত্নী চিন্তাদেবী দীর্ঘকাল বনবাসিনী ছিলেন। দ্রৌপদীও বার বৎসর বনবাসিনী ছিলেন এবং অশেষ দুঃখ, কষ্ট, অপমান সহ্য করেছিলেন। সাবিত্রী মাত্র এক বৎসরকাল বনবাসে যাপন করেন। সেই এক বৎসর কোন বিপদ, অপমানাদির সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হয় নাই। কিন্তু সেই এক বৎসরের অতি কঠোর দৈহিক ও মানসিক তপস্যা ও ভয়াবহতা অসাধারণ এবং অপরিমেয় রূপেই গণিত হয়ে আসছে।

বৎসর-শেষের সাধনার পূর্ণসিদ্ধির সেই ঘোর কৃষ্ণাচতুর্দশীর নিশায় সাবিত্রীর বাহ্য-ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত অবস্থা। কাহারও সাধনা জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী। আবার কাহারও বা দিন, ক্ষণ, মুহূর্তব্যাপী। সাবিত্রী এই ভীষণ ক্ষণের সাধনায় অসীম একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার বলে, তপস্যার পুণ্যে ধর্মরাজ যমের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়নিষ্ঠা এবং সঙ্কল্পে অটলতা ফলপ্রসূ হল, ধর্মরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মৃত পতিকে পুনর্জীবন দান করলেন।

ধর্মরাজের প্রসন্নতা অর্জন করে সাবিত্রী তাঁর অন্ধ শ্বশুরের চক্ষু ও হৃতরাজ্য লাভের এবং নিজ অপুত্রক পিতার পুত্র-লাভের বরও পেলেন। এসব কি সাবিত্রীর জীবনের যে স্বল্পকালটুকুর পরিচয় আমরা পাই, সেই কালের সাধনার ফল? না তাঁর আবাল্য অথবা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল? সে যাহাই হউক, একটু নিশ্চিত যে সাবিত্রী সাধনাবলে, সতীত্ববলে দেবতাদের দর্শন লাভ করার মত ধর্মজীবনের উন্নত স্তরে সেই বয়সেই নিজেকে উন্নীত করেছিলেন। দেবতাদের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করে, দৃঢ়নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়বলে নিজ মৃত পতিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন আরও একজন ভারতীয় নারী—বেহুলা। তবে সে পটভূমি অন্যরূপ এবং প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে সে ঘটনার উল্লেখ নাই।

সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি যাঁরা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের উত্তুঙ্গ শিখরে আসীন রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে ভীষণ দুঃখদুর্যোগের দিন এসে প্রচণ্ড

আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং তখন অচঞ্চল নিষ্ঠার আদর্শে স্থির থেকে তাঁরা সকলেই সে অগ্নি-পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন সত্য, কিন্তু সে দুঃখ-বিপদের নিবিড় নিশার অবসানে তাঁদের জীবনে এসেছে সুখ-সম্পদের একটানা আলোকোল্লাস। মহীয়সী জানকীদেবীর জীবন এর ব্যতিক্রম—তাঁর জীবনের দুঃখদুর্যোগের কোন শেষ নাই, সমুদ্রের ঢেউএর মত একটা কাটতে না কাটতেই আর একটা এসে হাজির হয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সীতার চরিত্র তাই মহিমায় সর্বাধিক উজ্জ্বল, সীতা তাই ভারতীয় নারীত্বের অদ্বিতীয় আদর্শ।

মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের একমাত্র দুহিতা সীতাদেবী। আবার অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। অতুলনীয় বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী। লক্ষ্মণ তাঁর দেবর। রমণীমাত্রেরই যা কাম্য, তা পেয়ে তিনি সুখসৌভাগ্যের শীর্ষদেশে আসীনা। কিন্তু তাঁর মত অতি দুঃখের জীবনও আবার জগতে বিরল।

হিন্দুবালিকা বাল্যকালে সীতার ন্যায় সতী হবার প্রার্থনা ক'রে ব্রত করে। রামের ন্যায় পতি, দশরথের ন্যায় শ্বশুর কৌশল্যার মত শাশুড়ী, লক্ষ্মণের মত দেবর—এ সবই সাগ্রহে প্রার্থনা করে। কেবল সীতার মত দুঃখের জীবন চায় না। তাই হিন্দু বাঙ্গালী মায়েরা কন্যার নাম "সীতা" রাখেন না।

বিবাহের পর যে কয় বৎসর সীতা অযোধ্যা-বাস করেন, সেই সময়টিই তাঁর বিবাহিত জীবনের একমাত্র একটানা সুখসৌভাগ্যের সময়। তারপরই তাঁর জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সূচনা—রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমন। অশেষ ক্লেশময় বনবাস—তবু স্বামীর সহিত একত্রে থাকবার সৌভাগ্যে প্রাচীন কালের সতী নারীরা সে ক্লেশকে ক্লেশ বা দুঃখ বলে বোধ করতেন না; শেষজীবনেও রাজর্ষিরা অনেকেই অরণ্যবাসী হতেন; রানীরা সঙ্গেই থাকতেন। সীতা তাই অশেষ ক্লেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন বনবাসকালে। রামচন্দ্র সঙ্গে আছেন—এই আনন্দে বনকে তিনি রাজপুরী বলেই মনে করেছেন। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী: সাধ্বী পতিব্রতা নারী তাঁর স্বামীকে যত ভালবাসেন, নিজ সন্তানকে তার শতাংশের একাংশও নয়।

নারীজীবনের পরম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েও সীতা 'জনমদুখিনী' আখ্যাতেই আখ্যায়িতা। রাজরানী প্রাসাদবাসিনী সীতার ছবি মনে যেন জাগেই না। তাপসী, বনবাসিনী সীতার শান্ত ধীর পবিত্র কমনীয় মূর্তিই চোখের সামনে ভেসে উঠে।

সুদূর অতীত হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এবং অদূর ভবিষ্যতেও কত কবি, ঐতিহাসিক লেখকরা সীতার অতুলনীয় পবিত্র মহিমময় চরিত্র কীর্তন করে লেখনীকে ধন্য করেছেন ও করবেন। আমাদের সমাজের সর্ব স্তরে ও ক্ষেত্রে সীতা চিরপূজিতা। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, সমস্ত লোকের কাছেই সীতা পরিচিতা। সীতার কাহিনী পাঠকালে বা আলোচনা-প্রসঙ্গে আজও কল্পনায় চিরদুঃখিনী সীতাকে স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জন করে কত শত জন। আবার সে পবিত্রতার মূর্তিকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে ধন্য হয়, শুদ্ধ হয় বহুজন।

'ভারতীয় নারীর একমাত্র আদর্শ সীতার চরিত্রের অনুকরণেই সব পাবে। অন্য কিছুই প্রয়োজন হবে না। ওরূপ পবিত্রতা, শুদ্ধ পাতিব্রত্য, শান্ত ধীর কমনীয়তা, সরলতা, কুত্রাপি আর নাই।'

সীতার চরিত্রই হিন্দু নারীর সর্বোচ্চ আদর্শ—এ বাণী সীতাদেবীর উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। হিন্দু নারীর চরিত্র, মহত্ত্ব, সেবার ভাব প্রভৃতিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। তিনি নিজে ছিলেন অতি পবিত্র। সে কারণেই তিনি পবিত্রতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। সীতাদেবীর জীবনে এইটিই দেখা যায় যে যখনই তাঁর সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে চরম দুর্ভোগ। প্রথম, রঘুনাথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন—কী আনন্দের কথা! কিন্তু এল, রাজসিংহাসন নয়, অরণ্যবাস।

আবার অসহ দুঃখকষ্ট ভোগের পর, যখন দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হয়ে গেল, সামান্য এক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট, দৈবের ঘটনে সেই সৌভাগ্য-আগমনের মুখেই জনকনন্দিনী দশানন কর্তৃক অপহৃতা হয়ে সাগরপারে লঙ্কায় বন্দিনী হলেন!

তারপর সে দুঃখের অবসানে পবিত্রতা-স্বরূপিণী সীতাদেবী যখন পতিসন্নিধানে এলেন – তখন সানন্দ অভ্যর্থনার পরিবর্তে এল কঠোর বাক্য, এল অগ্নিপরীক্ষা। অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণা জানকীর গভীর আনন্দের মাঝে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের এবং রাজরানী হয়ে কিছুদিন পরমানন্দে থাকার পর নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা—মাতৃত্বের সূচনার মুখেই আবার দুঃখের দারুণ কশাঘাত! অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি বনে নির্বাসিতা হলেন।

সর্বংসহা ধরাদেবীর তনয়া সীতা। এ জন্যই ধরিত্রীর ন্যায়ই তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। যার তুলনা কোথাও নাই। স্বামীর প্রতি দোষারোপ ভুলেও কখন সীতাদেবী করেন নাই। সাগরতীরে অগ্নিপরীক্ষার পূর্বে যে রূঢ়বাক্য পতির মুখ হতে সীতাকে শুনতে হয়েছিল, তা অত্যন্ত অসম্মানসূচক—আর অতি হৃদয়বিদারক। দেবী জানকী চিরদিন নিজ ভাগ্যের প্রতিই দোষারোপ করেছেন। স্বামীর কোন দোষ সীতা কখনও দেখেন নাই। কোন অনুযোগ, অভিযোগ, কিছুই না; ভাবতেন, সবই তাঁর হতভাগ্যের দোষ। স্বামীর প্রতি এত বিশ্বাস, এত নির্ভরতা, আর সর্বোপরি অসীম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা, যার তুলনা সর্বযুগে সর্বকালে জগতে আর দেখা যায় নাই। এ কারণেই সীতা সর্বজনপূজিতা, সর্ব হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমের আসনে সমাসীনা।

বনবাসে নিজের অসহ ক্লেশ, যাতনা, অসম্মানকে সীতা একবারও মনে স্থান দেন নাই। নিরন্তর মনোবেদনা পেয়েছেন এই ভেবে যে, তাঁর জন্য, তাঁর কথা মনে করে স্বামী দুঃখ পাচ্ছেন। অভাগিনী তিনি স্বামীর সেবায় বঞ্চিতা ত হয়েছেনই, অধিকন্তু, স্বামীর মনঃকষ্টের কারণ হয়েছেন—তাকে ছেড়ে, তাঁর বিরহে, স্বামীর যে কত কষ্টে দিন যাচ্ছে! ইহাই তাঁর দিনরাত্রির যাতনা ও চিন্তার কারণ। এ প্রেম, এ ভালবাসা শুধু স্বর্গীয় নয়, আরও অনেক উচ্চস্তরের, যার উপমা নাই! রাজকুমার-যুগলের জন্মের পরও তাঁর প্রধান দুঃখের কারণ, স্বামী এদের দর্শন করে কত আনন্দিত হতেন, তাঁকে সে আনন্দ দেওয়া অভাগিনী সীতার ভাগ্যে ঘটল না। রামচন্দ্রের কোন দোষ কোন অবস্থায় কখনো তিনি দেখেন নাই। সর্বাবস্থায় রামচন্দ্রের আসন তাঁর হৃদয়ে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত—'রামময়-জীবিতা' তিনি। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।

আবার একথাও নিঃসন্দেহ যে, সীতাকে বনবাসে পাঠান রঘুনাথের ন্যায়-অন্যায় যা-ই হোক না কেন, তাঁর একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম তুলনাহীন। স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে তিনি পত্নীর

স্থান পূর্ণ করেছিলেন—অন্য পত্নী গ্রহণের কল্পনাও তার মনে স্থান পায় নাই। রামচন্দ্র হতে দূরে থেকে সীতা বনে যে অপরিসীম বেদনা পেয়েছেন, অযোধ্যায় থেকেও রামচন্দ্রের মনোবেদনার পরিমাণ তার চেয়ে কম নয়। তাই তো হিন্দু বালিকা সীতার পতি-ভাগ্যের কামনা করে ব্রতানুষ্ঠান করে—'রঘুনাথের মত স্বামী পাই যেন।'

সীতা অভাগিনী—চিরদুঃখিনী। আবার সীতা পরম সৌভাগ্যশালিনী—রামচন্দ্রের অতুলনীয় অপার্থিব প্রেম-ভালবাসার অধিকারিণী। অপূর্ব এই দুই চরিত্রই।

তারপর আবার আনন্দের দিনের অরুণ-রাগ দেখা দিল। অশ্বমেধ যজ্ঞশালায় লবকুশের রামায়ণগানের পর বাল্মীকি লবকুশের পরিচয় দিয়েছেন সভাস্থলে, সীতাদেবীর কথা জানিয়েছেন এবং সীতাদেবীকে রামচন্দ্র আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনব্যাপী একের পর এক আসা দুঃখের দুর্যোগরাত্রিগুলি অতিক্রম করে এসে শেষ জীবনটুকু বোধ হয় একটানা পরমানন্দে কাটবে পতি ও পুত্রদের নিয়ে একত্র বাস করে। কিন্তু 'জনমদুখিনী' সীতার ভাগ্য এই পরম মুহূর্তেই চরম আঘাত হানল—শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সর্বজনসমক্ষে দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন।

এই গভীরতম তমসাময় নিশার অগ্রদূত গোধূলিকেই কি সীতা তাহলে আলোকোজ্জ্বল দিবার অগ্রদূত অরুণরাগ বলে ভুল করেছিলেন? এই কি তাঁর আজকের অভ্যর্থনা, প্রজাগণের নিকট তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের মূল্য কি এই—এখনো তাঁকে পরীক্ষা দিতে হবে পতি, পুত্র, রাজন্যবর্গ ও প্রজাকুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে!

আজীবন দুঃখ কষ্ট দুর্দশা লাঞ্ছনা যাঁর অঙ্গের আভরণস্বরূপ হয়েছিল, জীবনে শত বিপদেও যিনি অধৈর্য হন নাই বা কোন অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, সেই সহিষ্ণুতার অনবদ্য প্রতিমা সীতার এবার ধৈর্যচ্যুতি হল, আর সহ্য করা যায় না! দারুণ লজ্জা, অসহ অসম্মান ও অভিমানে অধীরা হয়ে সীতা সেই প্রকাশ্য রাজসভাতেই তাঁর জননী ধরিত্রীদেবীকে আহ্বান করলেন। জানকীর পবিত্রতা, দেবীত্ব ও অপূর্ব পাতিব্রত্যের নিদর্শনরূপেই ধরিত্রীদেবী সেই প্রকাশ্য রাজসভায় আবির্ভূতা হয়ে সীতাকে অঙ্কে ধারণ করলেন। গ্লানি ও লজ্জার হাত হতে অভিমানিনী কন্যাকে নিয়ে তিনি ভূগর্ভে অদৃশ্যা হলেন! এই করুণ বেদনার মধ্যেই সীতার নশ্বর দেহের অবসান হল। ধরিত্রীর মতই সহনশীলা ধরিত্রীকন্যা ধরাধাম হতে চির বিদায় নিলেন।

কিন্তু ভারতের মনে তিনি রইলেন চিরজীবী হয়েই। তাঁর অতুলনীয় চরিত্র অসামান্য পাতিব্রত্য ও সতীত্ব বিপুল গৌরবময়, এক চিরপুণ্যময় কাহিনীরূপে অমরত্ব লাভ করল। তাঁর জীবনাদর্শ প্রাসাদ থেকে কুটির পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র ছেয়ে আছে ও থাকবে। কোন সুদূর অতীত হতে আজও, ভবিষ্যতেও যতদিন মানব ও মানবসমাজের অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে, সীতার নাম চির উজ্জ্বল দীপ্তিমান থাকবে আদর্শ ও পূজনীয় রূপে। সীতার পুণ্যময় পবিত্র জীবনকাহিনী কীর্তন করে ভারতীয় নারীগণ চিরদিন নিজেদের পবিত্র বোধ করবেন আর এই গৌরব-গাথায় নিজেদেরও গৌরবান্বিত মনে করবেন। আর নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে তাঁকে গ্রহণ করে নিজের হৃদয়-মনের অকপট ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য সানন্দে অর্পণ করবেন দেবী জানকীর চরণোদ্দেশে।

অভিনব সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল সকলেই জানেন, যে দিব্য শিশু একদা বাংলার এক নিভৃত ও নগণ্য পল্লী কামারপুকুরে দ্বিজ ক্ষুদিরাম ও দেবী চন্দ্রমণির কনিষ্ঠ পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া গদাধর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং সেখানে অপূর্ব বাল্য ও কৈশোর লীলা সাঙ্গ করিয়া অলঙ্ঘ্য দৈব বিধানে অগ্রজ রামকুমারের সহিত মহানগরী কলিকাতায় আগমন পূর্বক প্রথমে ঝামাপুকুরে স্বল্পকাল এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের সুসন্নিহিত কোন কক্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তিকালে সর্বধর্ম-সমন্বয়কারী যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন।

অবশ্য সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেন। নানাজনে তাঁহাকে নানারূপে, যথা—বদ্ধোন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত, বায়ু-রোগাক্রান্ত, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন', এবং ভাষায় অপ্রকাশ্য আরও কত-কিছু রূপে দেখিতেন। আবার অনেকে তাঁহাকে নারায়ণ, শিব, কালী, শিব-কালী, রাম, কৃষ্ণ, যীশু, শ্রীগৌরাঙ্গ, বালগোপাল, সখা, জননী, পিতা, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, ভক্ত-চূড়ামণি, আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসী, গৃহস্থ অথচ সন্ন্যাসী, ত্যাগিসম্রাট্, সর্বজ্ঞ, লোকগুরু, রসিকচূড়ামণি, সিদ্ধ মহাপুরুষ, যুগাবতার, অবতারবরিষ্ঠ, শ্রীভগবান, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভৃতিরূপে মনে করিতেন।

অনেকেরই সম্ভবতঃ সেই কারণে মনে হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তবে বহুরূপী ছিলেন! তিনি যে কি ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সত্যই সুকঠিন। একই ব্যক্তিত্বের এইরূপ বিচিত্র বিপরীতমুখী অভিব্যক্তি বিস্ময়াবহ। মনে হয়, কোন সুনিপুণ অভিনেতা যেন যুগপৎ সকল ভূমিকায় একাই অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা কোন সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিক অনির্বচনীয় মায়াপ্রভাবে দর্শকবৃন্দের নিকট আপনাকে যেন একই কালে নানারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন!

বস্তুতঃ এইরূপ ধারণা করিলে হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, যাঁহারা নানা কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণাদি সম্বন্ধে যাথার্থ্য নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বদ্ধোন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক প্রভৃতি রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানেও এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নহে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা পারত্রিক কল্যাণলাভের জন্য ব্যাকুল, পুণ্যের পরিণামবশে যাঁহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, যাঁহারা স্বভাবতই বিবেক-বৈরাগ্যবান্ এবং তিতিক্ষাপরায়ণ, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে চৈতন্যোদয়ে যাঁহারা ঐহিক স্থূল বিষয়ভোগে বীতরাগ, নানা বাসনাসক্ত এবং দুষ্কৃতকারী হইয়াও যাঁহারা সরল বিশ্বাসী, যাঁহারা আজন্ম পবিত্রহৃদয় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসকল ধারণা করিতে সমর্থ, অথবা যাঁহারা ঈশ্বরীয় সগুণ বা নিগুর্ণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সুতীব্র সাধনভজনশীল, এইরূপ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ লীলাপার্ষদ এবং সাধু-ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নানা দেবদেবীরূপে, শ্রীভগবানের অবতাররূপে, যথার্থ জ্ঞানী, প্রেমিক, ভক্ত, সিদ্ধ প্রভৃতি রূপে. অথবা

পিতা, মাতা, সখা, পুত্রাদি রূপে ভাবিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং বর্তমানেও কোন কোন ভাগ্যবান্ তদ্রূপই ভাবিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব সুকঠিন নানা ধর্মমত-সাধনার হোমানলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সুবলিত, সুঠাম, নয়নাভিরাম তনুখানি তিলে তিলে আহুতি দিয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিলেন। সাধন-সময়ে তিনি এইরূপ তন্ময় হইয়া ঈশ্বরীয় ভাব-সমুদ্রে অবগাহন করিতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান এককালে তিরোহিত হইয়া যাইত। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া যখন তিনি অর্ধবাহ্য ও বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইতেন, তখন তিনি এইরূপ কথাবার্তা বলিতেন ও আচরণ করিতেন যে, সাধনরাজ্যে প্রবেশাধিকারবর্জিত ঐহিক-ভোগবাদিগণ তাহা অনেক সময় অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা অস্বাভাবিক বিকৃতি বলিয়া ধারণা করিয়া বসিত। এইরূপে দুরধিগম্য ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে তাঁহার যে ভাবতন্ময়তা উপস্থিত হইত, তাহা দেখিয়া বা তদ্বিষয়ে শুনিয়াও পূর্বোক্ত হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ইত্যাদিরূপে মনে করিয়াছিলেন। এই কথা আজ অনেকেই বুঝিতে সমর্থ।

বেদ-পুরাণ- ও তন্ত্র-সমন্বিত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক মতসমূহের তথা ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্মমতদ্বয়ের সাধনায় একই ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ চরমসিদ্ধি অত্যল্পকালের মধ্যে করামলকবৎ প্রাপ্ত হইতে ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কেহই সমর্থ হন নাই। অধিকন্তু এককজীবনে বহুধা বিচিত্র বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ যে কার্যতঃ সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই আজ পর্যন্ত প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। অনেকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে এতগুলি ধর্মমতের সাধন করিবার কিই বা প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও তর্কসঙ্কুল বৈজ্ঞানিকযুগে আবির্ভূত হইয়া প্রায় নিরক্ষর হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তিনি প্রসিদ্ধ প্রায় তাবৎ ধর্মমতগুলির সত্যতা 'হাতে-কলমে' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং পরিশেষে 'যত মত, তত পথ'-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এইভাবেই তিনি বিবদমান ধর্মমতসমূহের আপাতবিরোধ পরিহারের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের প্রচারিত তত্ত্ব বা মতবাদ বহু বাস্তব সমীক্ষা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সর্বসাধারণগ্রাহ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত 'যত মত, তত পথ'-রূপ ক্রিয়াসিদ্ধ অতএব অভিনব মতবাদটি এইজন্যই নানা ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ ও বিভেদ-সমূহ বস্তুতঃ দূরীভূত করিতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে স্বীকার্য।

সাধনার তিনটি প্রসিদ্ধ স্তর, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত, আপাতবিরুদ্ধ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আচরণের দ্বারা অদ্ভুতভাবে সমর্থিত ও সমন্বিত হইয়াছে। রুচি ও অধিকার ভেদে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। চরম সত্য লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে সোপান-আরোহণ-ক্রমন্যায়ে সাধক যে দ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতে এবং বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে অদ্বৈত ভূমিতে আরূঢ় হইতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন তাহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ

বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার অলৌকিক অনুভূতি ও আচরণসমূহ উক্ত ভূমিগুলির প্রত্যেকটির সার্থকতা ও সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে। একই সূর্যের বা যে কোন পদার্থের বিভিন্ন দূরত্বে গৃহীত বিভিন্ন চিত্রগুলি প্রত্যেকটিই যেমন আপেক্ষিকরূপে সত্য, তেমনি একই ঈশ্বর-তত্ত্ব বিভিন্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্নভূমিতে অবস্থানকালে জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপে, জীব-জগদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বররূপে এবং সর্বপ্রপঞ্চোপশম—শান্ত, শিব, অদ্বৈত, কূটস্থ, সচ্চিদানন্দ, নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মরূপে অনুভূত হইলেও তাদৃশ অনুভূতিসমূহের প্রত্যেকটিই অবস্থাভেদে সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভূমিতে স্থিত হইয়া ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার এবং আরও কতপ্রকার ভাবই না অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও বিচিত্রতা সত্যই মানববুদ্ধির অগম্য!

প্রত্যেক ধর্মমতের সাধনায় কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগপদ্ধতি অল্পাধিক পরিমাণে অনুসৃত হইয়া থাকে। উক্ত চারিটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিই প্রকৃষ্টভাবে ঈশ্বরলাভের উপযোগী—ইহা শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে। পূর্বকালে বিবদমান উক্ত চতুর্বিধ পদ্ধতির অনুশীলনকারীরা একে অন্যকে সমর্থন করিতেন না। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইলেন যে, উক্ত যে কোন একটি পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন করিতে পারিলে সাধক চরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে গীতোক্ত উক্ত সকল পদ্ধতিগুলি সমন্বিতরূপে অনুসৃত হইতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার মর্ত্য জীবনের ঘটনাবলী নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই কথাই সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি ছিলেন নিষ্কামকর্ম, অহৈতুকী ভগবদ্‌ভক্তি, অদ্বৈতজ্ঞান এবং সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগের সমন্বয়ঘনমূর্তি! তাঁহার অপূর্বসাধনপূত, ক্রিয়াসিদ্ধ, দিব্য জীবন চিরকালের জন্য কর্মী, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীদিগের সাম্প্রদায়িক ভেদবিদ্বেষ প্রকৃতপক্ষে দূর করিয়া দিবার সবিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃপূত ভাবৈশ্বর্যময় অনন্ত জীবনে সংসার এবং সন্ন্যাস আশ্রমেরও অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। দাম্পত্য জীবনেও যে সম্পূর্ণ দেহভাববর্জিত, কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত না হইলে হয়ত অকল্পনীয়ই থাকিয়া যাইত। দেহাতীত বিশুদ্ধ প্রেম শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর জীবনে যেইরূপ অদ্ভুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে যাইলে বিস্ময়বিমূঢ় হইতে হয়! তাঁহারা উভয়ে যে দিব্যভাবে আরূঢ় হইয়া পরস্পর দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়াছিলেন, তাহা এককালে সকল জৈব প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ না হইলে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা বুঝিতে কোন কষ্টকল্পনার আবশ্যকতা নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সহধর্মিণী সারদামণি দেবীকে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রী৺জগদম্বার মূর্ত বিগ্রহ-রূপে সত্যসত্যই দেখিতে পান—এই কথা তিনি নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন! অবশ্য তিনি কখন কখন নিজ সহধর্মিণীর প্রতি লৌকিকভাবে স্বামী ও গুরুর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইয়াছেন। সারদাদেবীও শ্রীরাম-কৃষ্ণকে সত্যসত্যই শ্রীশ্রী৺জগদম্বার মূর্ত বিগ্রহ-রূপে দর্শন করিয়াও লৌকিকভাবে স্ত্রী ও শিষ্যার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইয়াছেন! ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে অপূর্ব সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর যুগল ও ব্যক্তিগত জীবনে লক্ষ্যগোচর হয়,

তাহার দৃষ্টান্ত এই দিব্য দম্পতী ভিন্ন আর কেহই আজ পর্যন্ত স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীসারদাদেবীকে পারমার্থিকভাবে শ্রীশ্রী৺জগদম্বার মূর্ত বিগ্রহরূপে দর্শনের চরম দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্থাপন করিলেন এক মহা শুভলগ্নে, এক ৺ফলহারিণী কালিকা-পূজার রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঅঙ্গস্পর্শপূত সেই কক্ষে। তাঁহার সম্মুখে সমাসীনা বাহ্য-সংজ্ঞাহীনা সেই অনির্বচনীয়া দেবীর দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীকে আবির্ভূত হইবার ও সর্বসিদ্ধির দ্বার উন্মোচন করিবার আকুল প্রার্থনা জানাইলেন সেই দিব্যোন্মাদ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই দেবীর শ্রীপাদপদ্মে তিনি তাঁহার সকল সাধনার ফলের সহিত নিজ জপমালাও সমর্পণ করিলেন। অনির্বচনীয়া হইয়াও শ্রীসারদাদেবী এই যুগের মানব-মানবীর মনে এই জিজ্ঞাসাই বারংবার জাগাইয়া তুলেন, তিনি কোন মহাশক্তি যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হইয়াও তাঁহার মত সাধকের পূজা তত্ত্বতঃ গ্রহণ করিবার অধিকারিণী হইয়াছিলেন! তিনি যে প্রকৃতপক্ষে ৺জগদম্বা, ৺দুর্গা বা ৺সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়, শিববোধে জীবসেবা ও রমণীমাত্রেই মাতৃভাবরূপ নবযুগ-ধর্মচক্রপ্রবর্তনে সহায়িকা ও লীলানায়িকা হইয়া সংসারজ্বালা নিবারণপূর্বক অভয় মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া বহু ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন করিবার জন্য নর-দেহ ধারণ করিয়াছিলেন—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীসমূহ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বোধগম্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দুরবগাহ ঘনীভূত মাতৃভাব লুক্কায়িত ছিল। উপযুক্ত আধার, তাঁহার দিব্য লীলা-সঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীতেও সেই মাতৃভাব মহালগ্নে মাতৃপূজার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ মাত্রায় উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে জগন্মাতৃত্বের আসনে লৌকিকদৃষ্টিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই শুভক্ষণ হইতে শ্রীসারদাদেবী হইলেন বিশ্বের সকল জীবের ইহকালের ও পরকালের মা! সারদাদেবীর মাতা শ্যামাসুন্দরী একবার দুঃখ করিয়াছিলেন যে কন্যার 'মা' বলিয়া ডাকার মত একটি সন্তানও হইল না। শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, সারদাদেবীকে পরে 'মা' ডাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে। তাই তাঁহার স্থূল শরীরে অবস্থান কালেই এবং অন্তর্ধানের পর আজ সারা বিশ্বে তিনি শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এবং "The Holy Mother" রূপে বন্দিত ও পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য বহুবিধ আচরণেও আদর্শ সংসারীর জীবন কত উচ্চ, পবিত্র ও মধুময় হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, সামাজিক জীবনের কোন স্তরের মানুষের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে ও কথাবার্তা বলিতে হইবে, সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কর্তব্য কিভাবে সম্পাদন করিতে হইবে, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, গার্হস্থ্য-জীবনে কোন্ কোন্ শাস্ত্র ও লোকাচার কি ভাবে মান্য করিয়া চলিতে হইবে—এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক বাহ্যভূমিতে অবস্থানকালে তাঁহার সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি থাকিত। তবে ইহা পরম আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁহার সাংসারিক বিষয় ও ব্যাপারে আঁট ও আসক্তি ঠিক যেন পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মতই ছিল। সাধারণ ভূমিতে রঙ্গরসাদিতে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই মুহূর্তের মধ্যে তিনি কি করিয়া যে দিব্যভাব-

ভূমিতে সমাহিত হইয়া যাইতেন, আবার সমাধিভঙ্গের কিছুক্ষণ পরে পুনরায় মানবীয় ভাবে অবতরণ করিয়া সহজ মানুষ হইয়া যাইতেন, তাহা ধারণা করা মানবের দুঃসাধ্য!

বিবাহ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অনাসক্তি, ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ্ কখনও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই! আবার আজন্ম পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হওয়ায় এবং সর্ব-অবস্থায় সকল প্রকার প্রলোভন-মুক্ত থাকায় এবং শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মাত্র তিনদিনের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে আরূঢ় হইয়া ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াও পুনরায় শ্রীশ্রী৺জগদম্বার আদেশে "ভাবমুখে" অবস্থান করিতে থাকায় তিনি জগদ্‌গুরু পরমহংস সন্ন্যাসীদিগেরও অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন! সংযম, ত্যাগ ও পূর্ণ-অনাসক্তি-তেই সন্ন্যাসের প্রতিষ্ঠা! শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আজন্ম সন্ন্যাসপ্রতিষ্ঠই ছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিক সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ নিজ সহধর্মিণী সারদামণিকে তিনি চিরাচরিত সন্ন্যাসবিধিমতে কখনও পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক-বেশে ভিক্ষাটনাদি বা আকাশবৃত্তিতে লিপ্ত হ'ন নাই। মনে হইতে পারে তিনি কি তবে চিরাচরিত শাস্ত্রীয় সন্ন্যাসবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য কথঞ্চিৎ নেতিবাচকই ইহাতে বাধ্য! তাঁহার আচরণসমূহ সর্বাংশে পরিপূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্র ও সনাতনধর্মের মূল লক্ষ্যকে অনুসরণ করিয়াছে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না! জীবকোটী সাধক এবং বিষয়বাসনামলিন সাধারণ মানবকুলের চিত্তশুদ্ধি পূর্বক উন্নততর অবস্থা লাভের উদ্দেশ্যেই ধর্ম ও মোক্ষ শাস্ত্রে সংস্কারমূলক নানা বিধি ও নিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে। আজন্ম শুদ্ধ ও পবিত্রহৃদয় অবতার, ঈশ্বর-কোটী ও আধিকারিক মহাপুরুষদিগের জন্য বস্তুতঃ কোনও বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইতে পারে না! "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ"—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পথে বিচরণশীল মহাত্মাদিগের পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি? শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রতিপালন ব্যাপারে তাঁহারা কখনই পরতন্ত্র নহেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ ও স্বর্গাদি ইষ্টপ্রাপ্তি এবং দুঃখ ও নরকাদি অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা তাদৃশ ব্যাপারে কখনই তাঁহাদিগের নিয়ামক হয় না। ইচ্ছা হইলে তাঁহারা বিধিনিষেধ মানিতেও পারেন, আবার না মানিতেও পারেন!

যিনি মুহুর্মুহুঃ দেহবোধরহিত হইয়া কখন ভাবসমাধি কখন বা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, যিনি এককালে ধাতুদ্রব্যের স্পর্শমাত্র বৃশ্চিক-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন, যিনি অনুক্ষণ রমণীমাত্রেই আদ্যাশক্তি ৺জগজ্জননীর মূর্ত বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করিতে পারিতেন না, যিনি ৺জগদম্বার ক্রোড়ে মাতৃগতপ্রাণ, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় আপনাকে বাহ্য দশায় ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগী, অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি?

ঈশ্বরানুভূতিলাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া সনাতন ধর্মশাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। বিবিধ ধর্মানুবর্তীদের ভেকাদি বিবিধ সংস্কার ও অনুষ্ঠান যথার্থতঃ ধর্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিবার পক্ষে উদ্দীপক ও স্মারক

মাত্র! ঈশ্বরলাভের পর সংস্কার ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির কোন আবশ্যকতা থাকে না। তথাপি যে ঈশ্বরানুভূতিবান্, জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষগণ সন্ন্যাসীর চিহ্ন ধারণ ও আচার প্রতিপালন করেন, তাহা কেবল শিষ্যশিক্ষা ও লোককল্যাণার্থই হইয়া থাকে! সেই জন্যই পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে, "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে"— এই শ্রীভগবদ্‌বচন অনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ সহধর্মিণীকে কি বিধিমতে ত্যাগ করা উচিত ছিল না? শ্রীভগবান বুদ্ধ ও শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো সন্ন্যাস বিধিমতে নিজ নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন তাহা করিলেন না? আরও প্রশ্ন উঠে, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শী এবং সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময়ীভাবাপন্ন লোকগুরু মহাপুরুষ আদৌ বিবাহ করিলেন কেন?

উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর এইরূপ হইতে পারে যে, পূর্ণ পবিত্রতা ও সংযম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সন্ন্যাসিগণ আদৌ বিবাহ করেন না অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে গৃহস্থ থাকিলেও সন্ন্যাসগ্রহণান্তর নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত ঐহিক মায়িক সম্পর্ক চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন। পূর্ণ পবিত্রতা দীর্ঘকাল নিরন্তর রক্ষিত না হইলে শরীর ও মন সর্বোচ্চস্তরের অনুভূতিসমূহ ধারণা করিবার উপযুক্ত হয় না; এই জন্যই সন্ন্যাসিগণ সর্বপ্রকার এষণা, বিশেষতঃ পুত্র, বিত্ত ও লোকৈষণা পরিহার করিয়া সেই সেই এষণার বিষয় ও উত্তেজক কারণ হইতে বহু দূরে অবস্থান করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মন সর্বদাই এত উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকিত যে তাহাকে অতিকষ্টে তিনি কয়েক গ্রাম নীচে নামাইয়া আনিতেন কেবলমাত্র জীবকল্যাণকামনায়, ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে। স্বভাবসিদ্ধ কামকাঞ্চনত্যাগী, ত্যাগ ও পবিত্রতার ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, নিজ পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল একত্র বাস এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়া দীর্ঘদিন একাকী অবস্থান—উভয়ই ফলতঃ সমানার্থক ছিল। এই ব্যাপারে তথাপি যে শাস্ত্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা আমাদিগের নিকট ইষ্টাপত্তি বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ মানবমানবীর নিয়ামক বিধিনিষেধসমূহ অবতার, ঈশ্বরকোটী, আধিকারিক এবং লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষদিগের জন্য ব্যবস্থিত নহে! পুনশ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে কি আমরা বিশ্বমাতৃত্বের অমৃতপ্রস্রবণস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীকে পাইতাম, যিনি জঠরে একটিমাত্র সন্তান ধারণ না করিয়াও আজ কোটী কোটী সন্তানের আকুল 'মা, মা'-ধ্বনিতে সাড়া দিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদারূপী দিব্যদম্পতী কি অসংশয়ে প্রমাণ করিলেন না যে, জৈব প্রবৃত্তির অধীন না হইলেও বিশুদ্ধ সন্তান-স্নেহ বিশ্বপ্লাবী হইতে পারে এবং তাঁহাদের উভয়নিষ্ঠ সন্তানবাৎসল্য যে কোন মানবদম্পতীর বাৎসল্য অপেক্ষা সহস্র-সহস্রগুণ মধুর ও স্বার্থশূন্য?

বলিতে কি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার দেহভাববর্জিত, অতিপবিত্র সাত্ত্বিক সম্পর্ক কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, উভয়ের সম্মুখেই এক জলন্ত ত্যাগ ও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতার আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছে! তাঁহাদের যুগ্মজীবন গৃহিমাত্রকেই জৈবস্তরের ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া দেহাতীত বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার এবং

সন্ন্যাসিমাত্রকেই আচারমূলক ত্যাগ হইতে পূর্ণ অনাসক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রেরণা চিরকালের জন্য যোগাইতে থাকিবে। তাঁহাদের দিব্য দাম্পত্যজীবন সর্বস্তরের মানবমানবীর নিকট আদর্শ জীবন গঠনের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম ও অননুকরণীয় আচরণসমূহে ঈশ্বরীয় নিত্য- এবং লীলা-বাদেরও অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সমস্ত কিছু হইয়াছেন—এই দ্বিবিধ উপনিষদুক্ত অনুভূতিই যে যথার্থ, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্রুব অনুভূতিমূলক নানা উক্তির দ্বারাই সমর্থিত হয়! 'অহং'-বোধ যতক্ষণ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ বুঝিবার সাধ্য নাই যে, বৈচিত্র্যময় এই নিখিল প্রপঞ্চ মিথ্যা। 'অহং'-বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলেই কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রতীয়মান পদার্থ মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত একমাত্র বিজ্ঞানীই ঈশ্বরের নিত্য ও লীলাভাব অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জীবকোটী সাধক ভাগ্যক্রমে নিত্যভাব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ব্যুত্থিত হইয়া লীলাভাব প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন না। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনুলোম-বিলোমক্রমে, 'নেতি-নেতি' ও 'ইতি-ইতি' অর্থাৎ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদবর্জিত নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম এবং চিদচিদ্বিশিষ্ট অশেষকল্যাণগুণগণ সোপাধিক সগুণ ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অভিন্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যে তত্তদ্ভাবে গৃহীত হন মাত্র! ব্যাবহারিক দশায় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারসমূহ অহরহঃ সর্ব প্রাণীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ! সুতরাং লীলাবাদে জগতের প্রাতিভাসিকত্ব বা শূন্যত্ব স্বীকৃত হয় না। নিত্যবাদে জগতে জগদ্দৃষ্টি তুচ্ছ বা মায়িক। সর্বত্র সর্বকালে একমাত্র অখণ্ডৈকরস চৈতন্যের স্ফুরণমাত্র থাকে। উহা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ ত্রিপুটীর বিলীনাবস্থা বলিয়া কথিত হয়। লীলাবাদে মায়োপাধিক ব্রহ্ম মায়াবিশিষ্ট হইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে আপনাকে বিলসিত করিয়া নানা জীব ও জগদ্রূপে প্রতিভাত হন। তিনি তাঁহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির প্রভাবে সংসার-রঙ্গমঞ্চে যেন কোন অদ্ভুত প্রতিভাশালী নটের ন্যায় একাই বিবিধ ভূমিকায় অভিনয় করেন! নিত্যবাদে এক অদ্বিতীয় নির্গুণ চৈতন্যই সদা বিদ্যমান। লীলাবাদে সেই চৈতন্য সগুণরূপে অবধারিত হইয়া ভূতে ভূতে অনুস্যূত, ওতপ্রোত এবং চিদ্জড়বিশিষ্ট নিখিল প্রপঞ্চান্তগত সকল মূর্ত ও অমূর্ত পদার্থরূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণোক্ত বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিত্য ও লীলা উভয় বাদই সামঞ্জস্যপূর্ণ! উক্ত নিত্য ও লীলাদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসবৎ এতই সহজ ছিল, এতই অবলীলাক্রমে তিনি লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায় আরোহণ ও অবরোহণ করিতে পারিতেন যে, তাহা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে বিরল!

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখকথিত দিব্য অনুভূতি-মূলক বাণীসমূহে (যাহার কিয়দংশ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পরম পূজ্যপাদ ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত [শ্রীম.] কর্তৃক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে বিধৃত হইয়াছে), তাঁহার লীলাপার্ষদ বিবেকানন্দপ্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষবৃন্দের উক্তিসমূহে, বিশেষতঃ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" নামক প্রামাণিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনচরিতে ও প্রাতঃস্মরণীয় ৺অক্ষয়-কুমার সেন প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি" নামক সুললিত কবিতা-গ্রন্থে এবং মোক্ষমূলার, রমাঁ রলাঁ প্রমুখ প্রতীচ্যের মনীষিবৃন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শ্রদ্ধাপুত তাত্ত্বিক আলোচনায় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত সমন্বয়বার্তাসমূহ সার্থকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন : প্রকাশক—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩১২ ; মূল্য ৩·২৫ টাকা।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সমুদ্রের মতোই বিপুল ও বিরাট। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার অভিমত হাতের কাছে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। স্বামীজীর মৌলিক রচনা, পত্র, কথোপকথন, বক্তৃতা প্রভৃতিতে বহু তথ্য-পূর্ণ জনকল্যাণকর উক্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য উক্তিগুলি একত্র সংগৃহীত হইলে সর্বসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হইবে—এই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর পূর্বে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাহাই নব কলেবরে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন' নামে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

নবপ্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানির উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। স্বামীজীর অমূল্য বাণীগুলি এমনভাবে সাজানো হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি বিষয় সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থখানির কয়েকটি অধ্যায়ের পরিচিতি : 'ভারতের বৈশিষ্ট্য', 'ভারতের অবনতির কারণ', 'ভারতের পুনরুত্থানের উপায়', 'শিক্ষা', 'সমাজ', 'ধর্ম', 'ঈশ্বর', 'উপনিষদ্ বা বেদান্ত' 'ত্যাগ ও বৈরাগ্য' 'সেবা ও পরোপকার', 'বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা', 'চরিত্র,' 'নেতা'। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' এবং 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'র কোথায় উদ্ধৃতিগুলি পাওয়া যাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া পাদটীকা প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানির মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থখানি একদিকে বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর প্রামাণ্য উক্তিগুলির সহিত পরিচয় ঘটাইবে, অপর দিকে তাঁহার মহাজীবন অনুধ্যানে ও তাঁহার সঞ্জীবনী বাণীর অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিবে বলিতে পারা যায়।

পাতঞ্জল-দর্শনম্—শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক : শ্রীকেশবলাল মেহতা, ৩৬এইচ, গিরীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ২০৮ ; মূল্য ২·২৫ টাকা।

পাতঞ্জল দর্শন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহা প্রত্যেক সাধকের নিত্য প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় গ্রন্থ। ভারতীয় সাধনার বহু বিচিত্র ধারার মধ্যে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য অপরিহার্যরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখা যায়, কারণ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনই সাধনার অর্থ। চিত্ত-বিশ্লেষণ এবং চিত্তের একাগ্রতা ও নৈর্মল্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পাতঞ্জল দর্শন অদ্বিতীয় ও অনন্য।

আলোচ্য গ্রন্থে পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদের সমস্ত সংস্কৃত সূত্র, সূত্রগত শব্দার্থের বাংলা অর্থ, সূত্রের বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। সর্বজনবোধ্য ব্যাখ্যাটি যোগসম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা-দূরীকরণে সমর্থ হইবে। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন।

আগমনী—প্রকাশক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৩২ ; মূল্য ১৲।

'আগমনী' পুস্তিকাটিকে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর দিব্য জীবনকাহিনী অবলম্বনে একটি গীতি-কথিকা বলা চলে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী 'কন্যা উমা'-রূপে এবং শ্রীসারদাদেবীর জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী 'মা-মেনকা'-রূপে চিত্রিত হইয়াছেন এই গ্রন্থে। জননীর নিকট কন্যার দৈব স্বরূপ অনবদ্য ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগমনী-বিষয়ক ও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ব্যতীত অনেকগুলি নূতন গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুর-তাল লয়ে সঙ্গীতগুলি গীত হইলে গীতি-কথিকাটি ভক্তচিত্তে অনাবিল আনন্দ সঞ্চার করিতে পারিবে। শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের যুগলীলার নবনৈবেদ্য 'আগমনী' নূতন চিন্তাধারা রূপায়ণের একটি সার্থক প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই।

লীলাকথা—শ্রীব্রজভূষণ চক্রবর্তী। ৩৪ কিউ, সুরেন সরকার রোড, কলিকাতা ১০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৩৬, মূল্য ৩৲।

শ্রীভগবানের লীলাকথা ত্রিতাপদগ্ধ জীবের নিকট শান্তিবারিস্বরূপ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলা সরল ভাষায় বর্ণিত। 'দধিমন্থন', 'মৃদ্ভক্ষণ', 'দাম-বন্ধন', 'বকাসুর বধ', 'কালিয়দমন', 'গোষ্ঠবিহার' 'গোবর্ধনধারণ', 'রাসতত্ত্ব' প্রভৃতি বর্ণনায় লেখকের ভক্তিভাব পরিস্ফুট। শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি সুন্দর ছবি পুস্তকটিকে অলংকৃত করিয়াছে। ছোট বড় সকলের নিকটই পুস্তকখানি আদরণীয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—গ্রন্থকার ও প্রকাশক—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৭ প্রতাপাদিত্য প্লেস, কলিকাতা ২৬। পৃষ্ঠা ৬৮+১৭ ; মূল্য ২৲।

ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ যাহাতে হিন্দু ধর্মের তত্ত্বগত তাৎপর্য ধারণা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূততত্ত্ব কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি আলোচনা করা হইয়াছে। দুরধিগম্য বিষয়-বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। গ্রন্থখানির 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান' নামকরণও তাৎপর্যবোধক।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৭২): প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, ৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া ৪। পৃষ্ঠা ৫৪।

পত্রিকাটিতে প্রকাশিত পঞ্চম হইতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণের পদ্য ও গদ্য রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইয়া পাঠকের মনে বিদ্যালয়ের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ধারণা হইবে। কয়েকটি লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে: মহামানব বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-নাথ ও বিজ্ঞান, কবি রজনীকান্ত, মোহন-বাগান, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক। 'আমাদের কথা'য় বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কর্মপরিচিতি বিবৃত।

Vivekananda—Bhupendranath Roy. Published by Sraban Mahato, Golamara High School, P.O. Golamara, Dist. Purulia. Pp 28 ; price 37 p.

পুস্তিকাটি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনানুধ্যানের তৃতীয় পর্যায়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজীর বলিষ্ঠ ভাবধারা ও জীবনদর্শনের সার্থক আলোচনা ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য

আসামে সম্প্রতি প্রলয়ঙ্কর বন্যায় অগণিত নরনারী দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় করিমগঞ্জ মহকুমার বন্যা-পীড়িতদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। মিশন কর্তৃক করিমগঞ্জ শহরে বন্যার্তদের একটি ক্যাম্প পরিচালন-ব্যবস্থার ভার লওয়া হইয়াছে। এই ক্যাম্পে প্রতিদিন ১,২০০ লোককে রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শিশুদিগকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ এবং বার্লি দেওয়া হইতেছে। মিশনের শিলচর কেন্দ্র হইতেও সেবাকার্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র—অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল :

জানুআরি, ১৯৬৬ : মৌনাভ্যাসের সৃজনক্ষম শক্তি; পুনর্জন্ম ও মুক্তি, স্বামী বিবেকানন্দ : ভারত ও আমেরিকা, পঞ্চ জ্ঞানভূমি; অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের পথ।

ফেব্রুআরি, '৬৬ : প্রার্থনার শক্তি; ধ্যানপরায়ণ জীবনের সোপান, ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিও না, তাঁহাকে দর্শন কর; শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধ (শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে)।

মার্চ, '৬৬ : অবতার-রহস্য; পবিত্র শব্দ ওঁ; অহংকার জয় করিবার উপায়; সহজাত বৃত্তি, যুক্তি ও অনুভূতি।

এপ্রিল, '৬৬ : পবিত্রতার শক্তি; মৃত্যুই কি শেষ পরিণতি? (গুড্ ফ্রাইডে উপলক্ষে); অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ (খৃষ্টজন্মদিন উপলক্ষে); 'অহং'কে কিভাবে জয় করা যায়? অভ্যুদয় কি মায়িক, না বাস্তবিক?

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও কঠোপনিষৎ অবলম্বনে ক্লাস করা হইয়াছিল।

উৎসব সংবাদ

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাঙ্গণে গত ২০শে মে হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত স্বামীজীর জন্মবার্ষিকী এবং আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসিগণের বৈদিকমন্ত্রে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যুগাচার্য স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর আদর্শ এবং ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। তাঁহার ভাষণের পর অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমহাদেব পাল ও তাহার সম্প্রদায়ের গীটার-বাদনের পর এইদিন-কার সভা সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আশ্রমস্থ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী সভার আয়োজন করা

হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে শ্রীমতী রায় এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

তৃতীয় দিন স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ ধর্মসভার উদ্বোধন করেন। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী মহারাজ ও স্বামী জীবানন্দ মহারাজ যুগাচার্য স্বামীজীর আদর্শ ও জীবনী বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা দেন। সভার শেষে হাওড়া কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দির কর্তৃক 'বিবেকানন্দ লীলাকীর্তন' দর্শকগণকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

চতুর্থ দিন 'ছাত্রদিবস'। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান নিখিলেশ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবন লইয়া আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়। যুগান্তরের সহ-বার্তা-সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সময়োপযোগী ভাষণ দেন। তাঁহার ভাষণ সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নাটিকা আশ্রমিকগণ সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করে।

পঞ্চম দিনে রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার ভাষণটি খুবই মনোজ্ঞ হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নাটিকা অভিনীত হয়।

শেষ দিনে আশ্রমস্থ ছাত্রগণ কর্তৃক 'মহারাষ্ট্র-গৌরব' নাটকের সফল অভিনয়ের সঙ্গে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব গত ৯ই জুন হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত চারিদিন ধরিয়া সুচারুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে চারিদিনই সন্ধ্যার পর সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিবস স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহযোগে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। ইহার পর তিন দিন বেলুড়মঠাগত স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাবির্ভাবের প্রয়োজন ও তাঁহাদের পবিত্র জীবনে মানবকল্যাণোপযোগী আদর্শের বিকাশ ও অমৃতোপম বাণী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ইঁহাদের আদর্শ অবলম্বনে জীবনগঠন করা বর্তমান ভারতে বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যেন আমাদের জীবন প্রেম, মৈত্রী, ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিজে ধন্য হইতে ও অপরকেও ঐ পবিত্র ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারি।

১০ই ও ১২ই জুন বক্তৃতার পর মালদহের প্রেমানন্দ সম্প্রদায় রামায়ণ কীর্তন করেন। ১১ই জুন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ও স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ ভক্তিমূলক ভজনাদির দ্বারা বহু নরনারীকে আনন্দদান করেন। সমাপ্তি-দিবসে (রবিবার) বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। অপরাহ্ণে প্রায় দুই সহস্র নরনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উৎসবে মালদহ ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের শহর ও গ্রাম হইতে বহু নরনারী যোগদান করিয়া উৎসবের কয়দিন আশ্রমকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া রাখেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্বামী চিদাত্মানন্দজীর বক্তৃতা-সফর

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক আহূত হইয়া অদ্বৈত আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট স্বামী চিদাত্মানন্দ গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ৩রা জুন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, ম্যালেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, হংকং, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এবং বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় মোট ৪৬টি বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছেন। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দজীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন; তিনিও কয়েকটি স্থানে ভাষণ দিয়াছেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর আলোকচিত্রযোগে প্রচার

গত ফেব্রুআরি, এপ্রিল ও মে এই তিন মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ইউনিয়ান হাই স্কুল—কোলাঘাট, বাঘাস্থি, আদিবাসী জুনিয়ার হাইস্কুল—লছিপুর, ভদ্রকালী, হাইস্কুল—শ্যামসুন্দরপুর পাটনা, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়—তেঘরি, রামকৃষ্ণ মঠ—কামারপুকুর, রামকৃষ্ণ মঠ—কোয়ালপাড়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ধুবড়ী, রামকৃষ্ণ আশ্রম—কুচবিহার, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আলিপুরদুয়ার জং, খাগরাবাড়ী, চ্যাংড়াবাঁধা, ভোটবাড়ী, রামকৃষ্ণ আশ্রম—মেখলীগঞ্জ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দোমোহনী রেলওয়ে ক্লাব, ফারাক্কা, গাজোল, মারনাই ইত্যাদি স্থানে 'সর্বধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারী ও মাতা সারদা-দেবী', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ,' 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ইত্যাদি সম্বন্ধে মোট ৪২টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩৪টি ছায়াচিত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরলোকে স্বামী যোগাত্মানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৬ই জুন, ১৯৬৬ বিকাল ৪টা ৩৭ মিনিটের সময় স্বামী যোগাত্মানন্দ (দেবেন মহারাজ) কলিকাতা রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৬৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এবারে হাসপাতালের পরীক্ষায় তাঁহার প্রস্টেট-গ্রাণ্ডে ক্যান্সার পড়ে; উহার দ্রুত সংক্রমণ নিবারণার্থে ৯ই জুন অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর উন্নতি ভালোই হইতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৬ই জুন বিকাল ৪-১৫ মিঃ সময় হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হয় এবং উহাতেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী যোগাত্মানন্দ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ঢাকা আশ্রম, অদ্বৈতআশ্রমের কলিকাতা ও মায়াবতী কেন্দ্র, কনখল ও বারাণসী সেবাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অনলস, উদ্যোগী কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁহার অমায়িক প্রকৃতি সাধু ভক্ত সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিত। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

খড়্গপুরঃ গত ১৫ই মে রবিবার স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে খড়্গপুর ইন্স্টিটিউট অব টেকনোলজীর ক্লাবগৃহে মহাসমারোহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩১তম জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐ উপলক্ষে ১৫ই প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর প্রভাতফেরী বাহির করা হয়। পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচার পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তদানীন্তন বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক দৈন্যের কথা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের সার্থকতা সম্বন্ধে বাংলায় মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিবার পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী এবং বর্তমান সময়ে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংরেজীতে সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। সভান্তে উৎসবকমিটির সভাপতি বক্তাদের ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর স্থানীয় সারদা সঙ্ঘের মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন করেন। অতঃপর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। উৎসবান্তে সমবেত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মেদিনীপুর, গড়বেতা ও তমলুক হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করেন।

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১২ই জুন, রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একত্রিংশদধিক-শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে পূজা-হোম-পাঠাদি এবং বৈকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেবাশ্রম-কর্মিবৃন্দ কর্তৃক রামনাম সংকীর্তনের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। পানুহাট আদর্শপল্লীর শ্রীহরিনারায়ণ ভাওয়াল ও শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। প্রধান বক্তা বেলুড় মঠের স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ মহারাজ তাঁহার প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। রাত্রে শ্যামাসংগীত ও কীর্তনাদির পর উৎসবের কার্য শেষ হয়।

কার্যবিবরণী

বিবেকনন্দ আশ্রম (৪নং নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া): এই আশ্রমের এপ্রিল, ১৯৫৯ হইতে মার্চ, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্পসংখ্যক পুস্তক-সম্বলিত ক্ষুদ্র একটি লাইব্রেরীর আকারে আরব্ধ হইয়া আশ্রমের কর্মধারা বর্তমানে বিভিন্নমুখে সম্প্রসারিত ও সংবর্ধিত রূপ ধারণ করিয়াছে।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার

নিয়মিতভাবে ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হয়; বিবিধ ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আকর্ষণের বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ৪,৩১৮ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক আছে। গ্রন্থাগার-সংলগ্ন পাঠকক্ষে ১০ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়, প্রতিদিন গড়ে পাঠক-সংখ্যা ৩০।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন—সর্বার্থসাধক এই বিদ্যালয়টি আশ্রম কর্তৃক সুপরিচালিত হইতেছে, প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় 'টেকনিক্যাল' বিভাগে বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র প্রথম ও আর একজন তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরীক্ষায় পাস করিবার হার গত ছয় বৎসরে গড়ে শতকরা ৯৬·৩ জন করিয়া।

এতদ্ব্যতীত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়, হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ব্যায়ামাগার প্রভৃতি পরিচালনা এবং দুঃস্থগণকে সাহায্যদান আশ্রমের উল্লেখযোগ্য কার্য।

গ্যাস হইতে খাদ্য

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা গ্যাস হইতে খাদ্য প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি জানাইয়াছেন।

কোল ইণ্টারন্যাশনাল গ্রুপ রিসার্চের ডিরেক্টর লর্ড রথচাইল্ড সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন যে, কোল রিসার্চ ল্যাবরেটরির দুইজন বৃটিশ ডাক্তার মিথেন গ্যাসকে খাঁটি প্রোটিনে পরিণত করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই বিজ্ঞানী দুইজন হইতেছেন ৩৩ বৎসর বয়স্ক ডঃ জন মরিস ও ২৯ বৎসর বয়স্ক ডঃ যোগলাস রিবনস।

৪০ কোটি বৎসর পূর্বের মাছের জীবাশ্ম

'তাস'-এর একটি সংবাদে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, উত্তর কিরঘিজিয়ার কারবালটা নদীতটে ৩৫ হইতে ৪০ কোটি বৎসর পূর্বের এক ধরনের মাছের বহু জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে।

শিক্ষা কমিশন সম্বন্ধে তথ্য

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারত সরকার শিক্ষা কমিশনের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে প্রায় ২১ মাসের মধ্যে কমিশনের কাজ নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারেই শেষ হইয়াছে। কমিশন সর্বশ্রেণীর ৯ সহস্রেরও অধিক লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন এবং মোট ১০০টি বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১২টি দল এবং ৭টি কার্যনির্বাহকমণ্ডলী গঠন করা হইয়াছিল। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রধান খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য প্রধান খণ্ডের সহিত যে-সব অতিরিক্ত খণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের পৃষ্ঠাসংখ্যা তিন সহস্রাধিক।

দিব্য বাণী

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি, নামত্বা বিজানাতি, মত্বৈব বিজানাতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১৮।১

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে।

৭।১৯।১

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি, নানিস্তিষ্ঠং শ্রদ্দধাতি, নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি।

৭।২০।১

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি, নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি, কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি।

৭।২১।১

মনন যে করে সদা, বিজ্ঞান সে জন লভে ; বিজ্ঞানী হয় না কোন জন
মনন না করি কভু ; বিজ্ঞান লাভের পথ (স্থির চিত্তে গভীর) মনন।
জ্ঞানের বিষয় 'পরে শ্রদ্ধান্বিত হলে তবে করে লোকে মনন-প্রয়াস ;
শ্রদ্ধা না জাগিলে চিতে মনন করে না কেহ ; শ্রদ্ধা আনে মননাভিলাষ।
নিষ্ঠাবান হয় যেবা, শ্রদ্ধা জাগে তারি চিতে ; নিষ্ঠা বিনা শ্রদ্ধা নাহি আসে ;
নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার হেতু। (যে বিদ্যার্থী জ্ঞান লভিবার তরে আসি গুরু পাশে)
সদাই নিরত থাকে ইন্দ্রিয়-সংযম করি একাগ্র করিতে নিজ মন
সেই হয় নিষ্ঠাবান ; সংযম ও একাগ্রতা বিনা নিষ্ঠা আসেনা কখন।
সংযম ও একাগ্রতা আনে নিষ্ঠা, (নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা খোলে মননের দ্বার,
মনন লইয়া যায় চরম সত্যের পাশে, বিজ্ঞান তখন হয় তার—
হয় পরাবিদ্যালাভ, সত্যলাভ, নিঃশেষে ঘুচিয়া যায় অজ্ঞান-আঁধার।)

কথাপ্রসঙ্গে

অমৃতধাম

জগতের সব কিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা রূঢ় বাস্তব। আমরা যা কিছু দেখি, একদিন না একদিন তাহা সবই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আমাদের দেহ বিনষ্ট হইবে, এই পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারা—ইহারাও একদিন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কবে কোন্ কালে সূর্য নিভিয়া যাইবে, তাহার কত পূর্বে পৃথিবী জীবশূন্য হইবে তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইলেও উহাতে আমাদের মাথাব্যথা নাই মোটেই। যে চিন্তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে, তাহা হইল আমাদের দেহের নাশ; বিশেষ করিয়া যখন কোন আপনজনের মৃত্যু ঘটে বা কোন কারণে নিজেকে মৃত্যুর অনতিদূরবর্তী বলিয়া মনে হয়, তখন। অন্য সময় অবশ্য আমরা সে কথা ভুলিয়াই থাকি, বা সে দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া রাখি।

আর একটি বিষয়ের চিন্তা জীবনে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্বেগ আনে, জীবনে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ঘন ঘন ওলটপালট-করা ঝড় তোলে; সেটি হইল দুঃখকষ্ট—শারীরিক ও মানসিক।

মানুষ, শুধু মানুষ কেন সমস্ত প্রাণীই আপ্রাণ চেষ্টা করে মৃত্যুকে এড়াইয়া চলিতে এবং দুঃখকষ্টকে দূরে রাখিতে। কিন্তু জগতের গঠনই এমন যে উহার সহিত নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়া নিজের মনের মত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া মৃত্যুহীন দুঃখহীন জীবন সেখানে অতিবাহিত করার চেষ্টা বৃথা। আদিম অবস্থা হইতে শুরু করিয়া বর্তমান উন্নত অবস্থা পর্যন্ত মানবজীবনের প্রগতিপথের সবটুকু জুড়িয়াই —মৃত্যুর সর্বত্রব্যাপ্ত জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, উহার সবটুকুই দুঃখের কণ্টকে আকীর্ণ।

মৃত্যু এবং দুঃখকে জয় করার প্রচেষ্টা আর এক পথে মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে করিয়া আসিতেছে এবং বহুজন উহাতে সফলকামও হইয়াছেন। একটি মৃত্যুহীন নিত্যানন্দময় ধাম তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, যেখানে পৌঁছিতে পারিলে মানুষ মৃত্যু ও দুঃখকে জয় করিতে পারে। এই আবিষ্কর্তাগণ ধর্মগুরু নামে, এবং সে ধামে পৌঁছবার পথ ধর্মপথ নামে পরিচিত।

বিনাশশীল জগতে এমন একটি বস্তুর সন্ধান এই ধর্মগুরুগণ দিয়াছেন যাহা "সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" (গীতা, ৮।২০)—জগতের সব কিছুই বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু এমন একটি বস্তু আছে, যাহা স্থূলভূত দ্বারা (বস্তুর স্থূল উপাদান) গঠিত আমাদের শরীর, পৃথিবী, সূর্য, নীহারিকা প্রভৃতি, এমন কি সূক্ষ্মভূত দ্বারা গঠিত মন বুদ্ধি প্রভৃতি এবং উহাদের উপাদান স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতগুলি পর্যন্ত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না; আর পরম আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে, সেই অবিনাশী বস্তুই আমাদের স্বরূপ, আমাদের মৃত্যু বলিয়া সত্যই কিছু নাই—"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত" (গীতা, ২।৩০)। 'আমি আছি' এ বোধ যাঁহার হইতেছে, তিনিই দেহী, দেহের বিনাশে তিনি বিনষ্ট হন না; সমগ্র বিশ্বজগৎ বিনষ্ট হইলেও আমাদের ভিতর যাহা যথার্থতঃ চেতন সত্তা, তাহা থাকিয়াই যায়।

দেহের বিনাশের সঙ্গে আমিও চিরদিনের জন্ম মুছিয়া যাইব—এই ভীতিই মানুষকে সর্বাধিক চঞ্চল করিয়া তোলে। মৃত্যুর পরে আমার সত্তা থাকে কি না, এবং থাকিলে তাহার স্বরূপ কি—এ প্রশ্ন যেদিন মানবমনে প্রথম জাগিয়াছিল, মানুষের ইতিহাসে তাহা একটি পরম শুভক্ষণ। কঠোপনিষদে আত্মতত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তররূপেই। দেহাভ্যন্তরস্থ দেহীর, আসল মানুষটির স্বরূপ সম্বন্ধে যে সত্য কঠোপনিষদে নিহিত রহিয়াছে, তাহা সবই যমরাজ বলিয়াছেন সত্যান্বেষী নচিকেতার এই প্রশ্নের উত্তরে, 'কেহ বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব কিছু শেষ হইয়া যায়; আবার কেহ বলেন, না তাহা নয়, দেহের মৃত্যুতে আসল মানুষটির কিছুই হয় না, সে থাকিয়াই যায়—এ বিষয়ে যাহা সত্য তাহাই আপনার নিকট জানিতে চাই।' ধর্মের তত্ত্ব জানিবার প্রারম্ভে এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কারণ, সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যাহা দেখি, দেহের বিনাশের সঙ্গেই মানুষটির সব কিছুই শেষ হইয়া গেল, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে জীবনে ধর্মের কোন স্থান থাকে না। এ প্রশ্ন সর্বযুগের মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণীর আসল সত্তার, 'আত্মার' অবিনাশিত্ব গীতামুখে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যুদ্ধে আত্মীয় ও গুরু বধের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, তাঁহাদের মৃত্যুকল্পনায় মোহাচ্ছন্নহৃদয় অর্জুনকে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া শুধু মৃত্যুকে নয়, সর্ববিধ দুঃখকষ্টকেও জয় করিবার, তাহার অতীত প্রদেশে যাইবার পথের নির্দেশ দিতেছেন। বলিতেছেন, আমরা আসলে দেহও নই, মন-বুদ্ধিও নই, এসব কিছুর পারে অবস্থিত সেই সত্তা—যাহা "সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি", আর আমাদের এই স্বরূপের উপলব্ধিই মৃত্যু ও দুঃখকে জয় করার একমাত্র পথ।

শুকদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা সম্বলিত ভাগবত প্রথম শুনাইলেন আসন্ন মৃত্যু-ভয়ে উদ্বিগ্ন রাজা পরীক্ষিৎকে। এই প্রসঙ্গে তিনি পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, "তুমি তো মানুষ, মৃত্যুকে তুমি একেবারে অস্বীকার কর রাজা! পশুদের জ্ঞান নাই, তাহারা দেহের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলিয়া ভাবে; কিন্তু যে 'মানুষ', সে নিজের অবিনাশী স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মৃত্যুকে ভয় করিবে কোন্ দুঃখে? পরীক্ষিৎ! 'আমার মৃত্যু হইতে পারে' এই পশুবুদ্ধির পারে যাও"—"ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।" (ভাগবত ১২।৫।২)। বলিতেছেন, মানুষের আসল সত্তা যে দেহাতীত এবং অমর—ইহা কথার কথা মাত্র নহে, ইহা বহুজনের প্রত্যক্ষ করা সত্য। দেহ থেকে আসল মানুষ আলাদা, ইহা সাক্ষাৎ দেখা যায়—"স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ং। যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ।" 'যেমন স্বপ্নাবস্থায় নিজেই নিজের শিরচ্ছেদ দেখা যায়, তেমনি জাগ্রদবস্থায় দেহের পঞ্চত্বাদি নিজেই দেখিতে পায়। মানুষের দেহাতীত সত্তা আছেই আছে—তাহা অজ ও অমর।' [শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-সহচর স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার অসুস্থ অবস্থায় প্রায় দেহত্যাগের সম্মুখীন হন, দেহত্যাগের বাহ্য পূর্বলক্ষণ সবই দেখা দেয়। পরে সহসা অবস্থার পরিবর্তন হয়। এই প্রসঙ্গে পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দেখলাম প্রাণ উৎক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে……।' তিনিই অন্য সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, 'প্রাণ দেখেছ? মন দেখেছ? প্রাণ দেখা যায়, মন দেখা যায়।']

নিজের এই স্বরূপ-উপলব্ধির পথের কথা সত্যদ্রষ্টাগণ, আচার্যগণ, অবতারগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অধিকারীভেদ ও রুচিভেদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্নভাবে উক্ত হইলেও মূলতঃ তাহা একই; যাহা "সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি"—তাহাই হইল বিশ্বজগতের চরম সত্য, তাহা একটিই, এবং আমাদের স্বরূপও তাহাই। ভগবান বলিতে যাহা বোঝায়, অবতার বলিতে যাহা বোঝায়, তাহার স্বরূপও তাহাই—"তদ্ধাম পরমং মম।" (গীতা ৮।২১) মৃত্যুর, দুঃখকষ্টের পারে যাইতে হইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর এই মহামিলনভূমিতে আমাদের পৌঁছাইতে হইবেই। আসন্ন তক্ষক-দংশনজনিত মৃত্যুকে হেলায় তুচ্ছ জ্ঞান করিবার জন্য শুকদেব পরীক্ষিৎকে সেই কথাই বলিতেছেন, "অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং। এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্ম-ন্যাধায় নিষ্কলে॥ দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মানঃ॥ (ভাগবত ১২।৫।১২-১৩)" 'যাহাকে পরমধাম পরমপদ ব্রহ্ম বলা হয়, আমি ও তাহা অভেদ—আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি—ইহা নিশ্চয় করিয়া নিরুপাধি নিষ্কল ব্রহ্ম বলিয়া নিজেকে জান; তাহা হইলে পদতলে লেলিহান দংশনকারী তক্ষককে, নিজের শরীরকে, সমগ্র বিশ্বকেই নিজেরই স্বরূপ, একই সত্তা ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে, এগুলিকে পৃথক পৃথক বস্তু বলিয়া বোধ হইবে না।' এই একত্ববোধে পৌঁছান ছাড়া মৃত্যুকে জয় করার দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই—"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি। (কঠোপনিষদ্—২।১।১১।" দৃঢ় মনন দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতেই হইবে যে বিশ্বে 'নানাবিধ বস্তু' বলিয়া যথার্থতঃ কিছুই নাই—একই সত্তা সর্বত্র ওতপ্রোত। সেই এক অদ্বয় সত্তাকে যে নানা বস্তু রূপে দেখে, সে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না, বারে বারে সে মৃত্যুর অধীন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত অর্জুনকে বলিতেছেন, "যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ-মেবং যাস্যসি পাণ্ডব। যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। (গীতা ৪।৩৫)"—হে পাণ্ডব! এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মোহ আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এই জ্ঞান সহায়ে বিশ্বের স্থূলসূক্ষ্ম সব কিছুকে তুমি তোমার নিজের মধ্যে এবং আমারও মধ্যে দেখিতে পাইবে—দেখিবে স্বরূপতঃ তুমি আমি এবং এই সমগ্র বিশ্ব এক। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বাণী, "ঈশ্বর শুদ্ধ বোধস্বরূপ এবং তিনি আমাদের সকলেরই স্বরূপ।" "তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে 'তত্ত্বমসি'। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।"

নিজের এই পরমানন্দময় অবিনাশী নিত্য সত্তার উপলব্ধির পথ প্রধানতঃ দুটি, জ্ঞান ও ভক্তি। দুটি প্রধান পথই—সব পথই—অবশেষে এই চরম একত্বে আসিয়াই শেষ হয়। সাধারণ অবস্থায় এই সত্তাকে যতই 'নানা' বলিয়া, বহুবিচিত্র বলিয়া আমাদের বোধ হউক না কেন, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথে চলিতেই আমাদের 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—এক ছাড়া দুই বলিয়া কিছুই নাই, একথা মনে দৃঢ় করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ সহজ ভাষায় বলিয়াছেন: বিশ্বজগতে একটি বই দুটি সত্তা নাই; হয় বল সবই 'আমি' (জ্ঞানপথ), আর না হয় বল সবই 'তুমি' (ভক্তিপথ)। জ্ঞানপথে প্রথম হইতেই

এই সত্যটি মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয় ইহার বিরোধী সর্ববিধ চিন্তাকে, অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া। আর ভক্তিপথে আমি তুমি ও বিশ্বজগৎ সব কিছুর অস্তিত্বের মধ্য দিয়াই যাত্রা সুরু হয় কিন্তু লক্ষ্য হইল 'সবই তুমি', জগৎও তুমি, আমি'-ও তুমি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বারে বারে বলিতেন, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'। যেভাবেই হউক, 'নানা'-বোধের পারে যাইতেই হইবে। হয় বলিতে হইবে, "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং। ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥ (কৈবল্যোপনিষদ্—১৯)" 'আমা হইতেই সব কিছুর উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়—আমিই অদ্বয় ব্রহ্ম।' অথবা বলিতে হইবে, "ত্মক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ।" 'ব্যক্ত জগৎরূপে যাহা দেখিতেছি তাহা তুমিই, যাহা অব্যক্ত জগৎকারণ তাহাও তুমি, এবং এই দুয়ের অতীত অক্ষর ব্রহ্মও তুমি।' উভয় পথই—মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর পারে, সুখ-দুঃখের অতীত প্রদেশে লইয়া যায়। ভগবানের সাকার রূপের দর্শনলাভ, আর তাঁর নিরাকার সত্তায় বিলীন হওয়ার মধ্যে যে ক্ষীণ পার্থক্য, তাহা লইয়া আমাদের মাথা না ঘামাইলেও চলিবে; দুটি অবস্থাই আমাদের দেহাত্মবুদ্ধির পারে, মৃত্যুর পারে, দুঃখের পারে পরমানন্দময় ধামে লইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, জ্ঞানপথ দিয়া ভক্তিতে পৌছান যায়, আবার ভক্তিপথ দিয়া জ্ঞানে পৌছান যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীভগবানকে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, যীশু প্রভৃতি বহুবিধ সাকাররূপে দর্শন করিয়াছিলেন এবং এই সব দর্শনের পরই দেখিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের এই সাকার রূপগুলি তাঁহার নিজের সত্তার সঙ্গে মিশিয়া সবই অদ্বয় সত্তায় লীন হইতেছে। শ্রীভগবানের বিবিধ সাকাররূপের সমন্বয় এই অদ্বয় সত্তাতেই। এই সত্তাই মা-কালী, মা-দুর্গা, শিব, নারায়ণ প্রভৃতি রূপে ভক্তের হৃদয়কমল আলো করিয়া দেখা দেন, এই অদ্বয় সত্তাই যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি নররূপ পরিগ্রহ করেন মানুষকে সেই অমৃতলোকের পথ দেখাইতে, মানবমনের সংশয় কাটাইবার জন্য অতি সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষানুভূতির অমোঘ শক্তি নিজ বাণীর মধ্যে নিহিত করিয়া যাইতে, এবং ভীত অসহায় মানুষকে অভয়বাণী শুনাইয়া আশ্বস্ত করিতে, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মো ক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" "হে জীব, শরণাগত হও।" অতিঘৃণ্য, পতিত, অস্পৃশ্য ভাবিয়া যাহাদের সঙ্গ আমরা সর্বথা পরিহার করিতে চাই, অসীম স্নেহভরে ইহারা তাহাদের বুকে টানিয়া লইয়াছেন, অভয়পদে আশ্রয় দিয়া মৃত্যুহীন পরমধামে লইয়া গিয়াছেন।

ইঁহাদের অহেতুককরুণাঘন প্রাণারাম সাকার রূপ সূক্ষ্মজগতে চির বিদ্যমান, ইঁহাদের সেই করুণাধারা চিরনিস্যন্দী।

নরনারায়ণস্তোত্রম্

শ্রীওট্টূর্ উন্নি নম্পূতিরিপ্পাদ্-বিরচিতম্

কোঽয়ং পুমান্ সঞ্চিতপূর্বপুণ্যো
যো জৃম্ভমাণে নবযৌবনেঽপি।
নির্বিদ্য ভোগেষ্বখিলেষু সদ্য-
স্তুৎকণ্ঠতে দ্রষ্টুমুমাপদাব্জম্ ॥১॥

কাত্যায়ন্যাশ্চরণযুগলং মানসে স্থাপয়িত্বা
বাষ্পাসারৈঃ প্রণয়মসৃণৈস্তৎ সদা ক্ষালয়িত্বা।
অম্বাম্বেতি স্তবনকুসুমৈস্তন্মুহুঃ পূজয়িত্বা
কোঽয়ং ধন্যো লুঠতি তরুণঃ
পুণ্যহুগলীপ্রতীরে ॥২॥

কারুণ্যসিন্ধুর্জগদুজ্জিহীর্ষু-
রাশ্চর্যকেলীনিকরাংশ্চিকীর্ষুঃ।
স্বৈরং ভুবি ব্রাহ্মণবালরূপে-
ণাত্মাবতীর্ণঃ পরমেশ্বরোঽয়ম্ ॥৩॥

গদাধরাকারমুপাদদানো
নরেন্দ্ররূপেণ নরেণ সার্ধম্।
ইহাত্তনারায়ণ আদিদেবো
বসুন্ধরায়াং কৃপয়াবতীর্ণঃ ॥৪॥

শ্রীমদ্গদাধরনরেন্দ্রবপুর্ধরঃ সন্
নারায়ণো নরসখো দয়য়া যুগেঽস্মিন্।
বঙ্গেষু সর্বজগতাং সুকৃতাতিরেকা-
দ্ধর্মাবনার্থমবতীর্য তনোতি লীলাম্ ॥৫॥

নিত্যং প্রবুদ্ধোঽপি সদাবিমুক্তোঽ-
প্যেকান্তশুদ্ধোঽপ্যখিলস্য নাথঃ।
লোকস্য শান্ত্যৈ কুরুতে সলীলং
নানাবিধা দুষ্করযোগচর্যাঃ ॥৬॥

অধ্যাত্মবিদ্যাময়জীবনাড়ী
　　যদা যদা গ্লায়তি ভারতোর্ব্যাঃ।
তদা তদা কোঽপি সুধাভিবর্ষ-
　　স্তাং জীবয়ন্নারভতেঽত্র সত্ত্বঃ ॥৭॥

পূর্বাবতারানখিলান্ স্বমূর্তৌ
　　সংগৃহ্য জাতঃ ক্ষুদিরামসূনুঃ।
তস্মিন্ যতঃ স্বং স্বমুপাস্যদেবং
　　পশ্যত্যশেষোঽপি মতাবলম্বী ॥৮॥

ঈদৃগ্ বিধস্সর্বতমো গ্রহীষ্ণু-
　　র্নিশ্শেষকল্যাণগুণোর্মিঘূর্ণঃ।
পূর্ণপ্রকাশার্ণব ঐশ্বরঃ কোঽ-
　　প্যাবীতলেঽদ্যাবধি নাবিরাসীৎ ॥৯॥

আভাত্যয়ং সাধকসার্বভৌম-
　　সিদ্ধাগ্রণীস্সাধ্যতমশ্চ নূনম্।
এতাদৃশঃ পূর্ণতমাবতারো
　　ন শ্রূয়তে ন প্রসমীক্ষ্যতে চ ॥১০॥

শ্রীশঙ্করাচার্যসমন্তভদ্র-
　　গৌরাঙ্গদেবেষু বিরাজিতানাম্।
সংবিৎকৃপাভক্তিতরঙ্গিণীনাং
　　ভাতি ত্রিবেণীব নবাবতারঃ ॥১১॥

ন কেবলং ভারতভূতলস্য
　　পরন্তু সর্বস্য চ বিষ্টপস্য।
গুরুত্বমাপন্ন বিদেদ্যুতীতি
　　নবাবতারোঽয়মমেয়তেজাঃ ॥১২॥

(ক্রমশঃ)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

Darjeeling
20th March, 1897

ভাই শশী,

তুমি আমার ভালবাসা জানিবে এবং গুপ্তকে জানাইবে। তুমি সেখানে কেমন থাক সর্বদা লিখিবে। স্বামীজী এখানে অনেক ভাল আছেন। প্রস্রাবের দোষ অনেক কমিয়াছে। এই উপকার স্থায়ী হইলে আরোগ্য হইয়া যাইবেন। গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ভাবিত আছি। সে কেমন আছে লিখিবে। তাহাকে সর্বদা আমোদে রাখিবে এবং সকল আবদার সহ্য করিবে। যেমত আমাদের উপর তোমার ভালবাসা সেইরূপ তাহাকে বাসিবে। ইতি—

দাস
Rakhal

[স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত]

(১)

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

Darjeeling
26.4.97

My Dear Gangadhar,

আমরা বাবুরামের পত্রে জানিতে পারিলাম যে, তুমি এখনও বাইরে আছ। নরেন তোমাকে সত্বর মঠে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে, কারণ সে কি যেন একটা বিষয় তোমাকে বলিতে চায়। সে বর্তমানে অনেকটা সুস্থ। আমরা আগামী পরশু এখান হইতে কলিকাতায় রওনা হইব, কলিকাতায় অল্পকিছুদিন থাকিয়া নরেন মাসখানেকের জন্য আলমোড়া রওনা হইবে। বর্তমানে সে ইংলণ্ডে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছে। মঠ হইতে সত্বরই সে একখানি বাংলা খবরের কাগজ বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আশা করি, তুমি অবশ্য তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবে। কলিকাতায় ফিরিবার পর তোমাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলে আমি খুবই আনন্দিত হইব, আশা করি তুমি কুশলে আছ।

Yours afftly.
Brahmananda.

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

আলমবাজার মঠ
১২ই জুন, ১৮৯৭

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার ৮ই তারিখের পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। আমার প্রেরিত ১০৲ টাকা পাইয়াছ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী পৌঁছিয়াছে। যিনি যিনি তোমাদের ফণ্ডে টাকা দিবেন, এইবার হইতে তাঁহাদিগের নাম ও কত টাকা দিলেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইবে। তোমার অসুস্থতা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের সকলে একরকম ভাল আছে। আমার প্রণাম ও ভালবাসাদি জানিবে ও সকলকে দিবে। ইতি—

দাস ব্রহ্মানন্দ

ভগবৎ প্রসঙ্গ

স্বামী মাধবানন্দ

(বেলুড় মঠ, বুধবার, ১৬ই জানুআরি, ১৯৬৩)

শ্রীভগবানের কৃপাতেই সদ্‌গুরু লাভ হয়। তাঁর কাছে ভগবানের প্রিয় নামরূপ মহামন্ত্র লাভ করে সাধন করতে হয়। তাঁর দর্শনের জন্য চেষ্টা করতে হয়। Purity, Patience and Perseverance (পবিত্রতা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়)—আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে হলে এই তিনটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, মনে রেখ।

একটু চেষ্টা করে কিছু হল না বলে ছেড়ে দিওনা। সাধন করে যাও। ধৈর্য হারিও না। উপযুক্ত হলে এক মিনিটও দেরী হবে না। সব মনটি দিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। নামের মধ্যে সব শক্তি রয়েছে। চলতে ফিরতে তাঁর নাম করবে। জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন প্রাণ আটুবাটু করে একটু বাতাসের জন্য, তেমনি ব্যাকুলতা ঈশ্বরদর্শনের জন্য প্রয়োজন।

ভগবান একজনই। বহু তাঁর নাম। যে নামেই ডাক—তাঁকে পাওয়া যাবে। ঠাকুর সকল মতে সাধনা করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলে গেলেন, যে পথেই যাও, তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়! তিনি প্রত্যক্ষ অনুভবের ফলে কোন্‌টি সত্যবস্তু, কোন্‌টি অসত্য—তা বলেছেন। কিভাবে সাধনা করলে শীঘ্র ফললাভ হয়—আবার কেনই বা দেরী হয়—সব যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

মানুষ তো একেবারে পরমহংস হয়ে আসেনি। ভুল দোষ ত্রুটি অল্পবিস্তর হবেই। কিন্তু মানুষ তাতে হীন হয়ে যায় না! স্বামীজী বলেছেন, নিজেকে কখনও ছোট মনে করতে নাই। ভাবতে হয়, আমার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নাই—আমি তাঁর কৃপায় সব করতে পারি। আবার তিনি বলেছেন, জগতে ভগবান ছাড়া আর কিছুই নাই। যোগী সর্বত্র ভগবানকেই দেখে। সাধারণ মানুষ সংসার দেখে। যার যেমন সংস্কার, যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী। পূর্ব পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী আমাদের বর্তমান সংস্কার। আবার বর্তমানের কর্মের ফলে ভবিষ্যৎ সংস্কার তৈরী হবে। কাজেই হতাশ হবার কিছু নাই। তিনি ভেতরে বাইরে সর্বত্র রয়েছেন। যেন লুকিয়ে খেলা দেখছেন, ম্যাজিক করছেন।

তাই ছোট শিশুর মত পরিষ্কার বলবে, তুমি আমার হাত ধরে টেনে তোল। আমি কিছুই জানি না।

(বেলুড় মঠ, সোমবার, ২১শে জানুআরি, ১৯৬৩)

ভক্তির পথই সহজ, যুগের উপযোগী। তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর উপর কোনরকমে ভালবাসা হলে—সব সহজ হয়ে যায়।

বিভিন্ন নাম হলেও ভগবান একজনই, দশজন নয়। কেউ তাঁকে বাবা বলে, কেউ বলে মা। ঠাকুর বলতেন—একই পুকুর, অনেক তার ঘাট। বিভিন্ন ঘাট থেকে সকলে জল নিচ্ছে। আবার নিজের ভাষা অনুযায়ী জলের বিভিন্ন নাম বলছে। মা জানেন, কার পেটে কি সয়—তাই মাছের সেই রকম রান্নার ব্যবস্থা করেন।

'ইষ্ট' কথার মানেই হচ্ছে 'প্রিয়'। তিনি সকলের চেয়ে প্রিয়তম। তাই অনুরাগের সঙ্গে ডাকতে হয়। মন্ত্রে খুব বিশ্বাস রাখবে। নাম ও নামী অভেদ। ভগবান কৃপা করে তাঁর প্রিয় নামের মধ্যে সব শক্তি দিয়েছেন। বটগাছের বীজ দেখতে কত ছোট। কিন্তু ঐটুকু বীজ থেকে কত বড় গাছ হয়। তবে বীজ পুঁতলেই তো গাছ হয় না। রোজ রোজ খুঁড়ে কেউ দেখে না, গাছ হচ্ছে কিনা। যত্ন করতে হয়, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়। তেমনি মন্ত্রে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আনবে না। বীজমন্ত্র সত্য, পরীক্ষিত সত্য।

আর চাই আত্মবিশ্বাস। নিজের ওপরে খুব বিশ্বাস চাই, নিজেকে কখনও হীন ভাবতে নাই। মনে কোন রকম হতাশার ভাব আসতে দিও না। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে খুব বিশ্বাস রাখবে। পরে পরে তাঁর দয়ায় কত অনুভূতি হবে। দেরী হতে পারে তাতে ভাববে না।

(বেলুড় মঠ, শুক্রবার, ২৫শে জানুআরি, ১৯৬৩)

ঠাকুর এবার জগদ্গুরু হয়ে এসেছিলেন। মা তাঁর দ্বিতীয় মূর্তি। দেখনা, আমাদের জন্য কত খেটেই না গেলেন। তাঁদের স্থূল-শরীর চলে গেলেও সূক্ষ্ম-শরীরে এখনও রয়েছেন—স্বামীজী স্বয়ং বলেছেন। এখনও তিনি দর্শন দেন।

তাহলে আমরা তাঁর দর্শন পাচ্ছি না কেন? পাচ্ছি না আমরা তৈরী নই বলে। তিনি তো সব সময়ে প্রস্তুত কৃপা করার জন্য। কিন্তু ছুঁচে ময়লা থাকলে তো চুম্বক টানে না। তেমনি আর কি।

তিনি আমাদের তিন টানের কথা বলেছেন, সতীর পতির ওপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের ওপর আর মায়ের সন্তানের ওপর। এই তিন টান এক হলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়।

সমুদ্রে স্নান করা শক্ত। অনেকে ঢেউ কাটিয়ে দিব্যি স্নান করতে পারে। তেমনি এই সংসারে শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁকে দর্শন করতে পারা যায়। অন্নপূর্ণার মন্দিরে কেউ অভুক্ত থাকে না। তবে বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দ্বারা আগেই তাঁকে পেতে হবে।

(বেলুড় মঠ, বৃহস্পতিবার, ৩১শে জানুআরি, ১৯৬৩)

সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে। তাই দেখে ছোট ছেলে বলে, মা আজ সূর্য ওঠেনি। তেমনি মন আমাদের পাঁচটা বাজে জিনিস নিয়ে থাকায় অজ্ঞানে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না। তাই বলে ভগবান নাই বলতে পারি না।

সংসারের খেলা যাতে চলে তাই তিনি সকলকে একেবারে বুঝিয়ে দেন না। এ তাঁর খেলা—লীলা। বড় খেলা হল অবতার হয়ে মানুষের রূপ ধরে আসা। ঠাকুর হলেন এ যুগের যুগদেবতা। তাঁর ইচ্ছামাত্রে মহাপুরুষ তৈরী হয়ে যায়। 'কথামৃত'তে তিনি ভক্তির কথাই বেশী বলেছেন। স্বামীজী বা অন্যান্য ত্যাগী সন্তানেরা এসেছেন, তাঁদের কাছে ঠাকুর জ্ঞানের কথা বলছেন; এমন সময় হয়ত মাষ্টারমশাই এলেন, অমনি কথার মোড় বদলে দিয়ে নারদীয় ভক্তির কথা আরম্ভ করলেন। এইজন্য ত্যাগী সন্তানদের কাছে ভক্তি ছাড়াও অন্য যে-সব কথা তিনি বলেছেন তা আমরা কথামৃততে পাই না।

তাঁর কথার মধ্যে শক্তি রয়েছে, পড়লে উদ্দীপন হয়, ভেতরে শক্তি পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, তীর্থ-দর্শন, ব্রত পালপার্বণ ইত্যাদির চেয়ে আসল জিনিস হল তাঁকে ভালবাসা! এই ভালবাসা, যা আমরা সংসারে ছড়িয়ে রেখেছি তা ভগবানের উপরে আনতে হবে। ছোট শিশুর মত তাঁকে ভালবাসতে হবে, তাঁর কাছে আবদার করতে হবে।

আর বলেছেন, আন্তরিকতার কথা। আন্তরিক না হলে কিছুই হবে না। আর একটি কথার উপরে জোর দিয়ে বলেছেন, সেটি হল ভগবানের কাছে সবাই সমান। বললেন, চাঁদা মামা সকলেরই মামা। তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়। কত বড় আশার কথা!

(বেলুড় মঠ, রবিবার, ৩রা ফেব্রুআরি, ১৯৬৩)

দাঁড় টেনে যেতে হয় কষ্ট করে যতক্ষণ না পালে হাওয়া লাগে। কৃপা-বাতাস উঠলে পাল তুললেই হল, আর দাঁড় টানতে হয় না। খানদানী ভক্ত, সে কিছুতেই ছাড়ে না। বৃষ্টি বাদলা হোক বা না হোক, যে খানদানী চাষা সে নিত্য হাল নিয়ে মাঠে যাবেই। আমাদেরও তেমনি তাঁর দয়া কিছু বুঝতে পারি বা না পারি নিত্য ডেকে যেতে হবে।

জপ করলেই তাঁকে টেনে আনা যায় না, মন্ত্রবশীভূত সাপের মত। তাঁর প্রতি ভালবাসাই আসল। ভালবাসা না এলে তাঁর কাছেই বলতে হবে—তুমি আমাদের মধ্যে একটু ভালবাসা দাও।

মা কাউকে কাউকে বলতেন, তোমাদের বয়সে আমি কত জপ করেছি। আবার কাউকে বলেছেন, তোমাকে বেশী করতে হবে না। কিছু না করলে কি কিছু পাওয়া যায়? তবে মনে রাখতে হবে, ভগবানের শক্তিতেই আমরা যা-কিছু করতে পারি। রান্নার সময় দেখেছ না, নিচে আগুন আছে বলেই ওপরে আলু-পটল লাফায়!

তাঁর ভালবাসার কি তুলনা হয়? সংসারের কোন কিছুর সঙ্গে মেলে না। অন্য কিছু মাপ-কাঠি নাই বলেই একটা কিছু তুলনা দিয়ে বলতে হয়।

বিশ্বাস ও আন্তরিকতা থাকলে ভগবানের আসন টলে উঠবে।

ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরচিন্তা

অধ্যাপক শ্রীমৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় দার্শনিকগণ ঈশ্বরস্বীকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু জটিল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তবে ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই যে একবাক্যে ঈশ্বরকে মানিয়া লইয়াছেন এমন নহে। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ মনে করিলেও জৈন সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনে কাহারা ঈশ্বরবাদী এবং কাহারা নিরীশ্বরবাদী তাহাই চিহ্নিত করিয়া লইতে প্রয়াসী হইব।

প্রখ্যাত দার্শনিক মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' মোট ষোলটি বিভিন্ন দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের প্রত্যেকটি দর্শনই ভারতীয় হইলেও বর্তমান আলোচনায় আমরা 'ভারতীয় দর্শন' কথাটির অত ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিব না এবং সেরূপ প্রয়োজনও নাই। কারণ উক্ত গ্রন্থে আলোচিত দর্শনগুলির মধ্যে অধিকাংশগুলিকেই পূর্ণাঙ্গ দর্শন বলিয়া গণ্য করা যায় না। উক্ত সংজ্ঞাটির সাধারণ ও প্রসিদ্ধ অর্থই আমরা গ্রহণ করিব এবং ভারতীয় দর্শন বলিতে তিনটি অবৈদিক (অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্যে আস্থাহীন) ও ছয়টি বৈদিক[১] (অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী) দর্শন-সম্প্রদায়কে বুঝিব।

চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন—এই তিনটি দর্শন প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। চার্বাক সম্প্রদায় নাস্তিকগণের শিরোমণি। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন প্রকার প্রমাণ তাঁহারা মানেন না। একমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর কখনো কাহারো লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য বহু অনুমানগম্য পদার্থের ন্যায় নিত্য সর্বজ্ঞ জগৎকর্তা ঈশ্বরও সম্পূর্ণ অলীক। বরং তাঁহারা বলেন—লোকসিদ্ধো ভবেদ্ রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ।[২] প্রজাদের সর্বময় প্রভু লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর, তদতিরিক্ত পরমেশ্বর আবার কে?

বৌদ্ধগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী। তাঁহাদের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। কোন বস্তুই কেবল সৎ বা কেবল অসৎ হইতে পারে না এবং সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়াত্মকও হইতে পারে না। সুতরাং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত শূন্যই হইতেছে তত্ত্ব। যোগাচারগণ অতখানি উগ্র নন। তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী। আন্তর ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহই একমাত্র সত্য। বাহ্য ঘটপটাদি বস্তুসমূহ ঐ আন্তর চেতনারই আকারবিশেষ। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাদী। তাঁহারা জ্ঞান ও বাহ্য বস্তু উভয়েরই বাস্তব সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু বলেন, বাহ্য বস্তুগুলি কেবলমাত্র অনুমান প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়, উহাদের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ

---

১ অবৈদিক ও বৈদিক শব্দ দুইটির স্থলে নাস্তিক ও আস্তিক শব্দ দুইটি ব্যবহার অধিকতর প্রচলিত হইলেও এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ আস্তিক শব্দের অর্থ পরলোকে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক শব্দের অর্থ তাহার বিপরীত (পাণিনিসূত্র ৪।৪।৬০ দ্রষ্টব্য)। ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আস্তিক হইয়া পড়ে। বৈদিক অর্থ বেদমূলক, বেদাশ্রিত অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্যে আস্থাশীল।

২ 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'। চার্বাকদর্শন দ্রষ্টব্য।

হয় না। বৈভাষিকগণ বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদী। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বাহ্য বস্তু তো আছেই, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের যথার্থ প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে এইরূপ নানা মুনির নানা মত থাকিলেও ঈশ্বরপ্রত্যাখ্যান-বিষয়ে কিন্তু সকলেই একমত। নিত্য জগৎকর্তা ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন তাঁহারা কেহই অনুভব করেন নাই।[৩]

জৈন দার্শনিকগণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সর্বজ্ঞ জিতরাগ ত্রৈলোক্যপূজিত অর্হদ্‌গণই একমাত্র অর্হণীয়। অর্হংই পরমেশ্বর। তাই তাঁহারা নৈয়ায়িকের অতিপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরানুমানটিকে তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে ছিন্নভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন—

কর্তাস্তি কশ্চিজ্জগতঃ স চৈকঃ
স সর্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাঃ কুহেয়াঃ কুবিড়ম্বনাঃ স্যু-
স্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্‌॥[৪]

এই বিশ্বের একজন কর্তা আছেন, তিনি অদ্বিতীয়, সর্বগ, স্বতন্ত্র ও নিত্য—এইরূপ কুৎসিত আগ্রহের দ্বারা তাহারাই (অর্থাৎ নৈয়ায়িক প্রভৃতি) বিড়ম্বিত হয়, হে জিন, তুমি যাহাদের অনুশাসক হও নাই। যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ঈশ্বরকে নাকচ করিবেন, ইহাই হয়ত স্বাভাবিক। তবে বৈদিক দর্শনগুলির মধ্যেও সকলেই ঈশ্বরাস্তিক নহেন। বৈদিক দর্শনগুলি সংখ্যায় ছয়টি—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসাদর্শনের আস্থা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতিই সমধিক। কর্ম করিলে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং অদৃষ্টরূপ ব্যাপারের দ্বারা শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। সর্বসুখমণ্ডিত স্বর্গই মানুষের চরম কাম্য এবং যাগযজ্ঞাদির দ্বারাই উহা লাভ করা যায়। কর্ম ও কর্মফলের দ্বারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং ঈশ্বর নামে অতিরিক্ত কোন কর্তা স্বীকারের প্রয়োজন না থাকায় ইহা লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান নাই।

বেদান্তদর্শনে মূলতঃ দুইটি সম্প্রদায়—অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের প্রবক্তা যথাক্রমে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতে নির্বিশেষ, নির্লেপ, নির্গুণ, এক পরমাত্মারই কেবল পারমার্থিক সত্তা আছে। এই পরমাত্মা সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। পরমাত্মা জগতের নিমিত্ত-কারণও নহেন, উপাদানকারণও নহেন। জগতের পারমার্থিক সত্তাই নাই, তাহার কারণ সম্পর্কে গবেষণা কাকদন্তপরীক্ষার ন্যায় নিষ্ফল। তবে কি জগতের সত্তাই নাই? জগতের সত্তা আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহারিক মাত্র। এই ব্যবহারগ্রাহ্য জগতের কর্তা মায়োপাধিক পরমাত্মা (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম)। ঐন্দ্রজালিক যেমন মন্ত্রবলে অসদ্‌ বস্তুকেও সৎ করিয়া তোলে ব্রহ্মও তেমনি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার বলে অলীক জগৎপ্রপঞ্চকে সত্যবৎ প্রতিভাত করিয়া তোলেন। এই মায়োপাধিক ব্রহ্মই লৌকিক-ভাবে ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। রামানুজের মত অন্যরূপ। ঈশ্বর জীবগণের নিয়ন্তা, জীবগণের অন্তর্যামী, কিন্তু জীব (অর্থাৎ জীবাত্মা) হইতে অতিরিক্ত। তবে ঈশ্বরের দুইটি অংশ—চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ এবং অচিৎ বা জড়স্বরূপ। জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয়ও ঈশ্বরই। তিনি একদিকে জগতের নিমিত্তকারণ এবং

---

৩ পরবর্তীকালে অবশ্য বুদ্ধকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক মত বলিয়া মানিয়া লওয়া কষ্টকর।

৪ এ বিষয়ে বিচার 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড' ও 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (জৈনদর্শন) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। শ্লোকটি 'বীতরাগস্তুতি' গ্রন্থের অন্তর্গত, সর্বদর্শনসংগ্রহে উ ।

অপরদিকে জগতের উপাদানকারণ। মাকড়সা স্বশরীর-নির্গত রসের দ্বারা তন্তুজাল রচনা করে। তাই মাকড়সা তন্তুজালের প্রতি নিমিত্তকারণও বটে, উপাদানকারণও বটে। 'বহু স্যাম্' (বহু হইব)—এই সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ। আবার স্বান্তর্গত জড় বা অচিৎ অংশের দ্বারা পদার্থপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করায় তিনি জগতের উপাদানকারণও হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, তিনি জগতের সহকারিকারণও হন।[৫] ঈশ্বরই সকল জীবের (অর্থাৎ জীবাত্মার) অন্তর্যামী। শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া অতিসূক্ষ্ম জীব যেমন শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করে, ঈশ্বরও তেমনি সেই জীবের অন্তঃস্থলে অনুস্যূত থাকিয়া জীবকে নিয়মিত করেন। যদৃচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিলেও কিন্তু ঈশ্বর জীবকে তদনুষ্ঠিত কর্মানুসারেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

বৈদিক দর্শনগুলির অন্যতম সাংখ্যদর্শনের সূত্রকার মহর্ষি কপিল অতি স্পষ্ট ভাষায় ঈশ্বর অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।[৬] তৎসিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি। পরে পঞ্চমাধ্যায়েও মহর্ষি আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নিত্য জগৎকর্তা ঈশ্বরবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। বস্তুতঃ সাংখ্যমতে জগৎসৃষ্টির কারণ হিসাবে ঈশ্বরস্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিই প্রপঞ্চাত্মক জগতের মূল কারণ, প্রকৃতির বিপরিণামের ফলেই ক্রমে ক্রমে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। নিত্য অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর জগতের কারণ হইতে পারেন না। কারণ (সাংখ্যমতে) কার্য ও কারণ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, কারণই কার্যাকারে পরিণত হয়, যেমন মৃত্তিকা ঘটে। ঈশ্বরকে কারণ বলিলে তাঁহারও পরিণাম স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পরিণামী বস্তুমাত্রই অনিত্য। সুতরাং জগতের হেতুভূত নিত্য ঈশ্বরের কল্পনা কল্পনামাত্রই।

সাংখ্যদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইলেও যোগদর্শনে কিন্তু ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। এজন্য যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামও দেওয়া হয়। তবে 'পতঞ্জলি প্রভৃতি সেশ্বর সাংখ্য ঈশ্বরের সদ্ভাবপক্ষে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন নাই এবং সদ্ভাবসমর্থনার্থে তর্কপ্রণালীও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার অস্তিত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ, তিনি যেন সকল প্রকার জ্ঞানে নিশ্চিত ও বিরাজিত আছেন, পরন্তু জীবেরা যেন তাঁহার স্বরূপ জানিয়াও জানে না, অথচ তাহা তাহাদের জানা আবশ্যক। মাত্র এইটুকু বুঝাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলি একটি সূত্রে ঈশ্বরলক্ষণ বলিয়াছেন। সূত্রটি এই —ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। সূত্রের অর্থ এই যে, ক্লেশ, কর্ম, জাতি ও আয়ুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধর্ম যাঁহাতে নাই, ঐ সকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, মানবাত্মার নেতা সেই অমানবাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক পুরুষ ঈশ্বরপদের অভিধেয়। যে সকল দোষ মানবাত্মায় আছে সে সকল যদি বর্জিত হয়, তাহা হইলে সেই মানবাত্মা ঈশ্বরাত্মা বুঝিবার দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে।'[৭]

তবে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব লইয়া সর্বাধিক আলোচনা করিয়াছেন নৈয়ায়িকগণ। যদিও গৌতমমুনির

৫ রামানুজের মতে ঈশ্বর জগতের ত্রিবিধ কারণ। লোকাচার্যকৃত 'তত্ত্বত্রয়' গ্রন্থের ভাষ্য দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১০৯)।

৬ প্রথম অধ্যায়। সূত্র ৯৩। পঞ্চম অধ্যায়। সূত্র ২-১০।

৭ কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'সাংখ্যদর্শনে'র অবতরণিকা (পৃঃ ২২৪-২২৫) দ্রষ্টব্য। কিন্তু পরে ব্যাসভাষ্য ও ভোজবৃত্তিতে ঈশ্বরবিষয়ে প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে।

সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ বিশেষ আলোচিত হয় নাই এবং যে তিনটি সূত্রে[৮] তিনি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাদের তাৎপর্য সম্পর্কে নৈয়ায়িকগণের নিজেদের মধ্যেই পরস্পরবিরুদ্ধ বিতর্কের অন্ত নাই, তথাপি পরবর্তী ন্যায়াচার্যগণ—উদ্যোতকর হইতে আরম্ভ করিয়া নব্য গঙ্গেশোপাধ্যায় পর্যন্ত—সকলেই যথাসাধ্য দীর্ঘবিস্তৃত আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল কার্যেরই একজন বুদ্ধিমান সচেতন কর্তা থাকে। এই জগতেরও একজন পরিচালক আছেন, তিনি জীবের শুভাশুভ কর্ম অনুসারে অহরহ ফল প্রদান করেন, তিনি এই জগতের নিমিত্তকারণ (কুম্ভকার যেমন ঘটের), তিনি প্রলয়ান্তে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ঘটাইয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেন—এই সকল অনুভবকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা নৈয়ায়িকেরাই করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শন ন্যায়ের সমানতন্ত্র দর্শন। কাজেই ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত বৈশেষিকগণের বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু মহর্ষি কণাদের সূত্রে দ্রব্যাদি পদার্থ ও তাহাদের সাধর্ম্যবৈধর্ম্য প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই। তবে কি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই? উত্তরে বলিতে হয়, কণাদ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ আত্মা স্বীকার করিলেও ঈশ্বর স্বীকার করিতেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ সূত্র হইতে উপস্থাপিত করা যায় না। তবে বৈশেষিক মতের পরবর্তী ব্যাখ্যাতৃগণ (যেমন শ্রীধরাচার্য, শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি) কণাদমতেও যে ঈশ্বর স্বীকৃত, এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়দর্শনের সমানতন্ত্র দর্শনহিসাবে এবং পরবর্তী টীকাকারগণের সাক্ষ্যে বৈশেষিক দর্শনকেও ঈশ্বরাস্তিক গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।[৯]

নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিতে গিয়া একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। উপসংহারে তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিতেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে কাহারো সংশয় নাই। গোত্র, প্রবর, কুলধর্ম প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অনুভবও আবহমান কাল হইতে প্রসিদ্ধ। যাঁহারাই মোক্ষাদি পুরুষার্থ লাভে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছেন। বেদান্তী বলেন, তিনি অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ। কপিল বলেন, তিনি আদিবিদ্বান্ ও যোগর্দ্ধিসম্পাদিত অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের আধার। পতঞ্জলি বলেন, তিনি অবিদ্যারাগদ্বেষাদিজীবধর্মলেশবিবর্জিত। পাশুপত সম্প্রদায়ের মতে তিনি লোকবিরুদ্ধ অগ্নিধারণাদি বা বেদবিরুদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি আচারের ফলেও দুঃখরহিত এবং জগৎকর্তা। শৈবমতে তিনি ত্রিগুণাতীত মহাদেব। পৌরাণিকগণ তাঁহাকেই জগতের পিতামহ বলেন। বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি পুরুষোত্তম, যাজ্ঞিকগণের নিকট যজ্ঞপুরুষ, বৌদ্ধগণের নিকট সর্বজ্ঞ শাক্যমুনি, দিগম্বর জৈনগণের নিকট নিরাবরণ। মীমাংসকগণ তাঁহাকেই উপাস্যরূপে প্রসিদ্ধ বলেন, চার্বাকগণ তাঁহাকেই লোকব্যবহারসিদ্ধ বলেন। নৈয়ায়িকগণের মতে তিনি নিত্যসর্বজ্ঞ ও জগতের নিমিত্ত-কারণ। অধিক কি? সাধারণ শিল্পি-

---

৮ 'ন্যায়দর্শন'। সূত্র ৪।১।১৯ হইতে ৪।১।২১।

৯ উৎসাহী পাঠক এবিষয়ে টীকাকারগণের জটিল কষ্টকল্পিত আলোচনার জন্য ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত 'ন্যায়পরিচয়' (পৃঃ ১৩৫) দেখিতে পারেন।

গণ পর্যন্ত তাঁহাকে বিশ্বকর্মারূপে উপাসনা করিয়া থাকে।[১০]

সত্যই বিচিত্ররূপে বিরাজমান বিচিত্রশক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে কে সাহসী হইবে?

১০ 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'। প্রথম স্তবকে দ্বিতীয় শ্লোকের উদয়নকৃত গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এখানে উক্ত সন্দর্ভের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

অবতার

শ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

নরদেহধারী নারায়ণ, অবতার,
তুমি না আসিলে ঘুচিবেনা কভু
বসুধার দুখভার!
ধরণীর বুকে উঠিয়াছে ঝড়
গরজে অশনি, হানে কড় কড়
প্রলয়ের শিখা ঝলিছে গগনে
চারিদিকে হাহাকার,
তুমি না আসিলে ঘুচিবেনা কভু
ধরণীর দুখভার।

যুগে যুগে তুমি মানবের দ্বারে
কত রূপ ধরে এলে বারে বারে
চূর্ণ করিতে বলীর দর্প
কংসের কারাগার,
অভয়ের বাণী শোনালে গীতায়—
সে সিংহনাদ আজো শোনা যায়,
এসো নারায়ণ, পতিতপাবন
এস হে কর্ণধার,
তুমি না আসিলে ঘুচিবেনা কভু
ধরণীর দুখভার!

রামায়ণের মহাকবি

শ্রীঅমূল্যকুমার মণ্ডল

কালের চাকা অমোঘ নিয়মে ঘুরেই চলেছে। তার বিরাম নেই, কে গেল আর কে এল তারও কোন হিসাব নেই। সে শুধুই ঘুরছে। কেউ বা বেড়ে চলেছে, কেউ বা ক্ষয় পাচ্ছে। কেউ বা জন্ম নিচ্ছে, আবার কেউ বা বিদায় নিচ্ছে। এই যাওয়া-আসা, ভাঙ্গা-গড়ার মাঝখানে কত কি ঘটে যায়—তার কতটুকুবই আমরা খোঁজ রাখি। তবে এটাও ঠিক এই আসা-যাওয়ারও একটা ছন্দ আছে, একটা সঙ্গীত আছে, হয়ত একটা প্রাণও আছে। ধ্বংস ও সৃষ্টি ক্রমাগত হয়েই চলেছে। ব্যাধ বেরিয়েছে তার বাঁচার তাগিদে—আপন খাদ্যসন্ধানে। তার শর আকাশ ভেদ করে ছুটে চললো, তীক্ষ্ণ ফলকটা বিঁধে দিল পাখীটির বুকে। পাখীটির কাছে তার এই মহাবিপদের সন্ধান আকাশে বাতাসে কোনওক্রমে এসে পৌছায় নি। তারা আপন মনে খেলা করছিল। হয়ত প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদই উপভোগ করছিল। মাটি রক্তমাখা হয়ে উঠলো। উদাসীন পৃথিবী তাকেও স্থান দিল, যেমন সে স্থান দিয়েছে সেই ব্যাধটিকেও।

একটি হৃদয়ে কিন্তু মহাপ্রলয় বয়ে গেল। এ যেন মহাদেব হঠাৎ তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে প্রলয়-নাচনে মেতে গেলেন। তাঁর হৃদয়ের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। যুগের তপস্যায় যে মন ধীর স্থির হয়েছে, সে আজ প্রলয়-নাচনে ফেটে পড়বার উপক্রম করলো। অনেক ভাঙ্গলো কিন্তু যা গড়লো তাও যে অদ্ভুত সৃষ্টি। এ যে খেলাঘরের মাটির পুতুল সব ভেঙ্গে গিয়ে স্বর্গ-মন্দিরের সৃষ্টি হল, যার চূড়ায় দ্যুতি ছড়াতে লাগলো যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মণিমুক্তা। এই দ্যুতির ছটা যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে আলো দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। মানুষকে আশা দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, উন্মাদনা দিয়েছে। জাগিয়েছে মানুষের উপর অনন্ত বিশ্বাস—আর ফুটিয়েছে শাশ্বত প্রেম। মহাকবি বাল্মীকির সারা জীবনের সাধনার ধন বরফ হয়ে জমে না গিয়ে বিগলিত করুণার মত বয়ে চলেছে। পাহাড়-পর্বত মরু-প্রান্তর দেশ-কাল কোনও কিছুই তার ধারাকে রোধ করতে পারছে না। সে যেমন সমুদ্রে মিলবার জন্য আকুল তেমনি সেখান থেকে দেশ-দেশান্তরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বার জন্যও ব্যাকুল। কি অলৌকিক আনন্দের ভারই না আজ মহা-কবির উপর - যার জন্ম হয়েছে এক নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে। কি বেদনাই আজ আনন্দঘন রূপ নিয়ে ঋষির মন প্রাণ পাগল করে তুলেছে। এই মন যে আজ নতুন সৃষ্টি করতে চায়, এই সৃষ্টিই রামায়ণ। এ শুধু ভারতের মহাকাব্য বা ইতিহাস নয়—সমস্ত মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। আকাশ বাতাস, নদী পাহাড় সমুদ্র, পশু পাখী মানুষ, অণু পরমাণু যে একই তন্ত্রীতে গাঁথা। তারা যে এক সুরে গাইছে, নাচছে, ভাঙ্গছে, গড়ছে। রামায়ণ তাই সর্ব যুগের, সর্ব দেশের, সকল মানুষের মহাকাব্য।

মহাকবি আস্বাদ পেয়েছিলেন সৃষ্টির মূল ধারার। মানুষ প্রকৃতি জীবজন্তু—ভূচর খেচর, সভ্য অসভ্য সকলেই জুটেছে।

সবাই তাদের আসন করে নিয়েছে, সবাই মিলেছে একই তীর্থে। আবার সবাই এই নাট্যশালার খেলা সাঙ্গ করে নতুন খেলার

যাত্রায় চলেছে, এইটাই রামায়ণের মূলধারা, সেখানে গতি আছে, জীবন আছে, আনন্দ আছে, সুখশান্তি দুঃখযন্ত্রণা সবই আছে। মিলন বিরহ দুই-ই তার প্রকৃষ্ট রূপ নিয়ে বিরাজ করছে। জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি সবই রয়েছে। সকলেই যেন পরম আত্মীয়ের মত পাশাপাশি তার স্বরূপ নিয়ে ফুটে রয়েছে ; কেউ কারুর বিদায় কামনা করছে না। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মেই সকলে একই ছন্দে ঘুরে চলেছে। সেখানে রয়েছে সকলের সঙ্গে বিরাট আত্মীয়তা। যা আজকের বিজ্ঞানও অস্বীকার করতে পারে নি। এই ভাঙ্গাগড়া—অণুপরমাণু সবার সঙ্গে আত্মীয়তা যা চিরন্তন সত্য, যা ঋষির দিব্য দৃষ্টির কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাই-ই রামায়ণ।

এই মূলধারা ছাড়াও রামায়ণের উপধারাগুলিও চিরন্তন সত্যের শাশ্বত বাণী বয়ে এনেছে। তার রাজনীতি, শাসনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র —সবকিছুই তার মূলধারাকে বজায় রেখেছে। সেখানে মহাকবি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আস্বাদ পেয়েছেন। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রজাকুল তথা ভ্রাতা-পুত্র সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছে। রাবণের জ্ঞানবুদ্ধি আধুনিক কালের কোনও ডিক্টেটরের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু আজকের ডিক্টেটর যেমন ক্ষমতার চরম সীমায় উঠে, ক্ষমতাগর্বেই হোক অথবা পারিপার্শ্বিক সংঘাতেই হোক মুহূর্তেই বিদায় নিচ্ছে, রাবণও তাই নিয়েছে। সেকাল আর একালে কোনও প্রভেদ নেই।

আবার অযোধ্যায় দশরথ ভরত এবং রামও রাজত্ব করেছেন। যাঁরা অমাত্য ও প্রজাদের শুধু সুবিধাই দেখেছেন, তাদের ইচ্ছাতেই চরম ব্যক্তিগত ত্যাগও করেছেন। উত্তরাধিকার-প্রথা বাদ দিলে রামরাজত্ব আজকের গণতন্ত্র থেকে বহুদূরে নয়। অযোধ্যাধিপতি আবার পররাজ্যকে গ্রাস করে বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নি। যা হয়ত ছিল তাঁর অনায়াসসাধ্য! লঙ্কার রাবণ গেল বটে, কিন্তু বিভীষণ রইলেন তাঁর সার্বভৌমত্ব নিয়ে। আর কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবও, যেমন আধুনিক কালে রয়েছে ভারতবর্ষ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ইংলণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক রূপে।

বাল্মীকির মহাকাব্যের নরনারী- মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-স্বামী-স্ত্রী-প্রভু-ভৃত্য-রাজপুরুষ-সাধারণমানুষ তাদের নিজ নিজ সুখ-দুঃখ নিয়ে আপন অধিকার অনুসারে তাদের জীবন তথা শ্যামল পৃথিবীকে সুন্দরতর করে গড়ে তুলবার প্রয়াস করছে, যেমন আজকের মানুষও করে চলেছে। সেখানে মানুষের স্বার্থপরতা দুর্বুদ্ধি হয়ত কখনো কখনো এই আদি ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আসলে এই ধারা আজও পৃথিবীর সব দেশেই অব্যাহত রয়েছে। এই ধারা বন্ধ হলে হয়ত পৃথিবী থেকে মানুষ বিদায় নেবে!

প্রকৃতি তার বিরাট রহস্যের দ্বার কখনো সম্পূর্ণ করে খুলে দেয় নি। মানুষ অদম্য প্রয়াসে কিছু কিছু জয় করলেও সম্পূর্ণ বিজয়ী হয় নি। অজানাকে জানবার অদেখাকে দেখবার অনুভূতিতে যারা ধরা দেয় না, তাদের ধরবার কামনা মানুষের চিরকালের। মহাকবির মানুষ আকাশে উড়েছে, সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, তার গলায় পাথরের মালা লাগিয়েছে ; আজও যেমন আমরা পৃথিবীর দীর্ঘ পরিধিকে ছোট করে আনছি আমাদের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে। মহাকবি যেন ভবিষ্যৎ জ্ঞানরাজ্যের আরও বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে গেছেন। তাঁর যোদ্ধাগণ চরম

আঘাত পেয়েছে। তবে তা নিবারণের রাস্তাও তাদের অজানা ছিল না। প্রতিপক্ষের বাণে আগুন জ্বললে, বারি বর্ষণ করে তারা নেভাতে পেরেছে। শুধু একমুখী ধ্বংসের লীলা-খেলায় শেষ নয়, তার প্রতিকারের সন্ধানও মিলেছে। আজকের বিজ্ঞান যার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। আধুনিক যুগে গ্রহান্তরের প্রাণী এখনও শুধু হাতছানিই দিচ্ছে। কিন্তু মহাকবির মানুষ গ্রহান্তরে বিচরণ করেছে, যেন সকলেই এক ঘরের মানুষ। মহাকবি তাঁর শাশ্বত অমর সৃষ্টি রামায়ণের মধ্য দিয়ে তাই সমাজ, ধর্ম, মৈত্রী ও সমন্বয়ের এক চরমতম বিকাশের পথ দেখিয়েছেন।

সত্য ও সুন্দরকে লাভ করতে চাই মানুষের বহু সাধনা। মাটি-পাথর, গাছপালা, আলো-হাওয়ার মত সত্যও সর্বত্র আছে। কিন্তু কয়জন, ভাগ্যবান তার সঠিক সন্ধান পেয়ে নিজের জীবন পুরোপুরি সার্থক করে তুলেছেন! প্রভাতের সূর্য থেকে সুরু করে কত কি সুন্দরের খেলাই না আমাদের সামনে চলেছে। কিন্তু কয়জন তার রূপের ছটায় আপনার মন রাঙ্গাতে পারে! যা সত্য তাই-ই সুন্দর ও মঙ্গলময়। এই সত্যসুন্দর প্রতিনিয়তই আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সকলে তাকে অনুভব করতে পারছি না। তার আঘাতে আমাদের মনের দ্বার খোলে না বলেই তো আজ সারা বিশ্বে এতো অসামঞ্জস্য—এতো সংঘর্ষ—এতো অনর্থ। যে মানব-শিশু বিশ্বে অমৃতের বাণীই নিয়ে আসে, সেও মাতার জন্য কিছু কালের জন্য আনে দুঃসহ বেদনা। এই বেদনাজাত শিশু যে মাতৃহৃদয়ে জাগায় পবিত্রতম প্রেম, নির্মলতম আনন্দ, আর জাগায় মঙ্গলের দীপশিখা! তার কলকাকলি ভুলিয়ে দেয় মানুষের যত দুঃখযন্ত্রণা। তাই বুঝি মানুষের পরম শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ এসেছে চরম বেদনার মধ্য দিয়ে, যখন তাঁরা আপনাকে কৃচ্ছ্রতার কঠোর আগুনে সঁপে দিয়েছেন। আর এ কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা চারুকলার চরম বিকাশ হয়েছে বহু মানুষের কঠোর সাধনায়। কত মানুষই হয়ত এই সাধনায় হারিয়ে গেছে।

এই জ্ঞানের পথ বড় বেদনা-মধুর। তাই মহাকবির রামায়ণ শুধু ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রন্দন নয়—সেই সুর এমন একটি হৃদয়ে আঘাত করেছিল যে বহুদিন ধরে সন্ধান করছিল সত্যের। তার বিরাম ছিল না। সে নিজের ব্যথাতে ছিল ব্যাকুল। তাঁর নিজেরই মুক্তির পথ খুঁজছিল। কিন্তু আজ ব্যাধের মাধ্যমে এসে গেল বিরাট বিশ্বের ক্রন্দন। বিশ্বের সকল মানুষের ব্যথা-বেদনা, আজ তাঁর বেদনা। এই বেদনাই দিল তাকে চিরসত্যের সন্ধান। যা চিরসত্য তাই সামান্য রূপ নেবার চেষ্টা করল মানুষের ভাষায়; তাঁর বেদনা ও আনন্দ স্বভাবতই ছিল গভীরতর। কেননা চরম বেদনা ও পরম আনন্দ শুধু অনুভূতির বিষয়। তাই রামায়ণ মহাকবির সেই অপরিসীম ও অলৌকিক আনন্দের কিছুটা আস্বাদ আমাদের কাছে বয়ে এনেছে।

যুগ যুগ ধরে রামায়ণ আমাদের অমৃতরসে মুগ্ধ করেছে, আলো দিয়েছে। তার মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই মিশে গিয়ে আমাদের দিয়েছে মানুষের প্রতি অনন্ত বিশ্বাস, বিশ্ব-চরাচরের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বৈচিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের অমৃতবাণী আর মানুষের সভ্যতার বিরাট সম্ভাব্যতা যা সে চরিত্রবলে ও অধ্যবসায়ের গুণে লাভ করতে পারে। এই সমন্বয় ও

সামঞ্জস্য এবং আশার বাণী আইনস্টাইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মাচার্যগণ মানুষকে আজও শুনিয়েছেন—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাধনার অনুভূতি দিয়ে।

তাই রামায়ণ বিশ্বের অন্যতম মহাকাব্য। তার নায়ক-নায়িকা শ্রেষ্ঠ মানব-মানবী। তার সব কিছুই সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় মঙ্গলময়। সে যেন ভগীরথের আনা গঙ্গা, যে গঙ্গা কঠিন পাথরে আঘাত খেতে খেতে জন্ম নিয়ে আপন পথ করে নানা শস্যশ্যামল প্রান্তরের সৃষ্টি করে সমুদ্রে এসে মিলে গেছে।

এ হেন পূতধারা যাঁর সৃষ্টি তাঁর বেদনা, তাঁর আনন্দের কি কোনও মাপকাঠি থাকতে পারে?

অপরূপ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

সে যে খুঁজে ফেরে শুধু মনের মানুষ—
মাঝে মাঝে চেয়ে রয়
বাতাসে কি কথা কয়
থাকে নাকো হুঁস!

পথ তার লাগে ভালো
ফেলে সে প্রাণের আলো
পথিকের মনে মুখে
চাহে সে বে-হুঁস—
আশা বুঝি—মিলে যাবে
মনের মানুষ!

দেখে সব ফাঁকা, হায়
খোঁজে যারে নাহি পায়
চন্দনে চেয়ে ফেরে
মেলে আবলুস!
এক কণা ব্রীহি চায়—
পায় বুঝি তুষ।

সহসা ভিতরে চায়
কি যেন দেখিতে পায়—
এতদিন উড়াল কি
মেঘের ফানুষ?—
হৃদয়ে যে বসে আছে
মনের মানুষ!

শক্তির বিভিন্ন রূপ

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

(৪) আলো

আলো আমাদের বিশেষ পরিচিত। কিন্তু আমরা যদি ভাবতে বসি 'আলো কি?' তাহলে কঠিন সমস্যায় পড়ে যেতে হয়। বহু বৎসর ধরে বিজ্ঞানীরা এই সহজ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন, কখনও মনে হয়েছে ঠিক উত্তরটি খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার দেখা গেছে—না, ঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। বছরের পর বছর আলোর স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে, পরীক্ষার ফলাফল বুঝবার জন্য নূতন নূতন অনুমানের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সঠিক ভাবে আলো-কে যেন আজ পর্যন্তও জানা সম্ভব হয় নি। অবশ্য কিছু কিছু অস্পষ্ট ধারণা হয়েছে, যা থেকে আলোর আজ এক ধরনের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

খুব সহজভাবে যদি 'আলো কি?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই তাহলে বলা যেতে পারে, যা আমাদের চোখে অনুভূতি আনে তাই আলো। বিশ্বে বিভিন্ন জিনিস ছড়িয়ে আছে, যেমন সূর্য, তারা, অগ্নিশিখা, গাছ-পাহাড়, জল ইত্যাদি। এদের মধ্যে কতগুলি জিনিস নিজেরাই আমাদের চোখে ধরা দেয়। অন্য কিছু না থাকলেও সূর্যকে, তারাকে বা অগ্নিশিখাকে আমরা দেখতে পাই। আবার অন্য ধরনের জিনিস আছে, যাদের এই প্রথম পর্যায়ের জিনিসগুলির অনুপস্থিতিতে দেখতে পাই না। গাছ বা পাহাড়কে সূর্য না উঠলে বা কোন অগ্নিশিখার কাছে না নিয়ে এলে আমরা দেখতে পাই না। তাই ভাবা যেতে পারে, প্রথম পর্যায়ের জিনিসগুলি থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসে, যা আমাদের চোখকে প্রভাবান্বিত করে বা যার দ্বারা আমরা এদের বা এদের উপস্থিতিতে অন্যান্য সব জিনিসকে দেখতে পাই। এই 'কিছু একটা'ই হল আলো। স্বয়ং আলো-কে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু আলোর সাহায্যেই আমরা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পাই। আলোর বিশেষ কয়েকটি গুণও আমরা সহজভাবে বুঝতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, আলো তার উৎস থেকে কোন মাধ্যমের সহায়তা না নিয়েই ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমাদের পৃথিবীতে সূর্য এবং আরো দূরবর্তী বহু গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকা থেকে আলো এসে পৌঁছায়। পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রের অন্তর্বর্তী জায়গা মহাশূন্য, কোন বস্তু এখানে নেই, কিছু থাকলেও আছে খুব সামান্য পরিমাণে, যা না থাকারই সামিল। এই বস্তুহীন রাজ্য পেরিয়ে সহজেই আলো আমাদের কাছে এসে হাজির হয়।

উৎস থেকে আলো যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন একটা বিশেষ গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আলোর যে সীমিত গতিবেগ আছে, তা অবশ্য ধরা পড়ে না। কিন্তু পরীক্ষাগারে বিশেষ ব্যবস্থা করে বা কোন কোন গ্রহের ও উপগ্রহের অবস্থান থেকে প্রমাণ করা যায় যে, উৎস থেকে কোন দূরবর্তী জায়গায় পৌঁছাতে আলো কিছু সময় নেয়। মহাশূন্যে আলোর গতিবেগ সর্বাবস্থায় সমান, প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০^৮ মিটার।

পরীক্ষা দ্বারা দেখান যায় যে, আলো এক ধরনের শক্তি। এমন যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব যার উপরে আলো পড়লে যন্ত্রের চাকা ঘুরবে। আজকাল অবশ্য আলো যে শক্তির এক রূপ, তা আরও সহজে প্রমাণ করা যায় সৌরকোষ (Solar Cell) ব্যবহার করে। সৌরকোষ জার্মানিয়াম বা সিলিকন দিয়ে তৈরী, এর উপরে আলো পড়লে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে যে কোন যন্ত্র চালানো যায় এবং এর বহুল ব্যবহার বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রপাতি চালানোয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি আসে আলো থেকে, কাজেই আলোও শক্তি। তাই বলা যেতে পারে আলো হল এক ধরনের শক্তি, যা তার উৎস থেকে নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে উৎসের চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই বলা হল আলো এক ধরনের শক্তি তখনই প্রশ্ন জাগে, কি করে এই আলোর শক্তি বস্তুহীন জায়গায় প্রকাশিত হয়? কেননা শক্তির যে রূপ আমরা সহজে বুঝি, তা হল শক্তির বস্তু-আশ্রয়ী রূপ যেমন গতিজনিত যান্ত্রিক শক্তি বা শব্দের শক্তি বা উত্তপ্ত বস্তুর শক্তি। বস্তুর গতিজনিত বা অবস্থানগত পরিবর্তিত স্বরূপই হল শক্তির সহজ অনুভব-যোগ্য রূপ। তাই প্রশ্ন জাগে, আলো প্রকৃত পক্ষে কি? বুঝলাম আলো শক্তি, কিন্তু কি এই শক্তির অন্তর্নিহিত রূপ? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আলো ও বস্তুর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখে।

আলোর কতকগুলি গুণাগুণ আমরা আমাদের রোজকার কাজকর্মে সব সময়ে দেখতে পাই। প্রথম হল আলো সরলরেখায় ছড়িয়ে পড়ে। কোন সূক্ষ্ম আলোর উৎসের সামনে যদি একটি পয়সা রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, পয়সাটির পেছনের অংশ অন্ধকার থাকে। উৎসটি থেকে পয়সার কিনারা পর্যন্ত যদি কয়েকটি সরলরেখা টেনে পেছনে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এদের মধ্যবর্তী অংশই অন্ধকার থাকে। আলোর রেখা বেঁকে এসে পয়সার পেছনে পৌছাতে পারে না। আলোর দ্বিতীয় গুণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতি-ফলনের কথা। আলো যখন কোন মসৃণ অনচ্ছ তলের উপরে পড়ে তখন আলোর রেখাগুলি ফিরে আসে; প্রতিফলনে আলোর রশ্মির গতিপথ অনেকটা কোন মসৃণ কঠিন তলের উপরে রবারের বল ছুড়ে দিলে তার যে গতিপথ হয় তার মত। বলটা যেমন সরলরেখায় ছুটে গিয়ে কঠিন তলে ধাক্কা খেয়ে নূতন সরলরেখায় ছুটে চলে, আলোর রশ্মিও ঠিক তেমনি দিক পরিবর্তন করে। আলোর সরলরেখায় ছুটে চলা ও প্রতিফলন থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে, আলো নিশ্চয়ই কতকগুলি কণার সমষ্টি—এই আলোর কণাগুলি আলোর উৎস থেকে নির্দিষ্ট গতিবেগে ঠিক বস্তুকণার মত ছুটে চলে, কিন্তু আলোর কণাগুলি হল শক্তির কণা। নিউটন তাঁর কণা-আশ্রয়ী মতবাদে আলোকে এমনি শক্তির কণারূপেই কল্পনা করেছিলেন। অনেক বিজ্ঞানীও তার মতে সায় দিয়েছেন। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী আবার তাঁর মতে সায় দিতে পারেন নি। যদিও আলোর সরলরেখায় ছুটে চলা ও প্রতিফলন আলোকে কণা ভেবে নিলে ব্যাখ্যা চলে, কিন্তু আলোর অন্য ধরনের কতগুলি গুণ আছে যা কণার মতবাদে ব্যাখ্যা করা যায় না। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বিজ্ঞানী গ্রীমাল্ডি চুলের ছায়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, সেই ছায়ার কিনারা পরিষ্কার-ভাবে নির্দিষ্ট নয়। ছায়ার কিনারায় কতগুলি অন্ধকার ও আলোকিত রেখা পরপর দেখা

যায়। আলো সরলরেখায় গেলে যে ছায়া হত, কতকগুলি আলোকিত রেখা সেই ছায়ার মধ্যেও থাকে। এ থেকে বলা যেতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আলো সরলরেখায় চলে, কিন্তু সত্যি সত্যি আলো সরলরেখায় চলে না। কোন অনচ্ছ বস্তুর কিনারায় এলে আলো সামান্য বেঁকে যায়। বড় আকারের বস্তুর ক্ষেত্রে এই বেঁকে যাওয়া ধরা পড়ে না, কিন্তু খুব ছোট আকারের বস্তু হলে বেঁকে যাওয়াটা ধরা পড়ে। আলো এই যে ছোট বস্তুর ছায়ার কিনারায় বেঁকে যায়, একে বলা হয় Diffraction বা বাঁকন। আলো-কে যদি সরলরেখায় গতিশীল শক্তিকণা বলা হয়, তাহলে স্পষ্টতই বাঁকনের ব্যাখ্যা করা যায় না।

এমনি ধরনের দ্বিতীয় ঘটনা হল Interference বা প্রভাবন। কোন পর্দায় যদি সূক্ষ্ম কোন উৎস থেকে আলো সোজাসুজি বা কোন দর্পণে প্রতিফলিত করে ফেলা যায়, তাহলে পর্দাটির ছোট একটা অংশ সমভাবে আলোকিত হয়। কিন্তু যদি একই সঙ্গে ঐ সূক্ষ্ম উৎসের আলোর কিছু অংশকে সোজাসুজি এবং কিছু অংশকে প্রতিফলিত করে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যায় আগেকার সমভাবে আলোকিত অংশে এক আলো-আঁধারের নকশা তৈরী হয়। এক্ষেত্রে আলোর যে দু-অংশ দু-পথে এসে পর্দায় পৌঁছায় তারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে—পর্দার কোন অংশে এরা পরস্পরকে বিলুপ্ত করে, আবার কোন অংশে পরস্পরকে সাহায্য ক'রে মোট আলোর জোর বাড়িয়ে দেয়। এই প্রভাবনও আলো শক্তির কণা হলে সম্ভব হয় না; হয়ত দুটি শক্তির কণা এক জায়গায় পড়লে সেখানকার আলোর জোর বাড়বে, কিন্তু শক্তির কণাদুটি পরস্পরকে বিলুপ্ত ক'রে অন্ধকারের সৃষ্টি করে, একথা কোনও ভাবেই বোঝা যায় না।

বিশেষভাবে বাঁকন ও প্রভাবনের কথা মনে রেখেই অনেক বিজ্ঞানী আলোকে কণার সমষ্টি বলে স্বীকার করতে পারেন নি। তাদের মতে আলো হল এক ধরনের তরঙ্গ। আলোকে যদি তরঙ্গ মনে করা হয়, তাহলে বাঁকন ও প্রভাবন সহজেই বোঝা যায়। তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই দুটি ঘটনা সব সময়ে ঘটতে দেখা যায়। কোন জলাধারে যদি ঢিল ছুড়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে কোন বড় কাঠের টুকরা ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যায় জলের তরঙ্গ সহজেই কাঠের টুকরাটির কিনারায় বেঁকে গিয়ে একদিক থেকে অপরদিকে হাজির হয়। আবার কোন ছোট জলপাত্রে যদি নির্দিষ্টভাবে আন্দোলিত করে জলের তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়, তাহলেও দেখা যায় পাত্রটির কোন কোন জায়গার জলকণাগুলি খুব ওঠানামা করে, কিন্তু কোন কোন জায়গার জলকণা একেবারেই ওঠা-নামা করে না। এই দুটি ঘটনাই আলোর বাঁকন ও প্রভাবনের মতই। আবার আমরা জানি শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ, হাওয়ার বস্তুকণা-গুলির কাঁপনই শব্দের প্রকাশ। শব্দের ক্ষেত্রেও বাঁকন ও প্রভাবন সব সময়েই ঘটতে দেখা যায়। দুটো পাশাপাশি ঘরে কথা বললে ঘরদুটির মাঝখানে দরজা-জানালা না থাকলেও একঘরের কথা অন্য ঘরে শোনা যায়। শব্দ এক্ষেত্রে এক ঘর থেকে বের হয়ে বেঁকে এসে অন্য ঘরে ঢুকে পড়ে। আবার খুব বড় হল-ঘরে অনেক সময়েই দেখা যায় এক প্রান্তে শব্দ করলে ঘরটির বিভিন্ন অংশে শব্দের জোরের প্রচুর ওঠানামা হয়। কোন জায়গায় হয়ত শব্দ একেবারেই শোনা যায় না আবার তার থেকে দূরের জায়গাতেও শব্দ শোনা যায়। কাজেই আলোর বাঁকন ও প্রভাবনের ব্যাখ্যা করতে হলে ধরে নিতে হয় যে, আলো কোন এক ধরনের তরঙ্গ।

আলো-কে তরঙ্গ ধরে নেওয়ার আরেকটি সুবিধা হল, যে ঘটনাগুলির ভিত্তিতে আলোকে শক্তির কণা ধরা হয়েছিল সেই ঘটনাগুলিরও ব্যাখ্যা এতে করা চলে। তরঙ্গের বিস্তার নিয়ে অঙ্ক কষে সহজেই প্রমাণ করা যায়, আলো তরঙ্গ হলেও প্রতিফলনের নিয়ম মেনে প্রতিফলিত হবে। আবার যদিও ছোট আকৃতির অনচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রে বাঁকন হবে, কিন্তু বস্তুটির আকৃতি বড় হলে বাঁকন হবে না—মনে হবে আলো সরলরেখায় প্রসারিত হয়। কাজেই যে বিজ্ঞানীরা আলোকে তরঙ্গ বলে অনুমান করেছিলেন—বাঁকন ও প্রভাবনের কথা জানার পড়ে তাঁদের অনুমানই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। নিউটনের কণাশ্রয়ী মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে অনাদৃত হয়ে পড়ে। আলোর স্বরূপ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল এই যে, আলো হল এক ধরনের তরঙ্গ—কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট ৫×১০^{-৫} সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। ফলে বড় আকৃতির বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় আলো সরলরেখায় প্রসারিত হয় মনে হয়, কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি আকারের বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় এর তরঙ্গ-স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। আলোর তরঙ্গ-মতবাদে আলোর বিভিন্ন রং-এরও সহজ ব্যাখ্যা হয়। দেখা যায় আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হতে পারে এবং এই বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো আমাদের চোখে বিভিন্ন রং-এর অনুভূতি আনে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যতই বাড়ে ততই আলোর রং বেগুনী থেকে লালের দিকে এগিয়ে যায়।

তরঙ্গ-মতবাদে আলোর সব গুণাগুণের ব্যাখ্যা হলেও বহুদিন পর্যন্ত একটা সমস্যার সমাধান হয় নি। তরঙ্গ সব সময়েই কোন মাধ্যমকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়। জানা কোন বস্তুই আলোক-তরঙ্গের আশ্রয় হতে পারে না—কেননা বস্তুহীন জায়গাতেও আলো প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানীরা তাই এক কল্পনার বস্তুর আশ্রয় নেন। বস্তুটি হল ইথার। এ হল এমন জিনিস যার ভর নেই, যাকে কোনভাবেই অনুভব করা যায় না, যা সব জিনিসে ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই কল্পনার ইথারের স্বরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার সব রকমের বস্তু থেকেই আলাদা। কিন্তু যেহেতু আলোর তরঙ্গ-স্বরূপ সুপ্রমাণিত তাই বিজ্ঞানীরা এই ইথারের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন—আলোক-তরঙ্গ ইথারেই কাঁপন সৃষ্টি করে প্রকাশিত হয়, যেমন শব্দ প্রকাশিত হয় বায়ুতে। এই ইথারের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া—একভাবে বলা যেতে পারে এটা তরঙ্গ-মতবাদের গোঁজামিল। সব রকমের অবিশ্বাস্য গুণ ইথারের থাকলেও ভরহীন ইথারে কি করে যে আলোর শক্তি প্রকাশিত হতে পারে, তা কোনক্রমেই বোঝা যায় না। বহু কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তাই আলোর ব্যাপারে একটা অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়েছেন—তরঙ্গ-মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত শূন্যের উপরে। শূন্যকে আশ্রয় করেই আছে আলোর তরঙ্গ। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী হলেও এই শূন্যের তরঙ্গের সঙ্গেই শক্তি জড়িত আছে।

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞানীদের এই অস্বস্তির অবসান হয়। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বলক্ষেত্রের পরস্পরের উপর প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পান যে, এই বলক্ষেত্র কোন কোন অবস্থায় মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে চুম্বক বা বিদ্যুতের বলের জোর দূরত্বের সঙ্গে তরঙ্গের ন্যায়ই পরিবর্তিত হবে। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর বলক্ষেত্রের সঙ্গে শক্তি জড়িয়ে থাকে। এই তরঙ্গের নাম

দেওয়া হয় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এর অস্তিত্ব পরবর্তীকালে হার্জের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। এও দেখা যায় যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের গতি-বেগ আলোর গতিবেগের সমান। তাই আলো-কে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ধরে নিলে সব সমস্যারই সমাধান হয়। ম্যাক্সওয়েলের পরে বিজ্ঞানে আলোর যে স্বরূপ বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায় তা হল এই যে—আলো এক ধরনের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। সাধারণ বেতার-তরঙ্গের তুলনায় আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব কম। এক বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যানুসারে বিভিন্ন ঘটনার সূত্রপাত করে। এর দৈর্ঘ্য খুব বেশী হলে বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই একে ধরা যায় এবং একে বলা হয় বেতার-তরঙ্গ। মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের হলে একে আমরা তাপ বলে অনুভব করি। বিকীরিত তাপ স্বল্প দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও ছোট হলে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আলো হয়ে দেখা দেয়। রঞ্জন-রশ্মি এবং গামা-রশ্মিও বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, কিন্তু এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোর চেয়েও ছোট। ম্যাক্সওয়েলের পরে আলো সম্পর্কে বিজ্ঞানী-মহলে একটি নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, আলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ জানা গেছে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যের তরঙ্গই হল আলোক। বিজ্ঞানীদের খুশী হওয়ার বিশেষ কারণও ছিল—কেননা আলোর জানা সব গুণই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের স্বরূপ থেকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এই নিশ্চিন্ততা কিন্তু খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই আলোর দুটি নূতন প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়, যা এই সুপ্রতিষ্ঠিত তরঙ্গ-মতবাদকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। প্রথম হল গরম পদার্থ থেকে বিকীরিত তাপ বা আলোর পরিমাণের সঙ্গে কম্পাঙ্কের সম্পর্ক। কোন পদার্থকে গরম করলে তা থেকে তাপ বিকীরিত হয়—তাপ-মাত্রা বাড়লে ক্রমান্বয়ে লাল এবং আরো পরে সাদা আলো বেরোতে থাকে। কোন তাপ-মাত্রায় গরম পদার্থ থেকে একই সঙ্গে তাপ, লাল আলো বা আরও ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো বেরোতে থাকে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা রং-এর যে আলো বিকীর্ণ হয় তাদের পরিমাণের সঙ্গে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। যদি অঙ্ক কষে এই সম্পর্ক হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, আলো তরঙ্গের ন্যায় সুষমভাবে পদার্থ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে—এটা ধরে নিলে পরীক্ষায় পাওয়া হিসাবের সঙ্গে মেলে না। কাজেই এই বিকীর্ণ তাপ বা আলোর প্রকৃতি তরঙ্গ-মতবাদ থেকে পরিষ্কার হয় না।

দ্বিতীয় যে ঘটনা তরঙ্গ-মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না, সেটি হল আলোক-তড়িতের স্বরূপ। কোন ধাতুর উপরে আলো পড়লে, বিশেষভাবে সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের উপরে পড়লে, ধাতুটি থেকে কিছু ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে আলোক-তড়িৎ (Photo-electricity)। ইলেকট্রনগুলি আপতিত আলোর শক্তি আত্মসাৎ করেই কেন্দ্রীনের বন্ধন ছাড়িয়ে বাইরে আসে। এক্ষেত্রেও পরীক্ষায় কতগুলি নিয়ম আবিষ্কৃত হয়—তার মধ্যে প্রধান হল যে, বিশেষ কম্পাঙ্কের কম কম্পাঙ্কের আলো পড়লে আর ইলেকট্রন বার হয় না। এই ঘটনাটিও তরঙ্গ-মতবাদ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না—কেননা সব কম্পাঙ্কের তরঙ্গের শক্তিই ইলেকট্রনের আত্মসাৎ করা উচিত।

উপরে উল্লেখ করা দুটি ঘটনা কোনভাবেই তরঙ্গ-মতবাদে ব্যাখ্যা হয় না, কিন্তু আলো-কে যদি শক্তির কণা মনে করা হয় তাহলে ব্যাখ্যা

করা যায়। গরম পদার্থ থেকে আলো একটি একটি করে শক্তির কণারূপে আত্মপ্রকাশ করে, কম্পাঙ্ক f হলে কণার শক্তি হবে hf, h হল একটি ধ্রুবক যার নাম দেওয়া হয়েছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। প্ল্যাঙ্ক অঙ্ক কষে প্রমাণ করেন যে, আলো এমনি শক্তির কণা হলে বিকীর্ণ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর পরিমাণ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক পরীক্ষায় পাওয়া যায়, তা হিসাবের সঙ্গে মেলে। আবার আইনষ্টাইন দেখান যে, আলো এমনি শক্তির কণা হলে আলোক-তড়িতের গুণও বোধগম্য হয়। এক ভাবে দেখতে গেলে বিজ্ঞানী-মহলে আবার নিউটনের কণা-আশ্রয়ী মতবাদ ফিরে এলো—প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইনের অঙ্কের সাফল্যের পরে।

বর্তমানে আলো সম্পর্কে তাই এক দোটানা মতবাদ চালু হয়েছে। আলো যখন পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসে বা পদার্থে বিলুপ্ত হয় তখন আলো হল কণার সমষ্টি। এই কণাগুলি শক্তির কণা। বস্তুর কণার সঙ্গে এদের বিশেষ পার্থক্য যে, এরা সব সময়েই আলোর গতিবেগ নিয়ে ছুটে চলেছে। এদের গতিবেগের কখনও পরিবর্তন হয় না বা এরা কখনও স্থির থাকতে পারে না। গতি আছে বলেই এদের শক্তি আছে এবং আইনষ্টাইনের সূত্রানুসারে এদের শক্তির সম-পরিমাণ ভরও আছে। কিন্তু সাধারণ বস্তুর কণার মত এদের ভর নয়। যদি এদের কখনও গতিশূন্য করা যেত তাহলে এদের ভর থাকত না।

আলো যখন উৎস থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তখন কিন্তু আলো পুরোপুরি তরঙ্গের মত। এই তরঙ্গ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ—সব দিক থেকে বেতার-তরঙ্গের সমগোত্রীয়—কিন্তু কম্পাঙ্ক বেশী।

উৎস থেকে শক্তির কণারূপে আত্মপ্রকাশ করে আলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গরূপে ছড়িয়ে পড়ে—আবার শক্তির কণা হয়েই পদার্থে মিলিয়ে যায়; 'আলো কি ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা আজ একথাই বলছেন। যতদূর মনে হয়, আলোর এই অবোধ্য দ্বৈতরূপই সম্ভবতঃ মানুষকে চিরকালের জন্য স্বীকার করে নিতে হবে।

ক্লান্ত নটের প্রার্থনা

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

পাদ-প্রদীপের আলোক নেভাও
পালা ক'রে দাও শেষ,
মুখ হ'তে রঙ ঘ'ষে তুলে ফেলি
খুলে ফেলি এই বেশ।
যে ভূমিকা দিয়ে এতদিন ধ'রে
রেখেছো ভুলায়ে মোরে
আর নয়, তার হোক অবসান
যবনিকা যাক প'ড়ে।

হাসি-কান্নায়, দুঃখ ও সুখে
কতো রসে, কতো সুরে
দৃশ্যের পর দৃশ্যে নামালে
এ মায়া-মঞ্চ জুড়ে!
বাহবা দিয়েছো, কখনো আবার
দিয়েছো তো উপহাস,
এবারে আপন সত্তারে দাও
চিনিবার অবকাশ।

বঙ্গহৃদয় শ্রীচৈতন্য

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন তাঁর চৈতন্য-লীলাবিষয়ক নাটকটির নাম দিয়েছেন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-শতকের বাঙালীজীবনের ঘনান্ধকারের পটভূমিতে এই চৈতন্যচন্দ্রোদয় যে কী পরম সার্থকতার বাণী বহন করে এনেছিল, আজ পাঁচশো বছর পরের বাঙালী আমরা, বারংবার কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা স্মরণ করে ধন্য হই। বহুবিচিত্র জাতির মিলনভূমি এই ভারতবর্ষে বাংলার সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও আমরা সমগ্র ভারতীয় চেতনারই অঙ্গরূপে নিজেদের অনুভব করি। এই ভারতের অজস্র সাধনপন্থার বৈচিত্র্যে বাংলার সাধনা তার স্বাতন্ত্র্যের পথেই সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা তার সাক্ষী।

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য আছে। সেই আত্মোপলব্ধির পরম প্রকাশ এক একটি ব্যক্তিত্ব-অবলম্বনে বিশ্বময় বিচ্ছুরিত হয়। শ্রীচৈতন্যজীবনে বাঙালীর সেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিভার বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। যে পরমসত্যোপলব্ধির আহ্বানে ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে এই তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সেই উপলব্ধির সুরময় ছন্দময় আত্মপ্রকাশ আজ অবধি নিখিলরসিকচিত্তকে মুগ্ধ বিস্মিত প্লাবিত করে রেখেছে।

বস্তুতঃ যে কবিসত্তা ও আবেগধর্ম বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রধানতম প্রেরণা, শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ সত্তার আবির্ভাবে সেই প্রেরণার পূর্ণপ্রকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা সাধকের কাহিনী অনেক শোনা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-জীবনের শেষার্ধে ভগবৎপ্রেমের যে শরীরীবিগ্রহ বিশ্বচেতনার সিন্ধুতীরে প্রতিষ্ঠিত হল, তার অতুলনীয় মহিমা এক হিসাবে বাংলার জাতীয় প্রতিভার অনন্য প্রকাশরূপেই স্বীকার্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আবেগ-নির্ভর ভক্তি-তন্ময় জীবনাদর্শের জয়গান আমাদের বস্তুসমৃদ্ধ যন্ত্রযুগের প্রগতিপথে কতখানি সহায়ক? আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই নাম-প্রেমময় অশ্রুবিহ্বল আকুলতা কতখানি কাম্য ও সংগত? অন্ততঃ চৈতন্যজীবনাদর্শ সম্বন্ধে প্রচলিত সমালোচনার মূল্যবিচার করে আধুনিক বাঙালী মানসে এই দেবমানবের আবির্ভাবের সার্থকতা অনুধ্যান আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, মহামানবের আবির্ভাব শুধু যুগপ্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নয়, একহিসাবে যুগোত্তীর্ণতাই মহৎ আদর্শের মাপকাঠি। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম যদি মধ্যযুগের মানব-জীবনে অমৃতবার্তা এনে থাকে, তবে আধুনিক জীবনেও সে-আদর্শের কোন সার্থকতা নিশ্চয়ই নিহিত। প্রয়োজন শুধু সমাহিত চিত্তে অনুধ্যান।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে সভ্যতার রকেটগতি অভিযান আপাততঃ আমাদের বিস্মিতদৃষ্টির সামনে সবচেয়ে বড়ো সত্য। মারণাস্ত্রমহিমার জয়গানের পাশাপাশি মহা-কাশযাত্রীর সগৌরব পক্ষবিস্তার বিজ্ঞানের অভাবিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে পৌঁছে

দিয়েছে এ যুগের মানুষকে। তবু কি মনে করা যায় না, আধুনিক যুগের রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করে চলেছেন, 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'? অন্তরের যে পূর্ণতায় পৌঁছুতে না পারলে কোন বহিরঙ্গ কীর্তিই সমাজ ও সভ্যতার ধ্বংসরোধ করতে পারে না, সে সম্বন্ধে আধুনিকতম বিজ্ঞানও খুব নতুন কিছু বলতে পেরেছে কি? আধুনিক সাহিত্যে শিল্পে যে সংশয়যন্ত্রণামথিত নৈরাজ্যপ্রবণতা, তার মূলে কি তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার অন্তঃসারহীনতাই অনেক পরিমাণে দায়ী নয়? বিজ্ঞানের বস্তুমূল্য মানুষের অন্তরের মূল্যকে কোনদিনই মুছে ফেলতে পারবে না। তাই, বহির্বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তর্বিজ্ঞানের মিলনেই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব—একথা মনে না রাখলে আধুনিক ভারতবর্ষেরও সমূহ বিনষ্টি অনিবার্য।

বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে গভীর আবেগ ও প্রখর মনন—হৃদয় ও বুদ্ধির আপাত-বিপরীত প্রবণতা বহুকাল থেকেই সঞ্চারিত। বাঙালীর সাংস্কৃতিক রাজধানী নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনেরও সূচনা। বেদস্বীকৃত মানবজীবনের চতুর্বর্গ-ফললাভের আদর্শের সঙ্গে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের সংযোজন ভারতীয় দার্শনিকচিন্তা-ধারায় বাঙালী মনীষারই দান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের মহত্ত্বঘোষণার দ্বারা হৃদয় ও মনীষার এক অভূতপূর্ব যোগ-সাধন বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। যা বুদ্ধির দ্বারা পরিশীলিত, তাকে হৃদয়ের দ্বারা আত্মস্থ করাই বাঙালী-মানসের স্বধর্ম। শ্রীচৈতন্যজীবনে ও চৈতন্য-কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় মানবাত্মার অন্তর্লোকের এই অপূর্ব সমন্বয়প্রচেষ্টা—আধুনিক জড়সর্বস্ব একান্তবুদ্ধিবাদী ও আত্মযন্ত্রণায় পীড়িত মানবসমাজের জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাধান। অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন স্তরের সার্থকতার কথা মনে রেখেই 'অন্যতম' শব্দটি ব্যবহৃত; বস্তুতঃ সব সাধনাই অনন্ত প্রেমে আপন সার্থকতা খুঁজে পায়। শ্রীচৈতন্য সেই অনন্ত প্রেমেরই প্রতীক।

শ্রীচৈতন্যজীবনের প্রথম চব্বিশবৎসরের ইতিহাসে একটি জ্ঞানদৃপ্ত প্রখরবুদ্ধিশালী যুবকের নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজে প্রবল আত্ম-প্রতিষ্ঠার কাহিনী। বাইরের এই প্রবল বিতর্ক-পরায়ণতার অন্তরালে ভক্তির নিঃশব্দ ফল্গুস্রোত তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। অথচ জগতের ইতিহাসে এমনি ঘটেছে বারম্বার। বিশুষ্ক বৈশাখের শেষে অশ্রান্ত শ্রাবণের মতো সব বিচার-বিতর্ক একদিন হৃদয়ের উত্তালতরঙ্গে বিপুল বন্যার পলিমাটি রেখে যায় মানবহৃদয়-প্রান্তে। বুদ্ধের নির্বাণসাধনার কঠোর জ্ঞানমার্গ কখন মানবকরুণায় বিগলিত হয়ে সাহিত্যে, শিল্পে, সেবাধর্মে শতধারে উৎসারিত। ফরাসী-বিপ্লবের শাণিত ব্যঙ্গ ও প্রখর যুক্তির পরে দেখা দিল রোমান্টিসিজ্‌মের উধাও স্বপ্নচারণ—য়ুরোপের সমস্ত আকাশে তার মুক্তিবার্তা ছড়িয়ে পড়লো। ফল্গুতীরে গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্ম-মন্দিরে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর রূপান্তরিত হলেন প্রেমিক বিশ্বম্ভরে। তারও দু'হাজার বছর আগে এই ফল্গুতীরেই ধ্যানমগ্ন শাক্যসিংহ নির্বাণের সত্য-লাভ করেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতির দুটি দিগন্ত এই গয়াধামে সম্মিলিত।

চৈতন্যজীবনের দ্বিতীয়ার্ধে পরমসত্যের অন্বেষণে চরম আত্মত্যাগের আদর্শস্থাপনের অমৃতকাহিনী। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর কেবল মৌখিক সিদ্ধান্তে তুষ্ট না থেকে সত্যলাভের জন্য প্রথমে অধ্যাপনা, পরে পত্নী ও জননীর

সান্নিধ্য ত্যাগ করে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করলেন। হয়তো তাঁর অধ্যাপকজীবনও এইভাবেই সম্পূর্ণতা লাভ করলো। সাধারণ পুথিবদ্ধ পাণ্ডিত্যের দাস না হয়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণনির্দেশক হয়ে উঠলেন। নবদ্বীপের সীমাবদ্ধ পণ্ডিতসমাজ থেকে দীন-দুঃখী, পাপীতাপী, হিন্দুমুসলমান—সর্বশ্রেণীর মানবের হৃদয়পদ্ম-উন্মোচনই তাঁর ব্রত হল। সীমায়িত সংসার-ত্যাগ আসলে সমগ্র মানব-সমাজের বিশ্বরূপে পরমসত্যদর্শনের সহায়ক হয়ে উঠল। সবচেয়ে বড়ো ভালোবাসা সব-চেয়ে বড়ো আত্মদানের দাবীতে তাঁকে নীলাচলে প্রতিষ্ঠিত করল।

চৈতন্যজীবনের এই শেষার্ধের প্রথম দিকটি কেটেছে গৌড়, দাক্ষিণাত্য আর কাশী-বৃন্দাবন-অঞ্চলে পরিক্রমায়। শেষ বারো বৎসরে তাঁর দিব্যোন্মাদ-অবস্থা—কবি বিদ্যা-পতির ভাষায় "অনুখন মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলী মাধাই"—অনুক্ষণ রাধাভাবে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণতন্ময়া শ্রীরাধিকায় পরিণত। মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতা-মৃতে'র অমৃত অংশ এই শেষ বারো বৎসরের বর্ণনায়।

সন্ন্যাসের পরেও তাঁর বিচার-প্রবণতার নিদর্শন মেলে বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনায়। কিন্তু ক্রমে সব বাইরের কলরব স্তব্ধ হয়ে অন্তরময় পরমানুভবের অমৃত-আস্বাদনে তিনি ডুবে যেতে লাগলেন। ভক্তিসাধনার পরম গভীরে কখন এই কৃষ্ণতন্ময় সাধক দেহসত্তা অতিক্রম করে মহাভাবে বিলীন হয়ে গেছেন, তার ঘটনাগত বিবরণ একান্ত অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকারেরা বর্জন করে গেছেন। বাস্তবিক সমগ্র চৈতন্যজীবনের ক্রমবিকাশ ভাব-কল্পনাময় একটি দিব্যব্যক্তিত্বের অনন্তলীলাসমুদ্রে আত্মনিমজ্জনের কাহিনী। পরমসত্যের সঙ্গে এই একাত্ম হওয়ার সাধনাই ভারতবর্ষের অন্তরতম সাধনা।

বস্তুবিজ্ঞানের লক্ষ্য 'পাওয়া', অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সার্থকতা 'হওয়া'। শ্রীচৈতন্য, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভারতের অগণনসাধকেরা সেই 'হওয়া'র আদর্শের চিরপথিক। তাঁদের মধ্যেও শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, যে প্রেম মানবচৈতন্যের মধ্যবিন্দু, সে প্রেমকে তিনিই সবচেয়ে বেশী রূপান্তরিত করেছেন তাঁর রাধা-ভাবের নিত্যবৃন্দাবনে। কবির কল্পনা, যোগীর ধ্যান, জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা শ্রীচৈতন্যের ব্যাকুলতা, বেদনা ও মহাভাবে ভগবৎপ্রেমের যে পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছে, তার যথার্থ উপমা পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রোদয়ে। কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামকরণটি ইতিহাস ও কবিকল্পনার বিচারে সম্পূর্ণ সার্থক।

তবু যাঁরা শুধুমাত্র ভাবতন্ময় মাধুর্যরসের উপাসক শ্রীচৈতন্যকেই অনুধ্যান করে থাকেন, তাঁরা এই মহামানবের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থেকে বঞ্চিত থাকেন সন্দেহ নেই। এই মাধুর্য-তন্ময়তায় তাঁর অনন্য-সিদ্ধির কথা মনে রেখেও বলা চলে ওই দীর্ঘ গৌরকান্তি অখিলরসামৃত-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আর একটি রূপ ছিল—যেখানে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন রুদ্র-তেজে দীপ্ত, যে বৈরাগ্যের নির্মম সাধনায় সামান্যতম স্খলনেরও মার্জনা অভাবিত, ভক্তি-ধর্মপ্রচারে আন্তরিক ব্যাকুলতায় যেখানে তিনি শাস্ত্রদর্শী বিচারধর্মী প্রচারক। তিনি মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক—সেইসঙ্গে মহাকর্মী। তাঁর দাক্ষিণাত্য, বারাণসী, বৃন্দাবন-পরিক্রমা এই কর্মযোগেরই বহিঃপ্রকাশ। নীলাচলে অনুক্ষণ ভাব-তন্ময়তার মধ্যে থেকেও স্বরূপ-

দামোদর, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস—এমনি আরো অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর জীবনাদর্শ তিনি যেভাবে গড়ে তুলছিলেন, মানবকল্যাণের জন্য তাই তো শ্রেষ্ঠ কর্ম-সাধনা।

সুলতান আমলের বাংলাদেশে যে অধ্যাপক রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে অনায়াসে উপেক্ষা করে নবদ্বীপের রাজপথে মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীন অধিকার ঘোষণা করেছিলেন, যিনি জগাই-মাধাইয়ের ঔদ্ধত্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কঠোর শাস্তিবিধানের অভিজ্ঞতাকে হৃদয়-রূপান্তরের করুণাধারায় বিগলিত করেছিলেন, সংসারসুখের সহস্র সম্ভাবনাকে অনায়াসে তুচ্ছ করে যিনি বিশ্ববাসীর কল্যাণে 'আপনি আচরি ধর্ম' জীবকে শিখিয়েছিলেন, অনন্তকরুণাময় হয়েও যিনি পরমস্নেহভাজন ভক্ত ছোট হরিদাসের স্ত্রী-সম্ভাষণকে মুহূর্তের জন্যও ক্ষমা করেন নি, স্বয়ং নিঃসম্বল সন্ন্যাসী হয়েও যিনি রাজচক্রবর্তীর দর্শনপ্রার্থনাকে অনায়াসে অস্বীকার করেছেন—সেই বজ্রাদপি কঠোর পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কেবল মধুর রসের কোমলমূর্তি মনে করার কোন কারণই নেই।

চৈতন্যচরিত্রের অন্তরালে এই বজ্রদৃঢ় নিরাসক্তির আদর্শ ছিল বলেই তাঁর গোপী-প্রেমতন্ময়তা ভাববিলাসের উপকরণ না হয়ে, শ্রীরাধার বিরহতন্ময় প্রেমের অনন্ত সত্যকে আমাদের চিরকালের উত্তরাধিকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের পরম আদর্শের সঙ্গে একাত্ম-তন্ময়তা এবং সমস্ত অন্যায় ও দুর্বলতার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম—চৈতন্যচরিত্রের দুটি মূল উপাদান। সে আদর্শ আমাদের জাতীয়-জীবনকে পবিত্রতায়, বৈরাগ্যে, অটুট সঙ্কল্পে ও অনন্ত প্রেমের সংরাগে ধারণ করে আছে এবং থাকবে।

"ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই।…প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মহাত্মা কবীর ও ধর্মসমন্বয়

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

পুণ্যভূমি ভারতের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই ভারতের ধর্ম এক প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া সমূহ বিপদের আবর্তে পতিত হয়, তখনই ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ক্ষণজন্মা এমন কয়েকজনের আবির্ভাব ঘটে যাঁহাদের জীবন-সাধনার পবিত্র প্রভাবে সমস্যাপরিবৃত ভারতের ধর্মসাধনা শুধু যে কেবল বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, অধিকন্তু প্রতিবার প্রত্যেক বাধাকে অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ধর্মসাধনা অধিকতর পূর্ণরূপ ধারণ করিয়া থাকে ও প্রতিপক্ষী ধর্ম-দেশনার সারটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার ধর্মচেতনাকে আরো যুগোপযোগী, আরো সুদৃঢ় মহান করিয়া তোলে। কখনও বিদেশাগত জাতিকে আত্মসাৎ করিয়া স্বাঙ্গীভূত করিয়া লয়—কখনও বা জাতি-বিশেষের পণ্ডিতগণকে আপনার জ্ঞান-ধর্ম-দর্শন-সম্পদে পূর্ণ শ্রদ্ধাবান করিয়া তাহাদের দেশের ভাবধারার উপর আপনার প্রবল অপ্রতিরোধ্য প্রভাব অলক্ষ্যে বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া লয়। বস্তুতঃ ভারত একটি ভৌগোলিক অবস্থান নহে—ভারত সমগ্র মানবজাতির ধর্মীয় চেতনার বাস্তবায়িত প্রতিমূর্তি। তাই এই পুণ্যক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির আচরিত ধর্মের অতি প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাসসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাধুনিক নবতম রূপটির পর্যন্ত বিবর্তনের সকল স্তরের চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

মধ্যযুগে যখন দীন্ দীন্ গর্জনে তুর্ক-আরব-পাঠান-মোগলের আক্রমণ বন্যাধারার মত ভারতকে প্লাবিত মজ্জিত করিতেছিল—ইসলামের প্রবল বিধর্ম-বিদ্বেষ সমগ্র দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মকে নিষ্পিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণের রামানুজ-রামদাস, পাঞ্জাবের নানক প্রমুখ গুরুগণ, উত্তরপ্রদেশের কবীর-দাদু, বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ আগে-পিছে আবির্ভূত হইয়া জাতিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। নতুবা অধ্যাত্ম-ভারতের চিহ্নমাত্র থাকিত কিনা সন্দেহ। এই সকল ভক্তি-ধর্মান্দোলনের একটি ফলিতরূপ এই যে, উহা আরব-তুর্ক-পাঠান-মোগল-বাহিত ধর্মকে ও সভ্যতাকে প্রতিহত করিয়া সনাতন ধর্ম ও চরিত্রধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—নবাগত ধর্মের মধ্যে আপনার ধর্ম-নিহিত ভাবরাশি অজ্ঞাতে প্রবিষ্ট করাইয়া সংমিশ্রিত নবীন ধারার প্রবর্তনও করিয়াছে—আবার সনাতন ধর্মের অন্তর্গত পরস্পর পার্থক্যদর্শী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও এক যোগসূত্র স্থাপিত করিয়াছে। একই ঈশ্বর বিভিন্ন তাঁহার নাম। যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই আবার অলখ নিরঞ্জন—নির্গুণ। কবীরের রাম দ্বন্দ্বাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত ও অপরংপারপুরুষোত্তম—দাশরথি নন।

মধ্যযুগীয় এই ভক্তিপ্রেমধর্মের ফলে শাস্ত্রীয় আচারনিষ্ঠ ধর্মদ্বয় আপনাদের বৈধী অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে প্রেমের দ্বারা পাইতে চাহিল। তাহারই ফলশ্রুতি সুফী ধর্ম, কালান্দার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ও কবীর দাদু-রুইদাসের ভক্তিধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, ইহার দ্বারা মুসলমান ও হিন্দু সন্তদিগের দৃষ্টান্তে ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের আন্তরিক অনুপ্রেরণা সেই যুগকে সংস্কৃতিবান ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই

প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ প্রবক্তা সন্ত কবীর ও শিখধর্ম-স্রষ্টা গুরু নানক। অবশ্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেও ভক্তের জাতিভেদ মানা হয় নাই এবং 'আচণ্ডালে কোল' দিবার কথা আছে। কিন্তু কবীর দাদু প্রভৃতি সন্তগণ যেইভাবে জাতিপাতি, শাস্ত্র অধ্যয়ন, তীর্থযাত্রা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বর্জন করিয়া ইসলামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিল রামানন্দ বা শ্রীচৈতন্যদেব ততখানি অগ্রসর হইতে পারে নাই। মনে হয়, মধ্যযুগের কবীর যেন ধর্মসংস্কারে এই যুগের রামমোহনের ভূমিকা লইয়াছিলেন এবং তিনি যেন নবাগত ভাববন্যার বাঁধ-স্বরূপ হইলেন—আর মহাপ্রভু তাঁহারই সমসাময়িক কালে বিশ্বজনীন প্রেমধর্মের অনাবিল সৌন্দর্য ঈশ্বরপ্রেম-প্রবাহে সমুন্নীত করিয়া ধরিলেন।

মহাত্মা কবীর যতখানি উদারতার সহিত দুই পরস্পর আচারে বিপরীত ও প্রতিস্পর্ধী ভাবধারাকে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন সেইযুগে ততখানি উদারতা কেবল যে আশা করা যায় না, তাহা নহে সেই যুগের ধর্মীয় বিদ্বেষের পটভূমিকায় তাহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কারণ মুসলমান বাদশাহ্-গণের ইসলাম ধর্মপ্রসারের অত্যধিক উদগ্র সক্রিয় বাসনা হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিয়া প্রতিনিয়তই হিন্দুমানসকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছিল; হিন্দুও বিজিত বিপিষ্ট ও হৃতমান হইয়া বহিরাগত জাতির সহিত ধর্মকে এক করিয়া উভয়কেই ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য করিয়া রাখিল। দুই ধর্মের বাহ্যিক আচার-অর্চার এত অধিক পার্থক্য যে কেহই আচারের আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যকে দেখিবার ধৈর্যটুকুও ধরিতে চাহিল না। সামান্য যে কয়জন দুইটি ধর্মের আন্তরিক মৌল সত্তার মিল পাইলেন, মূর্খসাধারণ ও রাজন্যবর্গ তাঁহাদের নিপীড়িত ও নিহত করিতে অগ্রসর হইলেন। ঈশ্বর-দত্ত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন যাঁহারা তাঁহারা পূজিত হইলেন; কিন্তু তৎপ্রদর্শিত সাধন মার্গ জাতি বরণ করিল না।

মুসলমানগণ তখন রাজা—হিন্দুগণ প্রজা; বিধানানুসারে মুসলমান রাষ্ট্রে বিধর্মীগণ সাধারণ মুসলমান প্রজা অপেক্ষা নিম্নস্তরের প্রজা। কারণ তাহারা জিম্মি।[১] কোন কোন ধার্মিক মৌলবী, যেহেতু মুসলমান রাজগণ সমগ্র দেশকে মুসলমান করিতে সচেষ্ট হইয়া মৃত্যু অথবা জিজিয়া কর প্রদান এতদুভয়ের মধ্যে একতরকে গ্রহণ করিবার আইন জারি করিয়াছেন, সেই হেতু এই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন যে 'মৃত্যু অথবা ইসলাম গ্রহণ' এতদুভয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিবার আইন প্রচলিত না করিয়া মুসলমান রাজগণ ন্যায়কার্য করেন নাই। মুসলমান রাজগণও হিন্দুমন্দির ধ্বংস, বিগ্রহ ভঙ্গ, ব্রাহ্মণের উপবীত ছিঁড়িয়া দেওয়া, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি নিপীড়ন করিতে ক্লান্তি বোধ করেন নাই।[২] এইরূপ সময়েই মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের মতন সন্তের আবির্ভাব ঈশ্বর-প্রকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

মহাত্মা কবীরের জন্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত। জন্ম যেইখানে যেইভাবেই হউক না কেন তাঁহার যে জীবন-সাধনা উত্তরকালে হিন্দু ও মুসলমানকে দক্ষিণে ও বামে ধারণ করিয়া দুইএর মধ্যে মিলনসূত্র বন্ধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহাই অনুধ্যানের। গরীব জোলা পিতামাতা—নিরু ও নিমা; জাতিতে মুসলমান হইলেও তাহারা কয়েক পুরুষ পূর্বে নাথপন্থী যোগী ছিলেন। সুতরাং কবীর যেই পরিবেশের মাধ্যমে সংসারকে, ধর্মকে জানিয়া-

১. The Delhi Sultanate, page 617-18.
২. Ibid page 620.

ছিলেন সেই পরিবেশেই উভয় ধর্মের মিলনসূত্রের তুলাটুকু তিনি পাইয়াছিলেন—তাহাই তাঁহাকে উভয় ধর্মের প্রতি সমশ্রদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছিল।

নাথযোগিগণ বেদ-ব্রাহ্মণ মানিতেন না। জাতিভেদ, মূর্তিপূজা, বাহ্যিক আচার-বিচার তাঁহারা হেয় জ্ঞান করিতেন। স্মরণ রাখিতে হইবে ভারতে মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে নাথসম্প্রদায়ের আদিগুরু মীননাথের আবির্ভাব। মনে হয়, বেদ, ব্রাহ্মণ ও জাতি-ধর্মে অশ্রদ্ধাসম্পন্ন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের ও তন্ত্রের সংমিশ্রণে ভারতের সুপ্রাচীন যোগমার্গই এক ভাবে নাথসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। নাথ-মতে মোক্ষলাভ জীবের উদ্দেশ্য হইলেও, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করিয়া এই মরণশীল দেহকেই সাধনদ্বারা দীর্ঘজীবী করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করা অধিকতর স্পৃহণীয়। নাথযোগীরা হঠযোগী—কায়াসাধনের দ্বারাই তাঁহারা মহাজ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী হইতেন। সূর্য—প্রাণবায়ু, চন্দ্র—অপানবায়ু; এই দুইয়ের যোগ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুনিরোধই হঠযোগ। আবার সূর্য অর্থাৎ ঈড়া, চন্দ্র—পিঙ্গলা এই উভয়কে রুদ্ধ করিয়া সুষুম্নার মধ্য দিয়া প্রাণবায়ু-প্রবাহই এই সাধনার মূল।

হকারঃ কথিতঃ সূর্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্যচন্দ্রমসোর্যোগাৎ হঠযোগো নিগদ্যতে॥
—সিদ্ধসিদ্ধান্ত।

তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান বা মহাজ্ঞান লাভ করিতে 'খেচরী' মুদ্রার সাহায্য লইতেন। জিহ্বাকে কণ্ঠ-কূপে প্রসারিত করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা রহিত হইয়া অমৃতের আস্বাদকেই শিবশক্তির মিলন বলিতেন। পিণ্ডতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, কায়াসাধন, উন্মুনীভাব, বিমনস্কভাব প্রভৃতি নাথদের বিশেষ সংজ্ঞা।

নাথস্বরূপ অর্থে তাঁহারা সগুণনির্গুণাতীত দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকেন। এই অবস্থাকে বুঝান যায় না বলিয়া তাঁহারা এই অবস্থাকে 'নির্নাম', 'অনাম' প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন। কবীরের বহু দোহায় এই সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যোগিগণের বাঞ্ছিত ভাবধারাই তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় অপূর্ব ভাবগম্ভীরতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। হঠযোগে অভিজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্য ও কুশল নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন—এই জন্য গুরুবাদের উপর যোগপন্থীদের মধ্যে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা কবীরও গুরুবাদের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন।

যাহাই হউক, কবীর আপন পারিবারিক পরি-বেশের মধ্যে সহজভাবে আপনার মনের অনুকূল ভাবধারা পাইয়াছিলেন। ইহার সহিত দাক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদ শ্রীরামানুজ-শিষ্য রামানন্দের মাধ্যমে তাঁহাতে আসিয়া এক অভিনব রূপলাভ করিল। মহাত্মা রামানুজাচার্য হইতে ও গোঁড়া শাস্ত্রীয় কৌলিন্য হইতে শ্রীরামানন্দ যতখানি দূরে সরিয়া আসিলেন—কবীর রামানন্দ হইতে আরো অধিক দূরে সরিয়া আসিয়া ভক্তিধারাকে বিশ্বজনীন করিতে চাহিলেন। রামানুজাচার্য যে প্রেমসম্পদে বলীয়ান হইয়া আপনার গুরুর নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া গূঢ়মন্ত্র সাধারণ্যে প্রচার করিলেন, সেই প্রেম-সম্পদে আত্মহারা রামানন্দ জাতিপাঁতির গণ্ডী অস্বীকার করিয়া ভক্তিধর্মের আঙ্গিনায় অচণ্ডালে স্থান দিলেন—কিন্তু বিধর্মী যবনকেও তিনি আপনার ক্ষেমংকর নামধর্মে বরণ করিতে চাহিতেন কিনা সন্দেহ। এই জন্যই যবন কবীরকে ছলনার আশ্রয়ে রামানন্দের নিকট হইতে মন্ত্রলাভ করিতে হইয়াছে। তাহাকে দীক্ষাদান বলা যায় কি-না তাহা তর্কের বিষয়—কিন্তু রামানন্দে

৩ তুলনীয় ক্ষুরোপনিষৎ।

যাহার সূচনা কবীরে তাহারই প্রবল প্রকাশ। কবীর যেন বিশ্বস্বর মূর্তি ধরিয়া সকল মানবকে বিশ্বপ্রভুর প্রাঙ্গণে মিলাইয়া মিশাইয়া এক করিতে চাহিলেন। কবীরের পারিবারিক বিশ্বাস, মুসলমান সংস্কৃতি ও ভক্তিধর্মে স্বীয় জীবনানুভূতি এই তিনটি কারণেই তাঁহাকে তাঁহার গুরু অপেক্ষা অধিক সার্বজনীন ও উদার হইতে সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সেই সময়ের ভারতীয় ধর্মসাধনায় যে কয়টি বিশেষত্ব যুগধারাকে বিশেষিত করিয়াছিল তাহা কবীরের সাধনায় সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। যথা, (১) সম্প্রদায়-হীনতা, (২) ভক্তিই মুক্তির একমাত্র সাধন, (৩) চিন্তায় অর্চনায় অবাধ স্বাধীনতা, (৪) প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের প্রতি প্রচণ্ড অনীহা, (৫) গুরুবাদ; সর্বশেষে (৬) ঈশ্বরের একত্ব উপলব্ধিতে বহুদেববাদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অদ্বয় চরম সত্য ব্রহ্মকেই রাম, কৃষ্ণ, শিব, আল্লা ইত্যাদি নামে বিভিন্ন সম্প্রদায় পূজা উপাসনা স্তুতি করিতে শিখিয়াছিল। তাই দেখি কবীরের ঈশ্বর অমূর্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম। রাম তাঁহার নাম। তাঁহার নাম লওয়া উচিত নয় কেননা তাহাতে তাঁহাকে ভিন্ন মনে হইতে পারে। তিনি নির্গুণ—আবার সগুণ-নির্গুণাতীত সত্যস্বরূপ। তিনি শিব, 'পরমাত্মা জীবমহলে অতিথি'। তিনি 'অলখ নিরঞ্জন—অবিগত অকল অনুপম'—দ্বন্দ্বাতীত, পক্ষাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত, অপরংপার পুরুষোত্তম। তিনি প্রভু সাহেব সাঁই; তিনি প্রিয়, ননদের ভাই—তিনি 'অবিনাশী দুলহা'; কত নাম, কত সোহাগ-বিগলিত বর্ণনা কবীরের দোঁহাবলীকে সরস মধুর করিয়াছে।

আবার অপর দিকে এই সৃষ্টিউত্তীর্ণ সত্তাই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—আধার সত্তা। তিনি আছেন অন্তরে বাহিরে। যত নরনারী তাঁহারই রূপ।...ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড · ঘটে ঘটে প্রভু বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকেই ব্যক্তিভাব আরোপ করিয়া কবীরের সাধনা, তথাপি ঈশ্বরের সাকার মূর্তির প্রতি কবীর অনুরক্ত নন। এইখানেই কবীরের যোগীজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গিমার সম্যক্ পরিচয়। তাঁহার সাধনা 'অহং'-লোপের সাধনা।

মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া তাই তাঁহার প্রাণ জীবন্ত থাকিয়াই মরিয়া যায়। প্রেমাভক্তির সহায়ে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই কবীরের কাম্য। কিন্তু যে দিব্যভাব সহায়ে সাধক পরমাত্মাকে চিন্ময়রূপে দর্শন-স্পর্শন ও লীলা-আস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন, কবীরের প্রেম তাহা নহে। যদিও সাকারকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন—বলিয়াছেন—'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ'। সাকার বলিতে তিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বিরাট মূর্তিকেই বুঝাইয়াছেন—কারণ মূর্তিপূজায় ঘোরতর আপত্তি তাঁহার ছিল। যদি ঈশ্বরের চিন্ময় বিগ্রহ দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার থাকিত তবে প্রতিমা গড়িয়া পূজাকে, দেবস্থানকে তিনি এত নির্মমভাবে শ্লেষবিদ্ধ করিতেন না।

'যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য; যিনি ঈশ্বর ব'লে গোচর হন তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু ভালমন্দ শুচি-অশুচি সমস্ত।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-লীলার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টি কবীরের দোঁহাতে পরিস্ফুট। তিনি বলিতেছেন—

---

* Ibid page 547.

সন্তো, ধোখা কাসূঁ কহিয়ে।
গুণমেঁ নিরগুন, নিরগুণমেঁ গুণ, বাট ছাড়ি
ক্যূঁ বহিয়ে।
অজরা-অমর কথৈ সব কোঈ অলখ ন
কথনা জাঈ।
জাতি-স্বরূপ-বরণ নহি জাকে ঘাটি ঘাটি
রহ্যৌ সমাঈ।
প্যণ্ড ব্রহ্মণ্ড কথৈ সব কোঈ বাকৈ আদি
অরু অন্ত ন হোঈ।
প্যণ্ড-ব্রহ্মণ্ড ছাঁড়িজে কহিয়ে কহৈ কবীর
হরি সোঈ॥

'সন্ত কাকে বলব ধোঁকার কথা। গুণের মধ্যে নির্গুণ, নির্গুণের মধ্যে গুণ এই পথ ছেড়ে লোকে কেন বাইরে যায়। সবাই বলে তিনি অজর অমর। কিন্তু তিনি যে অলখ এবং অবর্ণনীয়। তাঁর জাতি নেই, স্বরূপ নেই, বর্ণ নেই কিন্তু ঘটে ঘটে তিনি প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সবাই বলে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের কথা। কিন্তু তাঁর আদিও নেই অন্তও নেই। যিনি পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছেন, কবীর বলছে তিনিই হরি।'

আজন্ম যোগী পরিবেশ ও ঐস্লামিক চিন্তার প্রভাবেই যে কবীরকে চিন্ময় বিগ্রহে অনন্তরক্ত ও পূজাদিতে বীতশ্রদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবীর যাহা পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে তাহাই পূর্ণ মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা যুগোপযোগী ধর্মসাধনার পথনির্দেশ রাখিলেন—কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধির যুগযুগবাহিত বহুতর পথনির্দেশকে সমশ্রদ্ধায় বরণ করিলেন না। প্রয়োজন ছিল এমন একটি পূর্ণ আবির্ভাবের যাঁহার মাধ্যমে সকল ভাবধারার সকল পথের পূর্ণ স্বীকৃতি আপনার সাধনা ও উপলব্ধিতে ঘটিবে। শ্রীরামকৃষ্ণই সেই বহু-বাঞ্ছিত পূর্ণ আবির্ভাব। উত্তরোত্তর কালের আবির্ভাব পূর্ব পূর্ব কালের ভাবধারার সহিত যুক্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ পূর্ণ পূর্ণতর হইতে থাকে। কোন ভাবধারার প্রবল প্রকাশ আকস্মিক হয় না। উক্ত ভাবধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রকাশ কিছুকাল ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে হইতে থাকে, পরে একসময় তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু উহা তখন মনের গভীরে ক্রিয়াশীল হইতে থাকে। অবশেষে বহিরাগত কোন বাধার সম্মুখীন হইলে জাতির চৈতন্য সঙ্কুচিত হইয়া একান্ত অজ্ঞাতসারে অবচেতনে বর্ধিত সেই ভাবধারাই প্রবল বেগ প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছ্বাসে উদ্দমে দশদিক ধাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঠিক এইভাবে মধ্যযুগব্যাপী ধর্মসংস্কারের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা জাতির অন্তরের গভীরে একটা মহা উত্থানের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছিল। কিন্তু আধুনিক যুগপ্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বকালে তাহা অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে বণিকসভ্যতা ও খৃষ্টধর্মের প্রভাবে অবচেতনে চালিত সেই শক্তি অপূর্ব আবির্ভাবে ফাটিয়া পড়িল। তাই বর্তমান কালের এই আবির্ভাব এত পূর্ণ ও বহু ভাবধারার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। মধ্যযুগের ধর্মসমন্বয়-প্রচেষ্টাই যে বর্তমান প্রকাশের কারণ তাহা অনস্বীকার্য। তাই কবীর যে পূর্ণতার প্রচেষ্টা-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহারই পূর্ণ বিগ্রহস্বরূপ।

মহাপুরুষগণ যুগচিন্তার অসামঞ্জস্য ও অপূর্ণতাকে দূর করিতে আবির্ভূত হন। মনে হয়, মধ্যযুগের পরস্পর-প্রতিস্পর্ধী ধর্মদ্বয়ের বিরোধের কারণ তাহাদের আচার-অর্চার একান্ত বৈপরীত্য। এই বিপরীত অংশগুলি ত্যাগ করিলে ধর্মের মূলগত চিরন্তন সত্তা যে একই, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে, ফলে পরস্পরের বিদ্বেষবুদ্ধি তিরোহিত হইবে—এই বিশ্বাস ও অনুভূতি তৎকালীন মহামনা সাধকদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কার্যতঃ তাহা

আংশিক সফলতা লাভ করিলেও ধর্মদ্বয়ের সমগ্র স্তরকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কারণ এই ধর্মান্দোলনের ফলে ধর্মভীরু সাধারণ মানব পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল এবং মুসলমান রাজশাসকদের কাফের নিধনকল্পে উদ্যত শাণিত করবাল সংযত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তাহারই ফলে, আওরঙ্গজীব ব্যতীত সকল মোগল বাদশাহ্গণ ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বিরত ছিলেন এবং সম্রাট আকবর এই আদর্শকেই হিন্দু-মুসলমান-সংহতির জন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতির মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উভয় ধর্মের গোঁড়াপন্থীগণ এই ধারাকে স্বাগত ত জানানই নাই উপরন্তু ইহাকে তাঁহাদের অভীষ্টলাভের একান্ত অন্তরায় বিবেচনা করিয়া এই ধারায় বিশ্বাসী জনগণকে সমাজে অপাঙ্ক্তেয় করিয়া রাখিলেন। এই কারণে এই সকল সন্তগণ সম্প্রদায়গঠনের একান্ত বিরোধী হইলেও ইঁহাদের অনুবর্তী ভক্তগণ দৃঢ়সংবদ্ধ সম্প্রদায় গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার কালক্রমে গোঁড়াপন্থীগণ তাহাদের অতি উদার মত গ্রহণ করিলেও ঐ সকল সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য-সূচক কতকগুলি মতবাদ বর্জন করিতে হইল। এই কারণে মহাত্মা শ্রীচৈতন্য যে উদারতা লইয়া আচণ্ডাল-যবনকে আপনার ধর্মভুক্ত করিলেন —সেই উদারতা বহুকাল পূর্বেই বিসর্জিত হইয়াছিল।[৫]

মধ্যযুগের সমন্বয়প্রচেষ্টা যে সর্বাংশে সার্থক ছিল না—তাহা বর্তমান যুগ-প্রচেষ্টার নিরিখে বুঝিতে পারা যায়। এই কারণেও মধ্যযুগের মিলন-প্রয়াস সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধনালোকে ঐ প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আত্মার প্রকাশ যেমন শরীরে ও মনে, কোন ধর্মের ভাববিশেষের প্রকাশও তেমন কতকগুলি আচারে ও রীতিনীতিতে নির্ভরশীল। আচার-বিচারের কঠিন নির্দেশের অন্তরালে ধর্মবিশেষের কোমল ভাবধারা কূর্মের কঠিন আবরণের অন্তরালে অবস্থিত কোমল প্রত্যঙ্গাদির ন্যায় রক্ষিত হয়। বস্তুতঃপক্ষে ভাববিশেষের বিকাশ ও কল্যাণকর প্রভাব জন-মানসে দৃঢ়-মুদ্রিত করিবার জন্যই ধর্মীয় পূজা-উৎসব, দেব-মন্দির ইত্যাদির ও বিশেষ বিশেষ আচার-পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। ঐগুলিকে অনাবশ্যক বোধে বাদ দিলে এককালে দেখা যাইবে, জাতি-বিশেষের বিশিষ্ট ভাবধারারও বিলোপ ঘটিতেছে। মুসলমানদিগের আপন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্ব তাহা সম্মিলিত নামাজ পাঠের মাধ্যমে বহুপরিমাণে পরিপুষ্ট। এই প্রথা রহিত করিয়া দিলে এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনও হ্রাস পাইবে। সুতরাং কোন ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইলে আঙ্গিকটুকুকেও বরণ করিতে হইবে। কাটিয়া ছাঁটিয়া মিলিত করিলে তাহা আপন আপন ক্ষেত্রবাহিত বৃহত্তর ভাব-পরিমণ্ডলের চিরন্তন প্রাণস্পন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া চীনামাটির ভাসে শোভিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় কৃত্রিম হইয়া পড়িবে। New dispensationএ এইরূপ প্রচেষ্টাই হইয়াছিল। উহা কেবল সাহিত্যিক বাক্যবিন্যাস মাত্র। কিন্তু মহাত্মা কবীরে তাহা অনুভূতির প্রগাঢ় গভীরতায় প্রাণময়। তথাপি, আঙ্গিক বর্জনের ফলে তাহা আপামর সাধারণের প্রাণের বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই যে শুভেচ্ছার পারস্পরিক মিলনের প্রথম প্রয়াস কবীর করিয়াছিলেন তাহারই সার্থক পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণে। পথ কেবল স্বতন্ত্র।

৫ Ibid—page 549.

কবীর একটু বাছিয়া লইতে চাহেন। ভগবান মন্দিরে মসজিদে নাই—জীবের অন্তরে শিব অতিথি।

জো খোদায় মসজিদ্ বসতু হৈ
　　ঔর মুলুক কহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
　　বাহর করে কো হেরা॥*

'খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন, তবে বাহিরের মুলুক কাহার? তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম বাস করেন তবে বাহিরকে দেখে কে?'

মন না রঁগায়ে রঁগায়ে জোগী কপড়া।
আসন মারি মন্দিরমেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম-ছাড়ি পূজন লাগে পথরা॥' ইত্যাদি

'যোগী, মন না রাঙ্গিয়ে রাঙ্গালি কাপড়। আসন করে বসলি মন্দিরে, ব্রহ্মকে ছেড়ে পুজো করতে লাগলি পাথর। ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি, আর দাড়ি রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি, যোগীরে, মাথা মুড়ালি রাঙ্গালি কাপড়। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোন্, তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখবে যমদরজায়।'

অথবা

　　ন জানে সাহেব কৈসা হৈ!
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেবৈ,
　　ক্যা তেরা সাহেব বহরা হৈ।
কীড়ীকে পগ নেবর বাজে
　　সো ভি সাহেব সুনতা হৈ।
মালা ফেরী তিলক লগায়া,
　　লম্বী জটা বঢাতা হৈ।
অন্তর তেরে কুফর-কাটারী
　　যোঁ নহিঁ সাহেব মিলতা হৈ॥৮

৬, ৭, ৮, ভক্তকবীর—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস।

'জানি না তোর প্রভু কি রকম। মোল্লা হয়ে যে আজান দিস, তোর প্রভু কি কালা! ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তাও প্রভু শুনতে পান। মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস লম্বা জটা, ওরে তোর ভেতরে যে রয়েছে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে করে প্রভুকে পাওয়া যায় না।'

এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কবীর সাধককে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান, পরিচ্ছদ-আভরণ, মসজিদ-দেবালয় যে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অবান্তর তাহা বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। বাহিরে ঈশ্বর অন্বেষণা হইতে বিরত থাকিয়া সাধককে অন্তরে আহ্বান করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রে বারংবার বাহ্যপূজার প্রয়োজনীতা যে কতটুকু ও কি তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে সকল মহাপুরুষই তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কবীর প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানকে অবান্তর বলিয়া বর্জন করিতে সকলকেই নির্দেশ দিয়াছেন—এখানেই তাঁহার আপসহীন যোগীচিত্ত 'অধিকারী-ভেদে ব্যবস্থা-ভেদ'রূপ সত্যটুকু মানিয়া লয় নাই। তিনি হিন্দু পণ্ডিত ও পাড়েজীকে ও মুসলমান মোল্লা-মৌলবীকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের গোঁড়ামির জন্য। কিন্তু যে প্রথমাধিকারী উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নামগুণগান করিয়া সদা সহস্রকামনাতাড়িত চিত্তকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছে, যে নিরাকার প্রেম-স্বরূপকে ধারণা না করিতে পারিয়া মনোমত প্রতিমাতে জগৎকারণকে চিন্তা করিতে চেষ্টিত, তাহার সহজ সরল ধারণোপযোগী অবলম্বনটুকু কাড়িয়া লইলে সে কোন পথ অবলম্বনে কবীরের ন্যায় মহান্ হইতে পারিবে? কবীরের নির্দেশিত পন্থা সকলের উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে

মনে হয়, যুগপ্রয়োজনেই মহাত্মা কবীর ঐরূপ কাটিয়া ছাঁটিয়া দুইটি ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ঐক্য দেখাইয়া ধর্মদ্বয়ের অনুসরণকারীদের বিদ্বেষ প্রশমিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

কবীর যাহা বর্জনকামী, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র একটি ধর্মমত সাধনের দ্বারা এই সত্য-লাভ করিলেন না—বহু সাধনার দ্বারা গবেষকের দৃষ্টি লইয়া স্বীয় জীবনে তাহাদের প্রয়োগ ও ফলাফল হইতে এই সত্যে উপনীত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের অর্থ এই নয় যে, ধর্মসকলের অন্তর্গূঢ় সত্যকে লইয়া বাকী অংশ পরিত্যাগ করা বা দার্শনিক বিচারের দ্বারা বহুতর মত বিশেষের সার সংকলন করিয়া মত-বিশেষের প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বয় জীবন-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা কোন মতবাদ নয়, পরন্তু মানব চরিত্র-ধারাকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়া মানুষের ব্যক্তিগত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাধনমার্গে চলিতে চলিতে এককালে মানুষ সত্যলাভ করিবেই—এই দৃঢ় বিশ্বাসই সমন্বয়ের প্রাণ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সাধন-ধারাকে হেয়জ্ঞান করেন নাই, তাহা সংস্কৃত মনের নিকট যতই বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়া বোধ হউক না কেন—কেবল ঐ সকল সাধনানুষ্ঠানের মূল প্রেরণা অকৃত্রিম ঈশ্বরানুরাগ-প্রসূত হওয়া চাই। সকল ধর্মমত পরমেশ্বরের ইচ্ছাসৃষ্ট বলিয়া তিনি সকল মতাবলম্বীকে শ্রদ্ধা করিতেন ও উৎসাহ দিতেন। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সহস্র মণিদীপ্ত সহস্র প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট ভাবময় অট্টালিকা আর কবীর তাহারই একখানি প্রকোষ্ঠ। বস্তুতঃ সমগ্র পৃথিবীর ভাবরাশিকে একটি আধারে প্রকাশিত করিবার জন্যই যেন মহামায়া স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কবীর যে বেদনা লইয়া তৎকালীন মানবকে পারস্পরিক ধর্মে শ্রদ্ধালু হইতে আহ্বান জানাইলেন—তাহা যুগান্তরের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিল। যখনই ধর্মান্ধ মানব অপরের ধর্মের উপর অবিচার, বিদ্বেষ, আপনার সত্যধর্মের নামে করিতে উদ্যত হয় তখনই এই মহামানবের সকল ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি কঠিন শ্লেষবাণী সকল সম্প্রদায়ের উপর কুলিশ-কঠোরতা ধ্বনিত হইয়া ওঠে। যে সম্প্রদায়হীন ধর্মের বীজ তিনি বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা ধীরে ধীরে কাজ করিতেছে। পৃথিবীতে এমন দিন আসিবে কিনা জানি না, যেদিন সত্য ন্যায় প্রীতি ঈশ্বর-প্রেম সকল জীবনের আচরিত সত্য হইবে—ধর্ম-সম্প্রদায় সেদিন থাকিবে না। যদি কোন দিন সেই দিন আসে, তবে কবীরই সেইদিনের প্রথম না হইলেও অন্যতম আহ্বায়ক। কবীরের সম্প্রদায়হীন ধর্মমত মানবজীবনের পূর্ণাদর্শ। তাই যে দিন বাদশাহ্ সিকান্দর লোদীর সামনে উভয় ধর্মের প্রধানগণ কবীরের বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া উপস্থিত সেইদিন ঈশ্বরপ্রেমিক সাধক মিলনের পূজারী আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'হায়, ঈশ্বরের মহান সিংহাসনে তোমাদের মিলিবার স্থান হইল না—প্রেমে তোমরা মিলিত হইলে না। আর মানুষের ক্ষুদ্র সিংহাসনের নীচে বিদ্বেষে তোমরা মিলিত হইলে?—কবীর ত মিলনই চাহিয়াছিল।'

(ক্রমশঃ)

কেদার-বদ্রী দর্শন

স্বামী অমলানন্দ

জয় কেদার।

উত্তরাখণ্ডের মহাতীর্থ কেদারনাথের দুর্গম যাত্রাপথে যাত্রীদের দেখা হলে বাবা কেদারনাথের জয়ধ্বনি করেই তারা পরস্পরকে অভিবাদন করে। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, এই পথে সকলে সমান। কেউ হয়ত লক্ষপতি, কেউ পথের ভিখারী; কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ; কেউ জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষাবান সন্ন্যাসী—কেউ আবার জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—সাধারণ মানুষ—তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। এ পথে সকলেই পরম আত্মীয়—সকলেই বাবা কেদারনাথের কৃপাপ্রার্থী। "মাতা মে পার্বতীদেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ" —আর "বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ"—সকলের অন্তরে এই চিন্তা, এই ভাবনা। একের দুঃখে অপরে দুঃখী—একের আনন্দে অন্যে আনন্দিত। কেউ এসেছেন গুজরাট বা রাজপুতানা থেকে, কেউ বা দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে —কেউ বা বাংলা থেকে, আবার কেউ বা পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশ থেকে, একজনের ভাষা আর একজন বোঝেন না; কিন্তু মুখের ভাষা ছাড়াও মানুষের আর একটি ভাষা আছে, তারই পরিচয় বেশী মেলে এই পথে। এ পথে যখন পরস্পরের দেখা হয় তখন একজন পিপাসার্ত হলে অন্যে বুঝতে পারে, তার কমণ্ডলু বা ওয়াটার-পটের মুখ খুলে যায়। একজন অসুস্থ হলে অন্যজন এগিয়ে আসে—একান্ত আপনজনের মত তার সহানুভূতিভরা মন নিয়ে; ঔষধ, পথ্য, সেবা যতটুকু তার সামর্থ্য আছে তা দিয়ে নিরাময় করে তোলার জন্য।

কেদারের তীর্থপথে ভারতবর্ষকে নূতন করে দেখার সুযোগ মেলে। খণ্ড, ছিন্ন, শতসমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ষ এখানে অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, আনন্দোজ্জ্বল। এখানে প্রাদেশিকতা নেই, ভাষাসমস্যা নেই—হিমালয়ের পথে মনের উদারতা ও বিশালতা যেন স্বতই এসে হাজির হয়। উচ্চ পর্বতচূড়া ও তার চির-শুভ্রবরফরাশির উজ্জ্বল ছটায় মনের সকল সংকীর্ণতা, সকল মালিন্য ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। অল্পপরিসর পার্বত্যপথে যাত্রীরা যখন ধীরে ধীরে উঠতে থাকে তখন একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই একসঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে চলেছে! নগাধিরাজ হিমালয়কে পটভূমি করে বাংলা ও গুজরাট, হিমাচল ও অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও উড়িষ্যা, কেরল ও আসাম এক অঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা ভারতবর্ষের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য। এখানে এলে তার আভাস স্বতই এসে যায়, আর মনে হয় সে ঐক্যের ভিত্তিভূমি হল ভারতের ধর্ম-জীবন, ভারতের আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক ভারতের সনাতন শাশ্বত রূপ যা যুগযুগান্ত ধরে চিরভাস্বর হয়ে আছে তা যদি দেখতে হয়—তবে চলে আসুন হিমালয়ের পরমতীর্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে।

কিন্তু কেদারযাত্রার পথে কিছু পরিশ্রম কিছু অসুবিধা আছে। ভারতবর্ষের সমতলভূমির অন্যান্য তীর্থপথে তীর্থযাত্রীর আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা সম্ভব তা এখানে

সম্ভব নয়। পথ অনেকক্ষেত্রে বন্ধুর ও বিপজ্জনক—পাহাড়ের গায়ে মাত্র চার-পাঁচ ফুট চওড়া পথ—নীচে হাজার ফুট গর্ত। এছাড়া আছে চড়াই ও উৎরাই—আগের থেকে যদিও তা অনেক কম। অবশ্য ঘোড়া, কাণ্ডি বা ডাণ্ডি নিতে পারেন। কিন্তু হাঁটার চেয়ে এগুলি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট কিছু আছে। দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে সমতলভূমির খাদ্যসম্ভার পাওয়া দুর্লভ। বিশেষ করে বাঙ্গালীরা, পঞ্চাশ না হলেও পঞ্চব্যঞ্জনে যাদের আবাল্য অভ্যাস—তাঁরা এখানে একটি ব্যঞ্জন যদি পান তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন। ডাল ও রুটি পাওয়া যাবে। ভাতও পাওয়া যাবে—কিন্তু যে পরিমাণে এরা সবজি বা ডালে মীরচা (লঙ্কা) প্রয়োগ করে তা সমতলের অধিবাসীদের হজমশক্তির বাইরে।

কিন্তু সব অসুবিধাই আপনার সহ্য হয়ে যাবে যদি শুধু একটা কথা মনে থাকে, সেটি হল আপনি তীর্থযাত্রী -আপনি শুধু দেশ-পর্যটক নন।

কেদার ও বদ্রীদর্শনের যাঁরা অভিলাষী তাঁরা প্রথমে যান কেদারনাথে, পরে বদ্রীনাথে। হিমালয়ের দুটি গিরিশৃঙ্গে এই দুটি মহাতীর্থ। সঙ্গে রয়েছেন সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার দুটি উৎস-ধারা—মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। গঙ্গা শুধু নদী বা জলধারা নয়—ভারতবর্ষের প্রাণধারা, ভারতবর্ষের জীবনের সঙ্গে গঙ্গা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতের সভ্যতা, ভারতের ধর্ম, ভারতের ঐহিক সম্পদ সকলই পুষ্ট হয়েছে এই ভগবতী গঙ্গার কল্যাণধারায়। জীবনে-মরণে তাই গঙ্গা ভারতবাসীর অন্তরের নিধি। ভারতের মহাতীর্থগুলি একে একে আলো করে আছে গঙ্গার তীর। গঙ্গার তীরেই কাশী, গঙ্গার তীরেই প্রয়াগ। গঙ্গার তীরে সাধকের সাধনপীঠ, অবতারের লীলাস্থান। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজে, নবদ্বীপে নিমাইয়ের লীলাখেলা; বর্তমান যুগেও দেখি অবতার-বরিষ্ঠের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর আর স্বামীজীর যুগধর্ম প্রবর্তনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ গঙ্গারই তীরে। মহাদেবের জটাজাল হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরগুলির মধ্য থেকে ভারতবর্ষের এই প্রাণ-ধারা বিভিন্ন উৎসমুখে সমতলবাসী মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে; আর সেই উৎসমুখে সৃষ্ট হয়েছে হিমালয়ের মহাতীর্থগুলি। তাই দেখতে পাই মন্দাকিনীর উৎসমুখে কেদারনাথ আর অলকানন্দার উৎসমুখে বদ্রীনারায়ণ।

হৃষীকেশ থেকেই উত্তরাখণ্ডের তীর্থযাত্রা আরম্ভ হয়। হৃষীকেশের একটু আগে কনখল ও হরিদ্বার। কনখল-হরিদ্বার-হৃষীকেশ হিমালয় ও সমতলের মিলনকেন্দ্র; স্বর্গ ও মর্ত্যভূমির মিলনকেন্দ্র। কত পবিত্র আখ্যায়িকা শুনেছি এই কয়েকটি স্থান সম্বন্ধে। হরিদ্বার স্টেশনের দক্ষিণে অদূরে সতীতীর্থ কনখল। দক্ষ প্রজাপতির ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করতে মহামায়া সতীর এইখানে জন্ম। আবার দক্ষরাজার অবহেলায়—শিবহীন যজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ এই কনখলে। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সর্বভারতীয় নরনারীর একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। বার বছর অন্তর এখানে পূর্ণ কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়; ভারতের সমস্ত সাধুসমাজ এখানে বার বছর অন্তর সমবেত হন। যুগা-বতারের যুগধর্ম নরনারায়ণ-সেবার মহাকেন্দ্র কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মায়াক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী, বিল্বকেশ্বর মহাদেব, মনসা-পাহাড় ও চণ্ডীর পাহাড় প্রভৃতি দর্শনের জন্য ভক্তজনের ভীড় লেগেই আছে। মাত্র চৌদ্দ মাইল উত্তরে হৃষীকেশ—পবিত্র আবহাওয়া

চারিদিকে। সাধু-সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ—হর-হর-মহাদেব-ধ্বনি, ছত্র আর গঙ্গা মনকে আপনা-আপনি শান্ত করে আনে। নীলধারা গঙ্গা আর হিমালয় এখানে যে শোভা বিস্তার করে আছে তা সত্যিই অপূর্ব—সমতলের মানুষ এখানে এলে এক স্বর্গীয় আনন্দের আভাস পায়, তাইত এ-স্থানের নাম স্বর্গদ্বার।

কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। উনিশে মে (১৯৬০) বাবা বদ্রীবিশাল ও কেদারনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে হৃষীকেশ থেকে আমাদের বাস ছাড়লো ভোর রাতের আঁধারের মধ্যে। প্রায় দু'মাইল পরে বাস থামলো লছমন ঝোলায়;—ফাষ্ট´ গেট অর্থাৎ সকালবেলার যত বাস সব এখানে একত্র হবে। এদিকে সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। নগাধিরাজের মাথায় সোনার মুকুট। একটু আগে যে পৃথিবীতে ছিলাম তা থেকে অন্য পৃথিবীতে আমরা চলে এসেছি। আঁধার থেকে আলোতে। মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরকারী অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণাদি যা যা করণীয় তা সব সমাধা করে বাস ছাড়লো। আমাদের আগে ও পিছনে কিছু কমবেশী কুড়িখানা বাস। এদের কিছু যাবে কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশী পর্যন্ত—যেমন আমাদেরটি, আর কিছু যাবে যোশীমঠ—বদ্রীনাথের পথে। প্রতি বাসে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন করে যাত্রী। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গঙ্গার তীরে তীরে আঁকাবাঁকা সরু পথে সারিবদ্ধ বাসগুলি ছুটেছে। একদিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পাইনের বন চলে গেছে অনেক দূর; কোথাও বা পটে আঁকা ছবির মত দু'চারটা কুটীর ও মন্দির। মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে—বাসগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে—সীমিত সময়ে নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। তার আগে কারুর থামার সময় নেই এবং উপায়ও নেই। থামতে হলে সবাইকে একসঙ্গে থামতে হবে, ছুটতে হলে সকলকে একসঙ্গে ছুটতে হবে।

গঙ্গার অপর তীর দিয়ে দু'চারজন পথিক পায়ে হেঁটে চলেছেন। এই পায়ে হাঁটা পথে কয়েক বছর আগেও সকল তীর্থযাত্রী দলে দলে হেঁটে চলতেন। সেদিনকার পথশ্রম, ব্যাধির প্রকোপ, বন্যজন্তু বা বিষধর সর্পের আক্রমণ, খাওয়া-থাকার শত-অসুবিধা সবকিছু তুচ্ছ করে তীর্থযাত্রী এগিয়ে চলতেন পরম ঈপ্সিতের সন্ধানে। এ যাত্রা কবে আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাস সে কথা বলতে অক্ষম। দ্বাপর ও ত্রেতার পদধ্বনি এই পথে একসঙ্গে মিশে আছে—দ্বাপরের মহাভারত ও ত্রেতার রামায়ণ হিমালয়ের পথে পথে তার স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে প্রভূত পরিমাণে। হরিদ্বারের ভীমগোড়া, বদ্রীনাথের পথে বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, কর্ণপ্রয়াগ নামগুলি মহাভারতীয় যুগের অমর স্বাক্ষর—আর হৃষীকেশে ভরতজীর মন্দির, মুনিকী রেতীর শত্রুঘ্নজীর মন্দির, লছমন-ঝোলার লক্ষ্মণমন্দির, কেদারের পথে রামপুর, রামওয়াড়া, বদ্রীনাথের নিকটবর্তী হনুমানচটি—ত্রেতাযুগের কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়। আর সকল যুগের সকল মতের সাধক এসেছেন এই মহাতীর্থে। আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, গুরু নানক, কবীর, মহাবীর, দীপঙ্কর, তুকারাম; কত মহামানবের পাদস্পর্শে এ পথের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র হয়ে আছে।

এই সকল ভাবতে ভাবতে আমরা প্রায় ৪৪ মাইল দূরে দেবপ্রয়াগে এসে গেছি। অলকানন্দা এখানে মিলিত হয়েছেন গঙ্গার সঙ্গে।

পথে এরকম আরও চারটি সঙ্গম বা প্রয়াগ পাব—রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। কথিত আছে, দেবপ্রয়াগে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃতর্পণ করেছিলেন। গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির-সহ ঘরবাড়ীগুলি অপূর্ব শোভা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বাসগুলি বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। তাই যাত্রীদের এই সঙ্গমস্থলে যাওয়ার সুযোগ নেই। সামান্য কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার বাসগুলি যাত্রা শুরু করে। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল শ্রীনগর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারলাম শ্রীনগর সত্যিই শ্রীসম্পন্ন। কত রকমের তরি-তরকারি—বাগান, গমের ক্ষেত, আমের বাগান, রাস্তার ধারে ধারে সাজানো রয়েছে। ইংরেজরা আসার পূর্বে শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ও অতি সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে শহরটির খুব প্রাধান্য রয়েছে। এখানকার কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও তৎসংলগ্ন কমলেশ্বর মঠ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর থেকে আঠারো মাইল দূরে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ শুধু দুটি নদী অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম নয়, দুটি পথেরও সঙ্গম। একটি গেছে কেদার, মন্দাকিনীর তীরে তীরে—আর একটি বদ্রীনাথ, অলকানন্দার তীরে তীরে। এখানে বাস থামলো অনেকক্ষণ, যাত্রীরা মধ্যাহ্নের স্নান ও আহার করবেন। আমরা উভয় নদীর মিলনস্থলে স্বচ্ছ ও শীতল জলধারায় স্নান করলাম। স্নানের পর আহার। ধীরে ধীরে আমরা যে সমতল থেকে দূরে চলে যাচ্ছি তার পরিচয় পেলাম আহার্যবস্তুর স্বল্পতায় আর দামের দিক দিয়ে তো বটেই। 'চাওল' (ভাত), ডাল, একপ্রস্থ সবজি দিয়ে আমরা মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করলাম। তারপর বাস ছাড়লো ছুটোয়। একটি বড় সেতু পার হয়ে কেদারের বাসগুলি গুপ্তকাশীর পথ ধরে এবং অন্যান্যগুলি চলে যায় বদ্রীনাথের পথে যোশীমঠ। আমরা যে সেতুটি পার হলাম তার গঠনকৌশল অনেকটা লছমনঝোলার মতো। এতক্ষণ আমরা চলছিলাম পূর্বমুখে—এখন চলেছি উত্তরমুখে। ঐ পথে অনেকগুলি সম্পন্ন চটি আছে—তার মধ্যে অগস্ত্যমুনি ও কুণ্ডা চটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চব্বিশ মাইল এসে আমাদের গাড়ী গুপ্তকাশীতে যখন থামলো তখন ঘড়িতে চারটা বেজে গেছে।

আমরা মালপত্র নামাতে ব্যস্ত। এমন সময় কেদারনাথের পাণ্ডা মহাদেবপ্রসাদের এক ভ্রাতা এসে আমাদের কুশল প্রশ্ন করলেন—বাংলায়। তাঁর একজন চেনা কুলি রামলাল মালগুলি নিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো বাবা কালীকম্বলীর ছত্রে। মনে মনে সেই মহান-হৃদয় মহাপুরুষকে প্রণতি জানালাম—যিনি কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী হয়েও তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য হিমালয়ের দুর্গমতর তীর্থে তীর্থে ধর্মশালা স্থাপন করে গেছেন। যাত্রীর অসম্ভব ভীড়—তা সত্ত্বেও আমরা দোতলায় একটি হলবারান্দায়—স্থান পেয়ে গেলাম। একটু পরেই ঘর বারান্দা ভর্তি হয়ে গেল—ছত্র যেন উপছিয়ে পড়ছে—ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে প্রাঙ্গণে। ছত্রের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশ, আকাশের তলায় শতাধিক যাত্রী।

পরের দিন সূর্যগ্রহণ। আমরা গুপ্তকাশীতে এই দিনটি থেকে গেলাম। এখানে বিশ্বনাথে ও অর্ধনারীশ্বরের মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য কালীকম্বলীর ছত্রের কাছেই এই মন্দির মন্দিরের চত্বরের মধ্যে একটি কুণ্ড আছে—দুটি জলধারা তাতে অবিরাম পড়ছে। পাণ্ডাজী বললেন এই জল আসছে গঙ্গোত্রী এব

যমুনোত্রী থেকে। কুণ্ডে স্নান করে যাত্রীরা বিশ্বনাথ দর্শন করেন। মন্দিরের পরিবেশটি অতি সুন্দর। প্রবাদ আছে, পাণ্ডবেরা এখানে এসে বিশ্বনাথের পূজা অর্চনা করেছিলেন।

কেদারের পথে গুপ্তকাশী অতি প্রাচীন কাল থেকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাস আসার পর সে প্রাধান্য আরও বেড়ে গেছে। এখন হাঁটাপথ এইখানেই শুরু। কাজেই যাত্রীদের বিশ্রাম ও প্রস্তুতির জন্য যা যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা এখানে সবই করতে হয়। কুলির ব্যবস্থা আগে হ'ত হৃষীকেশে বা দেবপ্রয়াগে; এখন গুপ্তকাশীতেই সে ব্যবস্থা। কুলির এজেন্টেস্ আছে—তারাই ব্যবস্থা করে দেয়। কেজি হিসাবে মজুরি—প্রতি কেজিতে সওয়া টাকা। এছাড়া যাদের কাণ্ডি, ডাণ্ডি বা ঘোড়ার দরকার তাদেরও ঐগুলি সংগ্রহ করতে হয় এইখানে। অবশ্য মাঝপথে বিশেষতঃ গৌরীকুণ্ড বা রামবাড়াতেও পাওয়া যায়। তবে সেখানে দাম একটু বেশী। যাঁদের হাঁটার অসুবিধে আছে তাঁরাই কাণ্ডি ইত্যাদি করেন। কাণ্ডি এক রকম বেতের চেয়ার—একজন নিয়ে যায়। আর ডাণ্ডি হল এক রকম খোলা হাল্কা পাল্কীর মত; সাধারণতঃ ৪ জন কুলি লাগে। কিন্তু যাত্রী বা যাত্রিণী যদি একটু স্থূলবপু হন এবং সাধারণতঃ হয়েই থাকেন—তখন ৬ জন কুলি অবশ্যই লাগে।

মন্দাকিনীর অপর পারে অন্য একটি গিরি-চূড়ায় উখীমঠ। গুপ্তকাশী থেকে ছবির মত দেখায়। বাণ রাজার কন্যা উষার নামানুসারে উখীমঠের নাম। এখানে কেদারের পূজারী (রাওল) বাস করেন। এখান থেকেই শীতকালে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা হয়।

শুক্রবার ২০শে মে গেল সূর্যগ্রহণ। আমরা ২১শে শনিবার হাঁটাপথে রওনা হলাম। আমরা দলে ছিলাম ৫ জন; রেঙ্গুন সোসাইটির স্বামী স্বানন্দ, স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ, কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের স্বামী স্কন্দানন্দ ও লেখক এবং কোয়েম্বাটুর রামকৃষ্ণমিশন রুর‍্যাল কলেজের অধ্যাপক পি. রঙ্গস্বামী। অধ্যাপক রঙ্গস্বামী কিছুদিন আগে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। খুব ভোর ভোর আমরা রওনা হলাম। ভোরের হিমেল বাতাস বেশ লাগছে; রাস্তাও ভাল। দু-মাইল দূরে নালা-চটি পার হয়ে গেলাম। অদূরে একটি ছোট মন্দির ও তাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট গ্রাম—কিন্তু কি সুন্দর! আমরা নারায়ণকোটি চটি পার হলাম। তারপর উৎরাই—অনেকটা নামার পর ভিয়াঙ্গ চটি; দোকানের সামনে শতরঞ্চি পাতা। না, কোন উৎসব বা কোন সভার ব্যাপার নয়। যাত্রীরা চা খাবেন। শতরঞ্চিগুলি আমাদের সাদর আহ্বান জানাল; আমরা এখানে চা খেয়ে নিলাম। কিন্তু তারপর চড়াই। যতটা নেমে-ছিলাম ততটা উঠতেই হবে। কিন্তু মনে হল তার থেকে অনেক বেশী উঠছি। উঠছি ত উঠছিই—পাহাড়ী পথে চড়াই-এর এই প্রথম অভিজ্ঞতা একটু অপ্রত্যাশিত। গাইড বুক বা ভ্রমণকাহিনী কোথাও এই ভিয়াঙ্গের চড়াইয়ের কথা লেখেনি। মনে মনে তখনই ভাবলাম যদি সুযোগ পাই তবে এই ভিয়াঙ্গের চড়াইএর কথা সকলকে সবিস্তারে জানাব। ফিরতি মুখে কয়েকজন বৃদ্ধা এই ভিয়াঙ্গেই জিজ্ঞাসা কর-ছিলেন—কেদারের যে খাড়া চড়াইএর কথা শুনেছি, সে কি বাবা এইখানে? না, এর থেকেও খাড়া চড়াই আছে? উত্তর দিয়েছিলাম, বুড়ীমা ভয় পাবেন না—ধীরে ধীরে যান। বাবা কেদারনাথের নামে সব ভয় দূর হয়ে যাবে। ভিয়াঙ্গের পর এলাম মৈখণ্ডাতে। মহামায়া

এখানে মহিষাসুরকে খণ্ডিত করেছিলেন—তাই এ স্থানের নাম মৈথণ্ডা। ছোট্ট মন্দিরে মহিষমর্দিনীর মূর্তি। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। নীচের চাষের খেত ও গ্রামের কুটিরগুলি অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা এগিয়ে চলেছি উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে কখনও গ্রামের কুটিরের পাশ দিয়ে কখনও গ্রামের ক্ষেতের পাশ দিয়ে। হঠাৎ কয়েকটি ছোট ছেলে ও মেয়ে ঘিরে দাঁড়াল—এ শেঠজি, সুই দে, তাগা দে। সুচ ও সুতো চাই। প্রস্তুত ছিলাম। সুচ ও সুতো পকেটেই ছিল, সেগুলি তাদের একে একে দিয়ে দিলাম। কী তৃপ্তি তাদের চোখে মুখে! অবাক হলাম তাদের সুশ্রী চেহারা দেখে। মহামায়ার লীলানিকেতন এই হিমালয়ের সবই আশ্চর্য! কালো ছেঁড়া কম্বলের জামাকাপড়ের বদলে উপযুক্ত কাপড়জামা যদি পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ গরীব ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে দু-হাতওয়ালা মা-দুর্গা অনেকগুলি বেরিয়ে পড়বে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈষ্ণব সাধনা*

স্বামী নির্বেদানন্দ

তন্ত্রমতের সব সাধনা শেষ করতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। আমরা দেখেছি, এই সাধনার ফলে বহুবিধ ঈশ্বরীয় দর্শন ও উপলব্ধির সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন, যার সামান্য অংশমাত্র পেলেও সাধারণ লোকের মন পরিতৃপ্তিতে ভরে যায়। ভগবদ্-উপলব্ধিলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তবু একবিন্দুও কমল না তাঁর। আধ্যাত্মিক সত্য ও দিব্যানন্দের লক্ষ্যে পৌঁছে তা করায়ত্ত করার জন্য ছোট বড় যত রকমের পথ আছে, তার সবগুলি দিয়েই চলে সেখানে পৌঁছুবার জন্য এই নির্ভীক, অক্লান্ত সত্যান্বেষীটি অস্থির হয়ে উঠলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু ভক্তেরা ভগবানকে যে সব বিভিন্ন রূপের ও ভাবের মাধ্যমে পূজা ও ধ্যান করে থাকে, তার সবগুলিই উপলব্ধি করে পরিতৃপ্ত হবার জন্য হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধা তাঁকে উত্তেজিত করে চলেছিল।

তন্ত্রমতে সাধনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব মতের রাজপথ দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছুবার বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে রঘুবীরের (বিষ্ণুর এক অবতার) নিত্যসেবা ছিল; সেজন্য ভগবদারাধনার এই পদ্ধতিটির প্রতি শৈশবেই তাঁর অনুরাগ জন্মে। তাছাড়া তান্ত্রিক সাধিকা ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর গুরু ভৈরবী অন্তরে অন্তরে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভৈরবীর ইষ্টও ছিলেন রঘুবীর। রঘুবীরশিলা তাঁর সঙ্গেই থাকত। প্রতিদিন প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁর পূজা করতেন তিনি। আর, যে মাতৃভাব নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপাল জ্ঞান করে তাঁর প্রতি তদনুরূপ আচরণ করতেন, তা-ও যথার্থ বৈষ্ণব

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত।

ভাবের অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়, এই সব নানা কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবমত অবলম্বনে সাধন-পথে চলতে চেয়েছিলেন।

বৈষ্ণবমত হল শুধু ভক্তি বা ভালবাসা নিয়ে সাধন করার পথ। এ পথে ভক্তিশাস্ত্রের বিধানমত ভগবানের প্রতি অতি গভীর ভালবাসার পুষ্টিসাধনের মাধ্যমে ভক্তকে চিত্ত শুদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়; তারপর এ পথের লক্ষ্যে, শুদ্ধ পরমানন্দময় ঈশ্বরদর্শনে ও ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়ে থাকতে বলা হয় তাকে। এ পথের সাধকরা ব্যক্তিগত অহং-বোধের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে চান না; জ্ঞানমার্গীরা যাকে মুক্তি বলেন এবং যাকে সর্ববিধ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিপূর্ণতা বলে ভাবেন, ব্যক্তিগত অহং-বোধকে নিঃশেষে মুছে ফেলে সেই নিরাকার স্বরূপের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চান না তাঁরা।

বৈষ্ণবমতে পরাভক্তির বা ভগবানের প্রতি চরম ভালবাসার পরিসমাপ্তি হল পরাভক্তিতেই। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই ভালবাসার উৎস বিদ্যমান; সাধনা মানে হল চিত্তশুদ্ধি সহায়ে এই উৎস-মুখটি শুধু খুলে দেওয়া, আর ইন্দ্রিয়-রাজ্যের বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে সে প্রেম-ধারার মোড় ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। শিক্ষানবীশকে সেজন্য নিয়মিতভাবে বিধিমত পূজা, স্তব, প্রার্থনা, মন্ত্রজপ ও সাকার ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান সহায়ে ভগবানলাভের জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে চিত্ত শুদ্ধ করতে হয়। বৈষ্ণবদের দুটি প্রধান শাখার জনপ্রিয় আদর্শ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র।

ভগবৎপ্রেমের পরিপুষ্টির জন্য ভগবানের ভেতর কিছুটা মানুষভাব আরোপ করে, এবং ভক্তকে দৈবী-ভাবাপন্ন করে তুলে বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি সাধনপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। বৈষ্ণবধর্মমতে ইষ্টকে নিজের মাতা বা পিতা, প্রভু, সখা, সন্তান বা প্রেমাস্পদ বলে ভাবতে হয়। এই ভাবগুলি যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব নামে পরিচিত। আন্তরিকতার সহিত অনুষ্ঠিত হলে এগুলির প্রত্যেকটিই ভক্তকে শান্তিধামে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

আমরা দেখে এসেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-শিক্ষা-বিহীন মন মা-কালীকে মাতৃজ্ঞানে ও শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ প্রভুজ্ঞানে উপাসনা করে ইতি-পূর্বেই প্রথম দুটি ভাব অবলম্বনে বৈষ্ণবধর্মোক্ত উচ্চাবস্থা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে সখ্য-ভাব সাধনেও তিনি পূর্ণতা লাভ করেন। এখন বৈষ্ণবভাবসাধনার দুটিমাত্র অঙ্গের সাধন তাঁর বাকী ছিল—বাৎসল্যভাবের ও মধুরভাবের। তান্ত্রিক সাধনা শেষ হবার অব্যবহিত পরেই এদুটি ভাবের প্রথমটি অবলম্বনে সাধন করার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন তিনি। তাঁর প্রতি ভৈরবীর মাতৃবৎ আচরণই বোধ হয় এর কারণ।

প্রায় এই সময়েই বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ জটাধারী নামে একজন পরিব্রাজক সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, নিজ সন্তানজ্ঞানে তাঁর সেবা করতেন। জটাধারীর সঙ্গে রামলালার (বালক রামচন্দ্রের) ধাতুনির্মিত একটি মূর্তি থাকত; মূর্তিটিকে তিনি প্রাণ দিয়ে আদর করতেন, স্নেহভরে খাওয়াতেন, তার সঙ্গে খেলা করতেন, এমনকি রাত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে শয়ন করতেন। দীর্ঘদিন এভাবে সেবা-অভ্যাসের ফলে নিজ অধ্যাত্মসাধনপথের শেষে এসে পৌঁছেছিলেন তিনি; এখন খালি চোখেই সর্বক্ষণ এই দেবশিশুর দর্শন পেয়ে পরমানন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। জীবন্ত

রামলালা আদুরে ছেলের মত কখনো তাঁর কাছ ছাড়া হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতের পবিত্র তীর্থে তীর্থে পর্যটন করে বেড়াচ্ছিলেন; এই পর্যটনের মুখেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে থেমে কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে যান। জটাধারী তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভবের কথা কখনো কাউকে বলেন নাই, এবং জীবনের অতি মহার্ঘ গোপন সম্পদজ্ঞানে হৃদয়ের মণি-কোঠায় তা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে তাঁর হৃদয়-কন্দর দেখতে পেলেন। তাঁর চোখের সামনে রামলালা ও তার ভক্তপিতার দিব্য লীলার অভিনয় চলতে লাগল, আর সে অভিনয়ের ভাগ্যবান দর্শক হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রাম-লালার কথাবার্তা, চালচলন, জটাধারীর সঙ্গে তার বালকের মত দুষ্টুমি, এ সবই তিনি প্রতি-দিন লক্ষ্য করতে লাগলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ টের পেলেন, দেব-শিশুটি তাঁর প্রতি দিনে দিনে অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছে, এমনকি জটাধারীর সঙ্গে থাকার চেয়েও তাঁর কাছে থাকতেই তার ভাল লাগছে বেশী।

ফলে রামলালার ওপর তাঁর পিতৃস্নেহ বাঁধনহারা বন্যার মত ভেঙ্গে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাকে আদর করতে, স্নান করাতে, খাওয়াতে ও তার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে দিলেন। এসব এত সহজ হয়ে গিয়েছিল যে, দুষ্টুমি করলে তাকে শাসন করতেও বাধত না তাঁর। অবশ্য এরূপ কঠোর আচরণের পরক্ষণেই অনুতাপে তাঁর বুক ফেটে যেত, আর হৃদয় ভরে উঠত স্নেহের দুলালের প্রতি অনুকম্পায়।

এভাবে, বৈষ্ণব সাধনার যে উচ্চভূমিতে ক্বচিৎ কখনো কেউ উঠতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রকে পুত্ররূপে পেয়ে সেই উচ্চভূমিতে অবস্থান করে তিনি আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলে গিয়ে তাঁকে নিজের আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, অসহায় বালক বলে ভাবতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা বাস্তবিকই অতি বিরল। তাঁদের ভেতর আবার হাজারে একজন পারেন এধরনের উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী হতে। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় পূর্ব হতেই ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রেমে পূর্ণ হয়ে ছিল; বাৎসল্যভাবের চরমে উঠতে এখন শুধু তাঁকে পথটা একটু বদলে নিতে হয়েছিল। রামলালা তাঁর এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তার মুহূর্তের বিচ্ছেদও অসহ্য হয়ে উঠত তাঁর কাছে। আবার রামলালাও তাঁকে এত ভালবাসত যে কখন তাঁর সঙ্গ ছেড়ে থাকতেই চাইত না। কিছুকাল পরে জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে মনস্থ করলেন। চলে যাবার মুখে রামলালা বায়না ধরে বসল, সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে যাবে। জটাধারী ইতিমধ্যে দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, এবং প্রাণে প্রাণে বুঝেছিলেন যে বাহ্যপূজার প্রয়োজন তাঁর মিটে গেছে। সেজন্য রামলালার এই ইচ্ছা পূরণ করতে একটুও কষ্ট হল না তাঁর। এতদিন ধরে যাঁর জীবন্ত বিগ্রহকে তিনি বুকে ধরে ফিরেছেন, বিদায়কালে সেই রামলালার ধাতুমূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণকে হাসিমুখে দিয়ে গেলেন তিনি।

কিছুকাল পরে অবশ্য মধুরভাব প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে তাঁর সারা মন দখল করে বসল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহের দুর্বিষহ জ্বালায় বিদীর্ণহৃদয়া পুরাণবর্ণিতা গোপীদেরই একজন বলে নিজেকে ভাবতে লাগলেন তিনি। তাঁর হাবভাব সব গোপীদের মতই হয়ে উঠল। কথাবার্তা, বেশভূষা, আচরণ ও চলাফেরায় প্রিয়তমের ঔদাসীন্যে অতিবিধুরা সতী যুবতীর মতই হয়ে উঠলেন তিনি; দিব্যধামবিহারী

প্রেমাস্পদের জন্য উত্তাল প্রেমে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গোপীদের সঙ্গে যেভাবে খেলতেন, তাঁর সঙ্গেও সেই চিরন্তন খেলাই খেলতে লাগলেন—তাঁর মন হরণ করে নিয়ে তাঁকে পাগল করে তুলে, আর নিজে সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দূরে দূরে থেকে এই সর্বগ্রাসী ভাবোচ্ছ্বাসের আগুনে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা তাঁকে মর্মাহত করল, গোপীদের মতই হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিরহের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠল, এবং বঞ্চিত প্রেমিকের উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি; আহারনিদ্রা ত্যাগ করলেন, বহির্জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আকুল আবেগে অধীর হয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে উন্মাদের মত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তাঁর চতুর প্রেমিককে। তীব্র মানসিক বেদনায় ও অত্যধিক দৈহিক কৃচ্ছ্রতায় আবার তাঁর শারীরিক যন্ত্রণাগুলি ফিরে এল। এই নিয়ে তিনবার এরকম হল। সারা শরীর জ্বলে যাওয়া, রোমকূপ দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়া, এবং ভাবসমাধিকালে দেহের প্রায় সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যাওয়া, সবই আবার দেখা দিল এবং শরীরের সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এনে ফেলল তাঁকে। গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধাই মহাভাবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের রক্তমাংসের শরীরে এই সময় সেই প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার শাস্ত্রবর্ণিত পরিপূর্ণ রূপটি ফুটে উঠেছিল এভাবে।

কৃষ্ণপ্রেমের ব্যর্থতার এই নিদারুণ অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে কয়েকমাস চলার পর অবশ্য একদিন তিনি ধন্য হলেন মধুরভাবের অনুপম আদর্শ এবং বৃন্দাবনের গোপীগণশ্রেষ্ঠা যথার্থই ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শনলাভে। দেহের স্বর্ণকান্তি এবং রূপলাবণ্যের বিভা ছড়িয়ে শ্রীরাধা একদিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এসে তাঁর শরীরে মিশে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। এই দর্শনের পর বহুদিন যাবৎ শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ রয়ে গিয়েছিল। মহাভাবের শারীরিক ও মানসিক সব লক্ষণগুলিই তাঁর ভেতর ফুটে উঠত এই সময়; দেখে ভৈরবী, বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরে তাঁর প্রেমের এই মর্মন্তুদ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটল। একটা পর্দা যেন হঠাৎ সরে গেল, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনোহারী মাধুর্য নিয়ে দেখা দিলেন, কাছে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে মিশে গেলেন। তাঁর উন্মত্ত ব্যাকুলতা এতে শান্ত হল, দিব্য আনন্দে হৃদয় ভরপুর হয়ে গেল। এই দর্শনের আনন্দ-শিহরণ তিন মাসকাল তাঁকে বিহ্বল করে রেখেছিল। এ তিনমাস বাহ্যজ্ঞান থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র সর্বক্ষণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন।

রাধাকান্তের মন্দিরের দালানে বসে ভাগবত-পাঠ শ্রবণকালে একদিন তাঁর বিশেষ অর্থপূর্ণ একটি দর্শন লাভ হয়; ভাবাবস্থায় দেখেন, জ্যোতির্ময়বপু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁর পাদপদ্ম হতে একটি জ্যোতির রেখা নির্গত হয়ে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করল, পরে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে ভাগবত-ভক্ত-ভগবান—এই ত্রয়ীকে কিছুকাল সংযুক্ত করে রেখে দিল। এই দর্শনের ফলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ভগবান ভক্ত ও ভাগবত এ তিনটি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক বলে মনে হলেও মূলতঃ এক—তিনে এক, একে তিন।

যেখানে পৌঁছুলে ভক্ত ভগবানকে প্রেমাস্পদ রূপে পেয়ে তাঁর সঙ্গে চিরতরে মিলিত হবার অপূর্ব উল্লাসের অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সেই শেষ ও দুরধিগম্য শিখরে গিয়ে উঠেছিলেন।

সমালোচনা

যুগনায়ক বিবেকানন্দ [প্রথম খণ্ড : প্রস্তুতি] : স্বামী গম্ভীরানন্দ। প্রকাশক : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৪৬৬+৮; মূল্য সাত টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে মনুষ্যত্বের নবজাগরণ ঘটেছিল। তাই সে যুগের মহামানবদের নিয়ে সেকালে ও একালে জীবনীসাহিত্যের শাখাটি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, সংগীত বা শিল্পের মূল উৎস মানব-জীবনরহস্য। সে রহস্যের অনুসন্ধানে একাধারে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণ—উভয়ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী, শ্রদ্ধাবান অথচ নিরপেক্ষ একটি মনের প্রয়োজন। অবশ্য, মহত্ত্বের অনুধ্যানই জীবনী-সাহিত্যের আদিপ্রেরণা। তবু, নির্বিশেষ আত্মসমর্পণের চেয়ে বিচারমূলক ভক্তিই জীবনীর আদর্শ।

রামমোহন, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি দিকপালদের জীবনীরচনায় বিশেষ গোষ্ঠী বা মতবাদের প্রভাবে অতিরঞ্জন এবং ভ্রান্তিবিলাস—দু'য়েরই উদাহরণ মেলে। অনেক ক্ষেত্রেই জীবনীলেখক তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শের সীমায় মহিমান্বিতদের আবদ্ধ করতে গিয়ে আলোচ্য জীবনের মূল তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলেন—এমন ঘটনাও বিরল নয়। তাছাড়া কুন্তীলকবৃত্তির প্রেরণায় অপরাপর লেখকের উপাদান ও মননের অননুমোদিত ব্যবহারের দ্বারা নিছক ব্যবসায়গত কারণে সুলভ জীবনীলেখার ঝোঁকও ইদানীং যথেষ্টই চোখে পড়ে। হয়তো, বর্তমান জাতীয় জীবনে বিগত শতাব্দীর মতো সূর্যসঙ্কাশ ব্যক্তিত্বের অভাবই আমাদের জীবনীসাহিত্যের সাম্প্রতিক দুর্দশার কারণ।

তবু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী দু'একটি জীবনীগ্রন্থ যথার্থ জীবনীসাহিত্যের আদর্শ নিয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়। প্রেরণা ও পরিশ্রম, শ্রদ্ধা ও সাহিত্যবোধ, আরাধ্য ও আরাধকের মিলিত তন্ময়তায় সে জাতীয় জীবনী পাঠককে আদ্যন্ত নিবিষ্ট রেখেও এক মহত্তর অতৃপ্তির আস্বাদ রেখে যায়, বিপুল বিশ্ব-জীবনের সিংহদুয়ারে দাঁড়িয়ে অনন্তের আহ্বান নিমেষে অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়। বিবেকানন্দ-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব-অবলম্বনে স্বামী গম্ভীরা-নন্দজীর যুগনায়ক বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড) তেমনি এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এই খণ্ডে স্বামীজীর প্রথমবার আমেরিকায় পদার্পণ (২৫শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৮৯৩) অবধি জীবনকাহিনী বিধৃত।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এদেশে ও বিদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার যে পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে, তার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে বিবেকানন্দ-জীবনের উপাদান-সংগ্রহ। এখনও বিবেকানন্দ-জীবনের অনেক উপাদানই অনাবিষ্কৃত। শ্রীমতী লুই বার্কের Swami Vivekananda in America: New Discoveries গ্রন্থটির প্রেরণায় দেশবিদেশের পুরানো সংবাদপত্রে ছড়ানো বিবেকানন্দ-জীবনের নানা উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরো তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী এ পর্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় নূতন ও পুরাতন তথ্যের সমন্বয়ে বিবেকানন্দ-জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়টি সামগ্রিকভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ প্রয়াসের শুভাবস্থ

দেখে পরিণতির নিঃসংশয় সার্থকতার কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। তবু এই প্রথম খণ্ডটি এককভাবেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ্যতম গ্রন্থ।

ইংরেজী ও বাংলায় বিবেকানন্দের বেশ কয়েকটি জীবনী থাকা সত্ত্বেও ইতস্তত ছড়ানো বিবেকানন্দ-চিন্তার সব কয়টি উপাদানকে সংহত করে তাঁর মধ্যে যুগচিত্তের অভিপ্রায়কে উপলব্ধির প্রচেষ্টায় 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' বিবেকানন্দ-সাহিত্যে পথিকৃৎ। ব্যাপ্তি ও গভীরতার আশ্চর্য সমাবেশে এবং স্বচ্ছ ঋজু ওজোদীপ্ত ভাষাভঙ্গীর অমোঘ আকর্ষণে বিবেকানন্দের বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্বের স্পর্শ এ গ্রন্থের সর্বত্র সঞ্চারিত।

'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র প্রস্তুতিপর্ব আমাদের প্রত্যাশাকে অপরিমিতভাবে বাড়িয়ে তুলেছে বলেই পরবর্তী খণ্ড দু'টি সম্বন্ধে পূজনীয় লেখকের কাছে আমরা পাঠকসমাজের পক্ষ থেকে এ-পর্যন্ত সাধারণ আলোচনায় উপেক্ষিত কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোকপাত আশা করি—(ক) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে, বিশেষভাবে বেদান্তচিন্তার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মৌলিক দান; (খ) ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লববাদীদের জীবনে ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব; (গ) বর্তমান পৃথিবীর জড়বাদী ও সাম্যবাদী জীবনজিজ্ঞাসার সমাধানে যুগনায়ক বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর আলোকে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।

হয়তো এ সবই গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিকল্পনায় নিহিত। তবু আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের সংশয় ও জিজ্ঞাসার সমাধানে উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আলোচ্য জীবনীর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে— এই ধারণায় আমাদের বিনীত নিবেদন উপস্থাপিত।

এমন একটি মনীষাদীপ্ত শ্রদ্ধাসমুজ্জ্বল প্রেরণার উৎসস্বরূপ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র প্রকাশক আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন। **—প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ): স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত। প্রকাশক: অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রোড, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ। পৃষ্ঠা ১৬৩+৬; মূল্য ৩৲।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জীবনী এবং ভগবৎ-প্রসঙ্গে যে-সব কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা লইয়াই পুস্তকটি রচিত। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামী মাধবানন্দজী একস্থানে লিখিয়াছেন—'তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুবাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য। তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও দেবজীবন আমাদের স্বর্গীয় সম্পদ। এক অপার্থিবভাবে তিনি সর্বদা অভিভূত থাকিতেন, ঐহিক কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সাংসারিকতা তাঁহার অলৌকিক জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।' এইসব মহাপুরুষদের কথা সাধক-জীবনের বিশেষ অবলম্বন।

আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, সে-সকল বিষয় আলোচ্য পুস্তকে এমন সুন্দরভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে, সাধকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন গ্রন্থখানি নিত্যসঙ্গী করা প্রয়োজন। পুস্তকের অধিকাংশ উপাদান পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

মহারাজের সেবকগণের ও কয়েকজন ভক্তের অনুলিপি হইতে সংগৃহীত।

গ্রন্থারম্ভে স্বামী শংকরানন্দজী-লিখিত ভূমিকাটি পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনের উপর বিমল আলোকসম্পাত করিয়াছে। গ্রন্থখানির সুমুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ—অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্তী। প্রকাশক : সি. ভট্টাচার্য, ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬, পৃষ্ঠা ১৩৮ ; মূল্য ৪৲।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর উপরোক্ত পুস্তকটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের তৃতীয় পত্রের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী রচিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী এই পুস্তকের স্বল্প পরিসরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিক সঙ্ঘসৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠন, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার বিভিন্ন বিভাগের পরিচয়, নানা আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির সুষ্ঠু আলোচনা ছাত্র-গণকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে যাহাতে সহায়তা করে সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকটি রচিত। লেখক তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। পুস্তকটি প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্যভাবে লিখিত। বিষয়গত জটিলতা বা technicality-র বাধা কোথাও ছাত্রদিগের অসুবিধার সৃষ্টি করে না। পরিশিষ্ট অংশে কাশ্মীর সমস্যা, বার্লিন অবরোধ, কোরিয়া যুদ্ধ ইত্যাদির পর্যালোচনা পুস্তকটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। সরল ভাষা ও ভঙ্গীতে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করিবার গুণে পুস্তকটি কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের নহে, সাধারণ পাঠকের নিকটও সমাদরলাভের যোগ্য। **—প্রেমবল্লভ সেন**

গীতার আলোকে শঙ্কর-দর্শন—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরণজিৎ সেন, রামকৃষ্ণ পুস্তক ভাণ্ডার, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১২৮ ; মূল্য ২.৫০ টাকা।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, গ্রন্থকার আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। গীতাই উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের মর্মবাণী, গ্রন্থকারের এই মত সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যের গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকার 'তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থ-সারসংগ্রহভূতম্' বাক্যটি গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : অদ্বয়জ্ঞান, প্রস্থানত্রয়, স্মৃতিপ্রস্থান গীতা, কর্মপ্রবৃত্তির হেতু, জন্মান্তর, অমৃতত্ব। গ্রন্থখানি সুধীসমাজে আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উপাসনা—ব্রহ্মচারী হরিপদ চক্রবর্তী (গীতারত্ন)। প্রকাশক—কালিকানন্দ বেদান্ত আশ্রম, ১২১ নিউ টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩। পৃষ্ঠা ১০০ ; মূল্য ১৲।

সাধক-মনের ভাবের বিভিন্নতার জন্য উপাসনা-পদ্ধতিও বিভিন্ন। উপাসনা বিভিন্ন হইলেও উপাস্য যে একই ঈশ্বর, ইহা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দেখানো হইয়াছে। 'ওঁকার অবলম্বনে আত্মদর্শন' পরিচ্ছেদটিতে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি সুন্দর স্তোত্র ও সঙ্গীত পুস্তকখানির অলঙ্কারস্বরূপ।

ধর্মরহস্য—ব্রহ্মচারী হরিপদ চক্রবর্তী (গীতারত্ন)। প্রকাশক—কালিকানন্দ আশ্রম, ১২১ নিউ টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩। পৃষ্ঠা—১৯৪ ; মূল্য ২৲।

ধর্মের রহস্য অতি গূঢ়, তাহার প্রতিপাদনও সুকঠিন। আলোচ্য গ্রন্থে সরল ভাষায় ধর্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ প্রশংসার দাবি রাখে। ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবানের সাকার-নিরাকারত্ব, দেবতা-মূর্তির স্বরূপ, গীতায় অবতারবাদ প্রভৃতি আলোচনায় পাণ্ডিত্যের সহিত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। পুস্তকখানি যোগ্যস্থানে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন আসাম বন্যার্ত সেবাকার্য

সকলেই অবহিত আছেন, আসামের বিধ্বংসী বন্যা হাজার হাজার মানুষকে গৃহহীন ও অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে। বন্যার প্লাবন আসিয়াছে পর পর তিনবার; এখন পর্যন্ত সর্বাধিক-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির অধিকাংশ স্থলেই পৌঁছিবার কোনও উপায় নাই। শিলচর এবং করিমগঞ্জের মত সহরেও খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায় হওয়ায় সঙ্কট আরো ঘনীভূত হইয়াছে।

যে স্বল্পপরিমাণ খাদ্য এখনো পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্য এত উচ্চ যে তাহা ক্রয় করা দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের একেবারে সাধ্যাতীত। তাছাড়া বন্যার ফলে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যে-কোন সময় মহামারী শুরু হইতে পারে।

বন্যায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কাছাড় জেলা; এই জেলায় অবস্থিত মিশনের করিমগঞ্জ এবং শিলচর কেন্দ্রের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি গ্রামে বিবিধ আকারে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। বহু গ্রামে এবং শিলচর সহরে প্রয়োজনানুসারে খাদ্যদ্রব্য বা নগদ টাকা ডোল দেওয়া হইতেছে। করিমগঞ্জ কেন্দ্র হইতে কয়েকটি গ্রাম জুড়িয়া সেখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহু-সংখ্যক পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে। বস্ত্র এবং ঔষধও বিতরিত হইতেছে।

এই সেবাকার্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। খরচ করার মত যে অর্থ আমাদের ছিল, তাহা লইয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গতি সীমিত; আরব্ধ সেবাকার্য চালাইয়া যাওয়ার এবং বিস্তৃততর অঞ্চলে উহা প্রসারিত করার জন্য অবিলম্বে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এরূপ বিষম বিপদের সময় দুস্থ জনগণকে সাহায্যদানের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদাই সহৃদয় জনগণের সহায়তা পাইয়া আসিতেছে; আমরা আশা করি এই সেবাকার্য সফলতার সহিত পরিচালনার জন্য এবারেও আমরা অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্য পাইতে থাকিব।

এই সেবাকার্যের জন্য সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে :—

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া

২। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম,
রহড়া, জেলা—২৪পরগনা

৩। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,
নরেন্দ্রপুর, জেলা ২৪পরগনা

৪। কার্যাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ,
১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৫। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,
৫, ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

তারিখ : ১২ই জুলাই,
১৯৬৬

গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তি স্থাপন

গত ১৪ই আগষ্ট রবিবার সকাল ৯টার সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের সম্মুখবর্তী গোল পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সুরম্য পরিবেশে আয়োজিত গাম্ভীর্যময় এই অনুষ্ঠানটি সকলেরই চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসী এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বৈদিক মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ স্বামীজীর মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ইহার পর তিনি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভাষণ দান করেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভার কার্য শেষ হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন: স্বামীজী শুধু স্বদেশপ্রেমিক নয়, ব্রহ্মজ্ঞানীও ছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক তিনি। তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতের জাতীয় জীবন আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাদের জাতির সংহতি এই আধ্যাত্মিকতাতেই; অন্যান্য আদর্শকে এই আধ্যাত্মিকতার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি দেশবাসী সকলকেই ভারত সম্মিলিত করিতে পারে এই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদের আদর্শ; কোন বিশেষ ধর্মমত নয়, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সমন্বয়ভূমি। 'নিজে দেবত্বে উন্নীত হও, এবং অপরকে দেবত্বে উন্নীত হইতে সহায়তা কর'—স্বামীজীর এই বাণীই আমাদের জাতীয় জীবনের দিশারী হউক।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতির ভাষণে বলেন: ভারত যখন পরাধীন, লাঞ্ছিত, বিদেশীর চোখে ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত—সেই যুগে স্বামীজী ভারতের দূত হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন—ভারত যে আদর্শকে অবলম্বন করিয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, সেই আদর্শের প্রতিনিধিরূপে। সেই গৌরবে আজ আমরা ধন্য। স্বামীজীর আদর্শ অবলম্বন করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে; কিভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে এমনকি রাষ্ট্রজীবনেও সে আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে, তাহার নির্দেশ পাওয়া যাইবে তাঁহার বাণীর মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের বলিষ্ঠ মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার কথামত চলিলে দরিদ্র-ধনবানে বৈষম্য, মানুষে-মানুষে ভেদ দূরীকরণ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাহা আমরা চাই, দৈন্য দুর্বলতা কাটাইয়া তাহা সবই করিতে পারিব।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের পক্ষ হইতে সভান্তে জলযোগ ও প্রীতিসম্মেলন আয়োজিত হইয়াছিল।

চিকাগো-ধর্ম-মহাসভায় দণ্ডায়মান ভঙ্গিতে নির্মিত স্বামীজীর মর্মরমূর্তিটি উচ্চতায় সাতফুট; সাতফুট উচ্চ বেদীর উপর উহা স্থাপিত। মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীমণি পাল। মূর্তি নির্মাণ, স্থাপন প্রভৃতির সমস্ত ব্যয়ভার (প্রায় ২৫,০০০ টাকা) বহন করিয়াছেন রাজ্যসরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবাকার্য

আসামের সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্কর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কাছাড় জেলায় গত ২৯.৬.৬৬ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

শিলচর কেন্দ্র হইতে ১০ কুইণ্টাল চাল, ৪০ কুইণ্টাল আটা, ১৩ কুইণ্টাল ডাল এবং ২৬ খানি শাড়ি, ২৫ খানি ধুতি, ১০টি লুঙ্গি ও ১১০্ টাকা মূল্যের ঔষধ বিতরিত হইয়াছে।

করিমগঞ্জ কেন্দ্রে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় প্রতিদিন ১,২০০ লোককে রান্না-করা খাদ্য এবং শিশুদের জন্য দুগ্ধ বার্লি ইত্যাদি দেওয়া হইতেছিল, এখন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যয়ে কতকগুলি গ্রামে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৫২টি পরিবারের মধ্যে টেষ্ট রিলিফ পরিচালিত হইতেছে, উহা ১০০টি পরিবারে সম্প্রসারিত করা হইবে।

বন্যার্ত-সেবাকার্য আরও কয়েক মাস চালানো হইতে পারে। এ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে ৩০,০০০্ টাকা অগ্রিম পাঠানো হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৫—মার্চ ১৯৬৬) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কেন্দ্রে অনুসৃত কার্যধারা প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা এবং ধর্মবিষয়ক।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রদের জন্য) ২৪ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা-খরচে ও ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। আশ্রমের ১০ জন পরীক্ষার্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্যতার সহিত উত্তীর্ণ হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত পুস্তকসংখ্যা ৭,৬৯৯; আলোচ্য বর্ষে ৩৬১ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৬২ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১০,০৭৬; গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৫০।

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫৮,০৩০ (নূতন ৬,২৫৫) রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। এলোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৬,৪৯৮; তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬,৫৫৬।

আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য মোট ২৪২টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বিবেকচূড়ামণি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা অবলম্বনে আলোচনা করা হয়। আশ্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

কমানওয়েল্থ সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত ১১ই জুন, '৬৬ লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী মহারাজ সেণ্ট মার্টিন-ইন-দি-ফিল্ডস্-এ বিভিন্ন ধর্মের আলোচনানুষ্ঠানে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সভায় ব্রিটেনের মাননীয়া রানী এবং ডিইক-অব-এডিনবার্গ যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে এক সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিবিধ ধর্মবিষয়ক আলোচনার এই অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর রানী স্বামী ঘনানন্দজীর সহিত আলাপ করেন।

মার্লবোরো ভবনে যে সম্বর্ধনাসভা হইয়াছিল স্বামী ঘনানন্দজী তাহাতেও যোগদান করেন। এই সভাতেও রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি : অধ্যক্ষ—স্বামী ভাষ্যানন্দ। রবিবারের সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল :

ফেব্রুআরি, ১৯৬৬ : মানুষের আপাত-প্রতীয়মান রূপ ও প্রকৃত সত্তা ; ভগবদ্গীতার তাৎপর্য ; জীবনের অপরিহার্য প্রশ্নসমূহ ; জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে)।

মার্চ, '৬৬ : হিন্দুর দৃষ্টিতে পাপ ও মুক্তি ; ঈশ্বরই অনন্তজীবন ; অহংকারকে জয় করিবার উপায় ; ঈশ্বরকে সত্যই কে চায় ?

এপ্রিল, '৬৬ : মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষারূপে কর্ম ; অমরত্বের অর্থ ও উহা লাভ করিবার উপায় (খৃষ্টজন্মদিন উপলক্ষে) ; প্রার্থনার প্রয়োগকৌশল ; মনের অধিপতি হও।

মে, '৬৬ : আচার্য শ্রীশঙ্করের জীবনী ও উপদেশ ; শ্রীবুদ্ধের জ্ঞান ও শান্তির বাণী ; যোগের সারকথা ; পথনির্দেশ ; জীবন্মুক্তেরা কিভাবে জগতে অবস্থান করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে কঠোপনিষৎ আলোচনা হইয়াছিল।

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সোসাইটি : অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ ; সহকারী—স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ফেব্রুআরি, ১৯৬৬ : যোগ—ইহার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ; নূতন মানুষ, নূতন ঈশ্বর, নূতন ধর্ম ; ঈশ্বর জ্ঞান-ও আনন্দ-স্বরূপ ; শক্তির জাগরণ ; ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুলতা ; ঈশ্বর-রূপে মানব ও মানবরূপে ঈশ্বর, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ ; ভবিষ্য পাশ্চাত্য জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান।

এপ্রিল, '৬৬ : নিম্নস্তরের মন ও কর্মফল ; বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুস্যূত সত্তা, যীশুর পুনরুত্থান ; জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যত্নশীল হও ; অবচেতন মনের সংযম ; কালেরও অবসান ঘটিবে ; কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ; যোগের পথে শান্তি।

জুন, '৬৬ : ব্যক্তিত্বের প্রহেলিকা ; দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিকতা, ভারতে তীর্থযাত্রা ; শ্রীবুদ্ধ ও বর্তমান সমস্যা ; অজানার সন্ধানে তীর্থাভিযান ; ঈশ্বরানন্দে জীবনানন্দ ; মন, ধ্যান ও মূলসত্তা ; শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্তর্দেশ।

এতদ্ব্যতীত পুরাতন মন্দিরে স্বামী অশোকানন্দ 'অবধূতগীতা' আলোচনা করেন।

স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র : অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন সময়ে আলোচ্য বিষয় :

এপ্রিল, ১৯৬৬ : ধ্যান সম্বন্ধে সহজ কথা ;

অমৃতত্বের সন্ধানে; বিশ্বজনীন ধর্ম; সাধুদের জীবন হইতে শিক্ষা।

মে, '৬৬: পরিপ্রশ্ন, অনুসন্ধান ও সাধনা কর; মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা; পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে শ্রীবুদ্ধের পথনির্দেশ; ঈশ্বর চিৎস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ; প্রাণের ডাকে ভগবানের সাড়া।

বিদ্যামন্দিরের রজত-জয়ন্তী উৎসব

যুগাচার্য ক্রান্তদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে যে ভবিষ্যৎ-বাণীতে বলিয়াছিলেন—"ঐ যে দেখছিস, ঐ দক্ষিণ দিককার জমিটা ওখানে এক বিরাট শিক্ষায়তন গড়ে উঠবে"—সেই ভবিষ্যৎ-বাণীর বাস্তব-রূপায়ণ হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে বিদ্যামন্দিরের জন্মক্ষণে। বিদ্যামন্দির তাই স্বামীজীর 'স্বপ্নশিশু'। প্রাচ্য অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের শিক্ষাদর্শে বিদ্যামন্দির পরিচালিত হয়।

বর্তমান বৎসরে বিদ্যামন্দিরের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। সেই উপলক্ষে ৪ঠা জুলাই তারিখে বিদ্যামন্দিরে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এক শুচিস্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক হয়। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের শুভাগমন হয় বিদ্যা-মন্দিরে। প্রভাতের শান্ত-পবিত্র পরিবেশে পঞ্চবিংশতি শঙ্খধ্বনির মধ্যে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ বিদ্যামন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন; পরে বিদ্যামন্দিরের প্রার্থনাগৃহে পদার্পণ করিয়া তিনি পঞ্চবিংশতি প্রদীপশিখা প্রজ্বলিত করেন। অতঃপর তিনি বিদ্যামন্দিরের শ্রী-ভবনের 'কমন-রুমে' আসন গ্রহণ করিলে বিদ্যামন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ তাঁহাকে মাল্যদান করেন। তাঁহার আশীর্বাদলাভে বিদ্যামন্দিরের এই উৎসব সার্থক হইয়া উঠে। এই উৎসবে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ, স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী অভয়া-নন্দজী মহারাজ, স্বামী সন্তোষানন্দজী মহারাজ, সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী অজজানন্দজী মহারাজ, বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ এবং বেলুড় মঠের অন্যান্য অনেক প্রবীণ ও নবীন সাধু ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিশেষ পূজান্তে বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেণ্টারের অধ্যক্ষ স্বামী বোধাত্মানন্দজী মহারাজের সঙ্গে পবিত্র বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে।

সন্ধ্যায় সারদাপীঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রার্থনাগৃহে রামনাম সঙ্কীর্তন করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন।

বিদ্যামন্দিরের রজত-জয়ন্তী উৎসব আগামী ডিসেম্বর মাসে আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। বিদ্যামন্দিরের ভবিষ্যৎ সাফল্যময় এবং গৌরবোজ্জ্বল হোক—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কাছে এই প্রার্থনাই করি।

বিবিধ সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

গত রবিবার ১০ই জুলাই সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় ১৫১, বিবেকানন্দ রোডস্থিত 'স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির'-এ বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক স্বামীজীর ১০৪ তম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বক্তৃতা করেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং ১০৪টি প্রদীপ জ্বালিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সমাগত সকলকে স্বাগত জানাইবার এবং সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সোসাইটির বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করিবার পর স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সমাজের সব রকম ব্যাধির মহৌষধই যে শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রকৃত শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে স্বামীজী যে অমূল্য কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কয়েকটি পরীক্ষায় পাস করাই শিক্ষার মূল পরিচয় নয় এবং শিক্ষার অর্থ শুধু সংবাদ-সংগ্রহও নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্ম-বিশ্বাসের জাগরণই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য।

পরিশেষে তিনি এই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে আমরা বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইতেছি, কিন্তু স্বামীজী শিক্ষা সম্বন্ধে যে অমূল্য ও বাস্তবানুগ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না; তাহা কার্যে রূপায়িত করিতে পারিলে আমাদের দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইত।

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 'স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম' প্রসঙ্গে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে বলেন যে, স্বামীজীর বিভিন্ন বাণী ও রচনার মধ্যে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রহিয়াছে। নিরন্ন ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার সমবেদনা ও প্রেম এত গভীর ও এত আন্তরিক ছিল যে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাকে তিনি 'জাতীয় পাপ' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশের কল্যাণচিন্তা এবং দেশের আপামর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের চেষ্টাকেই বর্তমানে যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিও স্বামীজী যে কতখানি সজাগ ছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা পাই তাঁহার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ আধুনিক ভারতবর্ষ সমাজতন্ত্রের কথা প্রথম শুনিয়াছে স্বামীজীর মুখ হইতেই। স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য বৈদান্তিক একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, জড়বাদের উপর নয়।

সভাপতির ভাষণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের সন্ধান যে ভারতবর্ষ পাইয়াছে তাহা এক বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। স্বামীজী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় পরা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয়ে

বাস্তবাশ্রয়ী ও যুগোপযোগী পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। স্বামীজীর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি 'ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্য দিয়া ব্যবহারিক অধ্যাত্মবোধ'—এই আখ্যা দিয়া বলেন যে, শিক্ষার্থীর সার্বিক যোগ্যতা একমাত্র এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে।

বর্তমান সময়ে স্বামীজীর জন্মস্থান ও লীলাভূমি কলিকাতার ছাত্রসমাজে শ্রদ্ধার যে অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, শ্রদ্ধা ব্যতীত জীবনে কোন উন্নতিই করা সম্ভব হয় না।

তিনি কলিকাতাবাসী তরুণ ও যুবক সমাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইয়া বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও কর্মকেন্দ্র এই কলিকাতা নগরী, তাই কলিকাতাবাসী তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় স্বামীজীর উপদেশ ও বাণীতে সর্বাধিক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার বিপুল সম্ভবনাময় চিন্তাধারাকে কার্যে রূপায়িত করিতে সবার আগে যেন আগাইয়া যায়। পরে সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায়। সভার শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক জন্ম-জয়ন্তী ও হিমালয়দর্শন শীর্ষক দুইখানি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন।

চুঁচুড়া : ২২.৫.৬৬ রবিবার প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, চুঁচুড়া শাখায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়।

প্রভাতে মঙ্গলারতি ও ভজনাদির পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শহরের প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোমাদির পর দুপুর বেলা প্রায় চারিশত বালক-বালিকা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকাল তিন ঘটিকায় নৈহাটীনিবাসী শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীতের এক অনুষ্ঠান হয়। বৈকাল ৫টার সময় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন দিক আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ে শিক্ষায় নৈতিক মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

সভান্তে সঙ্ঘপরিচালিত স্বরাজ সঙ্ঘ ব্যায়ামাগারের ও বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের কৃতী ছাত্রদের সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সম্বর্ধিত ও পুরস্কৃত করা হয়।

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিঃ স্বামী নিরুদ্ধানন্দজী মহারাজের পরিচালনায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক চলচ্চিত্রে মীরাবাঈ প্রদর্শিত হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় দুই সহস্রাধিক জনসমাগম হইয়াছিল।

পরলোকে অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত গত ১লা জুলাই (১৯৬৬) সিদ্ধি হাসপাতালে শোথরোগে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের (খোকা) তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিনি প্রদৌহিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন

এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে আয়োজিত উৎসবাদিতে এবং নানাস্থানে আহূত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করিতেন।

রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি সেখানে অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী ছিলেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং একেবারে প্রথম দলের ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয় ব্যতীত ঐস্লামিক দর্শনে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল।

তাঁহার আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরলোকে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী গত ১৯শে শ্রাবণ (৪.৮.৬৬) বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদদিগের মধ্যে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। কলিকাতা স্টুডেন্টস হোমের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায় নওপাড়া গ্রামে ১২৯৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি বরাবর কৃতী ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। অতঃপর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম-এ. পাস করিবার পর কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-রূপে যোগদান করেন এবং ৩৫ বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরজীবনে অধিকাংশ সময় তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর পুস্তকাবলী পাঠে অতিবাহিত করিতেন।

তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যায় ৩৯০ পৃষ্ঠা ২য় কলম ১৪শ লাইনে 'ক্যান্সার পড়ে' স্থলে 'ক্যান্সার ধরা পড়ে' পড়িবেন।